শতক সেরা অণুগল্প

গ্রন্থপদী ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশিকা : প্রীতি মুখার্জী. ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রক . অমি প্রেস ৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট. কলকাতা-৭০০০০৯
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর. ১৯৫৯।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

চুরি করা কদাচ উচিত নয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একদা, একটি বালক বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশবকালে ঐ বালকের পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন, তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যতদিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই চুরি করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে, এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসি হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন, এবং ভুবনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসী; এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে আইস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একট কান কাটিয়া লইল। পরে র্ভৎসনা করিয়া কহিল, মাসী; তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার।

বিশ্ববঞ্চক ও বিশ্বভন্ড

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

" ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাহার ভার্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক।" এই অপূর্ব সংসারের কর্তা বিশ্ববঞ্চকের কাজ লোক প্রতারণা। সে একটি ঘটে ছাই-ধুলো ইত্যাদি ভর্তি ক'রে ওপরে এক-আধ সের ঘি দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর সমস্তটি ঘি'র ঘট বলে বিক্রি করে। বিশ্বভন্ড নামে আরেক ব্যক্তি সেও এক গুড়ের কলসিতে কাদা ভরে ওপরে কিছুটা গুড় নিয়ে ঘোরে। একদিন বিশ্ববঞ্চক ঘি'র ঘট গাছতলায় রেখে স্নানে গেছে। বিশ্বভন্ড দেখল সেখানে কেউ নেই। ভাবল কত আর গুড়ের কলসি মাথায় ঘুরি। এই ভেবে ঘৃতকলসী নিয়ে আনন্দিত মনে পালাল। বিশ্ববঞ্চক সেই কলসি মাথায় তুলে নিল ও বাড়িতে ফিরে "আপন স্ত্রীকে ডাকিল, ও ঠকের মা, ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয়, মাথা হইতে ভার নামা, আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি.....। এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘি এর ঘড়া জানিস্ তো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে। মনে বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম, পশ্চাৎ টের পাইবে। যা শীঘ্র রাঁধাবাড়া কর, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে।" স্ত্রী চটে উঠল, " তেল নাই, নুন নাই, চাউল নাই।" শেষপর্যন্ত ঘরে ক্ষুদ পাওয়া গেল। কিন্তু নুন নেই, তেল নেই। তখন ঠক গেল নুন আনতে। ঠক বাপকা বেটা। "তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল, এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকাইয়া আনিলাম।" পিতাপুত্রে যখন এইরকম কথাবার্তা হচ্ছে তখন গতিক্রিয়া এসে জানাল যে "গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া তদুপরি এককালে কতকগুলো পঞ্চকর্দম পড়িল।" বিশ্ববঞ্চক মাথায় হাত দিল।

কিন্তু বুঝল যে এই তার যোগ্য বন্ধু। যথাসময়ে দুজনের বন্ধুত্ব হল এবং দুজনে মিলে এক জায়গায় বাণিজ্য করতে গেল। সেখানে এক বণিকের কাছ থেকে একলক্ষ টাকা ধার করল। বিশ্ববঞ্চক সেই টাকা মেরে দেবার মতলব আঁটতে লাগল। দুই বন্ধু মিলে প্রস্তাব করল যে ছোট একটা ঘর ক'রে তার মধ্যে কয়েক হাজার টাকার তুলা কিনে আগুন লাগাও। তারপর বণিককে বলল যে আমার সব টাকা পুড়ে গেছে। কিন্তু তোমরা আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি বাড়ি গিয়ে দিয়ে দোব। তারপর মহাজন যখন লোক দেবে তখন মধ্যপথে বিশ্ববঞ্চক চলে যাবে আর বিশ্বভন্ড পাগলের মত 'ভূ ভূ' শব্দ করবে। তখন বিরক্ত হয়ে মহাজনের লোক চলে যাবে। তারপর দুই বন্ধু সেই লক্ষ টাকা ভাগ করে নেবে। তাই হল। বিশ্ববঞ্চকের 'ভূ ভূ' শুনে মহাজনের লোকেরা চলে গেল। তখন বিশ্ববঞ্চক এল বিশ্বভন্ডের কাছে - "মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম, এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভন্ড পূর্ববৎ পাগল হইয়া 'ভূ ভূ' কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল, যাও ভাই আমার সহিত কৌতুক করার কার্য নাই।"

ধ্বংস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল করে নতুন রকমের সৃষ্টি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যে জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। যেটা ফলতে লাগে ছয় মাস তার মেয়াদ কমে হত দুই মাস। ছিলেন গরিব, ব্যবসাতে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমত বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই করে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া — সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্‌নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক নিয়ে তৈরী নয়, তৈরী হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্‌গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করত চাইত না।

জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না,বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরী করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে

অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্‌মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ।

মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি,হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কারদানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলত মন যায় না।

পতঙ্গ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত"! আমার চমক হইল — চাহিয়া দেখিলাম — বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না-দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া,তামুক টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল — আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ রইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে-সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে-কেহ মরে, কেহ কাচে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই-মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই-কই, তাহাত পাই না-আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই-আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নি আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেটিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,— আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন; — জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost'। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেন্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, "আন্টনি, ক্লিওপেট্রা।" রূপ-বহ্নির " রোমিও ও জুলিয়েট," ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রীয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহর জন্য রামাযণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

মাধবের অপমান

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্পটি বলিতে কিনুও অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ সাধ্য-সাধনার পর ছকু বলিতে আরম্ভ করিলেন। ছকু বলিলেন, — "চক্রধর রায় মহাশয়ের কন্যাকে আমি বিবাহ্ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় টাকা ধার দিয়ে কখনও এক পয়সা সুদ না ছাড়িয়ে, লোকের বাড়ী বাঁধা রাখিয়া, তাহার পর তাহাদের ভদ্রাসন বেচিয়া ধনবান্ হইয়াছিলেন। রাঘব হালদার নামে একজন বড় মানুষের ছেলে বদ-খেয়ালীতে সমুদয় বিষয় নষ্ট করিয়া রায় মহাশয়ের নিকট আপনার বাড়ী বাঁধা রাখিয়াছিল। তাহার পর সে জাল জুয়াচুরী আরম্ভ করিল। কাবুলী চাকর রাখিয়া তাহাদের দ্বারা সে ডাকাইতি করাইত। অবশেষে জাল করার অপরাধে তাহার দ্বীপান্তর হইল। আমার শ্বশুর মহাশয় তাহার বাড়ী অতি অল্প মূল্যে কিনিয়া লইলেন। কলিকাতা শহরের উত্তর ধারে বৃহৎ বাড়ী, অনেক জমি, চারি দিকে বাগান, প্রাচীর দিয়া ঘেরা। আমি সেই শ্বশুর-বাড়ীতে থাকিতাম।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন, -- "তোমার পত্নীবিয়োগ হইলেও?"

ছকু উত্তর করিলেন, — "হাঁ ভাই, পত্নী-বিয়োগ হইলেও কিছু দিন আমি সে স্থানে ছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সে এক প্রকার নরক ভোগ হইয়াছিল। শ্বশুরের রাগে আর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর গঞ্জনায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়াছিল। শাশুড়ী ঠাকুরানী পরম রূপবতী ছিলেন।"

নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করিলেন, — 'তোমার স্ত্রী, তাঁর কি প্রকার রূপ ছিল?"

ছকু উত্তর করিলেন, — "সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কেমন গর্ভে জন্ম। রং কিন্তু একটু কাল ছিল। চক্‌চকে কাল, বার্ণিস জুতার মত, সম্মুখে দিয়ে চলিয়া গেলে মনে হইত যেন কাল বিজলী খেলিয়া গেল।"

বদন জিজ্ঞাসা করিলেন, — "তাহার পর?"

ছকু বলিলেন, — "আমার শ্বশুরদের পাড়ায় মাধব নামে এক জন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। বিলাতী ধরণে তিনি ভূত নামাইতে পারিতেন, গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ ভাল করিতেন। আর সেই বিলাতী ভেলকী - যাহাকে হিপনটিশ্যাম বলে, তাহাও তিনি জানিতেন!"

নবদ্বীপ একটু ইংরেজী জানিতেন। তিনি বলিলেন, হিপনটিসম (Hypnotism) বলে। তাহার পর?"

ছকু বলিলেন, — "আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে এক-ঘরে করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় কে কাহাকে এক ঘরে করিতে পারে? অনেকে তাঁহার পক্ষ হইল। আমার শ্বশুরের আরও রাগ হইল। কিসে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের প্রিয় পাত্র হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিলাম। শ্বশুর প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করেন। অনেককে নিমন্ত্রণ করেন। সকলের কান মলিয়া প্রণামী আদায় করেন। পূজা করিয়া বিলক্ষণ দুপয়সা তিনি

উপার্জ্জন করিতেন। যে যেমন প্রণামী দিত, তাহার সেইরূপ আদর হইত। এক টাকার কম প্রণামী দিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তিনি একটি নারিকেল নাড়ুও দিতেন না। শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া পূজার সময় মাধবকে আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। মাধব দুই টাকা প্রণামী দিলেন। পাড়ার অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাকে ভোজনে বসাইলাম। এমন সময় সেই স্থানে শ্বশুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটু দূরে ধপ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর মাধবের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, -- "ও কে? ও যে বড় ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়াছে! ওর জাত গিয়েছে! তুমি এখনি উঠিয়া যাও।"

মাধব বলিলেন, --"তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?"

কান খুঁটিতে খুঁটিতে শ্বশুর বলিলেন, -- "কি বলিলেন?"

মাধব পুনরায় বলিলেন, -- "তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?"

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন, --"তোমাকে কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে?"

মাধব উত্তর করিলেন -- "আপনার জামাতা।"

শ্বশুর বলিলেন, --"মাথা নাই তার আবার মাথা-ব্যথা। আমার কন্যা কোথায় যে আমার জামাতা! এখনি উঠিয়া যাও, নতুবা গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইব!" দুই চারি জন ব্যতীত তাঁহার সহিত প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় মাধব বলিয়া গেলেন, "যদি বিদ্যাবল থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আপনি ইহার প্রতিফল পাইবেন।"

তুচ্ছ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাটছি, এমন সময়ে একটি তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ী পরে আমাদের বাড়ীতে ঢুকলো। আমাদের গ্রামেরই মেয়ে নিশ্চয়, তবে একে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েচে, ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা-বাঁধানো শাঁখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ ঢলঢলে; বড় বড় চোখ দুটি! কানে দুটি সোনার দুল। জিজ্ঞেস করলুম — কার মেয়ে তুই রে?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে — বিশ্বনাথ কামাবের।

—বিশুর মেয়ে? বেশ, বেশ। তোর দেখচি বিয়ে হয়েচে এই বয়সে। কোথায় শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটির খুব লজ্জা হ'ল শ্বশুরবাড়ির কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললে — নারানপুর।

— কোন নারানপুব? ঘিবে-নারানপুর?

—হ্যাঁ।

—ক'দ্দিন বিয়ে হয়েচে?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—শ্বশুরবাড়ী থেকে এলি কবে?

— পরশু এসেচি কাকাবাবু।

— আচ্ছা যা বাড়ীর মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ী এসেচে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় সব বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় স্নেহ হ'ল খুকীটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা!

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়েটি মাঝের ঘরের মেঝেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্চে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

আমায় দেখে মেয়েটি বললে — কাকাবাবু, ও কিসের ছবি?

— ও আমার ফটো।

— আপনার ছবি?

মেয়েটি ফটোর কথা বোধ হয় বুঝতে পারে নি। বললুম — হ্যাঁ আমার ছবি।

— কে করেচে কাকাবাবু?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেন্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের ঘরের

দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেম্-ব্রান্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল।

— ও মেমসাহেব কি করচে কাকাবাবু?

— সিগারেট খাচ্চে।

— ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

— মেমসায়েবরা খায়। দেখেচিস কখনো মেমসায়েব?

— হুঁ।

— কোথায়?

— রাণাঘাট ইস্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেলগাড়ীতে বসে আছে। সাদা ধপ ধপ করচে একবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্চে। আরও প্রায় ঘন্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করছে না বাড়ীর মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায়নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া মাজাঘষা মেঝে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হোলো। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল — যেমন গণেশ-জননী, গরু, হরিণ, টিয়াপাখি, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি — একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে। গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য ঠেকেচে, খুকীর চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হোল — ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করে নি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার-কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশী আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাবো। নারকোল তেল আজকাল পাওয়া যায় না বলে বাড়ীর মেয়েদের ফরমাশ মতো গন্ধতেলের বোতল আসে দোকান থেকে — হেন কল্যাণ, তেল কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখচি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বললাম—গন্ধতেল্ একটু মাখবি, খুকী?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল! এমন ওকে কেউ বলে নি, কোনো ব্রাক্ষ্মণবাড়ীর কর্তা তো নয়ই।

বললে — হ্যাঁ!

— সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখদুটির অবাক দৃষ্টিকে অবাকতর করে দিয়ে আমি নিজের হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিয়ে দিলাম, খোঁপা-বাঁধা চুলের ওপর ওপর। ও হেন অনাদৃতা আদর পেয়ে লজ্জা পেলে।

বললাম — কি রকম গন্ধ?

— চমৎকার, কাকাবাবু!

— কি তেল বল দিকি?

— কি জানি?

— খুব ভালো গন্ধতেল।

ভারী খুশী হয়েছে ও।

বললে — আসি তা হোলে কাকাবাবু? বেলা হয়েচে।

— এসো মা। আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকী। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

ফরেন মানি

বনফুল

গোবর্ধন ভালো ছেলে। প্রমথ তার বন্ধু। প্রমথর কপালটা একটু ভালো, খুঁটির জোর আছে। চাকরি পেয়েছে একটা। গোবর্ধন পায়নি। গোবর্ধন আরও মুশকিল, সে বিবাহিত। বউটি সুন্দরী। স্বামীর কাছে নানারকম জিনিস চায়।

একদিন গোবর্ধন এসে প্রমথকে বলল, 'আজ ভাই বউয়ের সামান্য একটা আবদার মেটাতে পারলাম না। সে আজ বললে অনেকদিন চিংড়ি মাছ খাইনি, আজ চিংড়ি মাছ কিনে এনো। যোগেনের কাছ থেকে দশটা টাকা ধার করে বাজারে গেলাম। চিংড়ি মাছ পেলাম না। শুনলাম সব চিংড়ি মাছ বিদেশে চলে যাচ্ছে 'ফরেন মানি' আর্ন করতে। এ দেশের সব ভালো জিনিসই বিদেশে গিয়ে 'ফরেন মানি' আর্ন করছে। ভালো কাপড়, ভালো চাল, ভালো ভালো ফল সব আজ বিদেশের বাজারে। আমাদের খনিগুলো তো খালি হয়ে গেল। এমন কি বড় বড় ব্যাঙ পর্যন্ত চালান হচ্ছে। এ দেশের ভালো ভালো ছেলে মেয়েরাও বিদেশে গিয়ে 'ফরেন মানি' রোজগার করছে। কিছু ছোট পোনা মাছ কিনে এনে বউকে 'ফরেন মানি'র রহস্য বোঝালাম। বউ বললে, 'অত ছোট মাছ আমি খেতে পারি না, গলায় কাঁটা বেঁধে কি মুশকিল বল তো-'

এর প্রায় মাসখানেক পরে গোবর্ধন হন্তদন্ত হয়ে প্রমথর কাছে এল সেদিন। চুল উসকোখুস্‌কো, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

'কি রে কি হল--'

'আজ বাড়ি ফিরে দেখি - বউ নেই। এই চিঠিখানা লিখে রেখে গেছে।'

চিঠিতে লেখা আছে - আমিও 'ফরেন মানি' আর্ন করতে চললাম-।

' কি করি বল তো? থানায় যাব? তোর মেসোর সঙ্গে হোম মিনিস্টারের আলাপ আছে- তুই একটু চেষ্টা করে দেখবি?'

প্রমথ নির্বাক হয়ে রইল।

কুঞ্জ-বিহারী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মাষ্টার কুঞ্জলালবাবু পঞ্চাশ বছর বয়সে হুগলি-কলেজ হলে এল-এ দিতেছেন। না দিলে বি-এ দিতে দেয় না; বিয়ে না দিলে পদোন্নতি হয় না। একটার অবকাশ সময়ে কুঞ্জবাবু মালীর ঘরে তামাক খাইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাহার পাড়ার আর একজন পরীক্ষার্থী বিহারীবাবুও উপস্থিত। কুঞ্জবাবুকে দেখিয়া বিহারী কুণ্ঠিত হইলেন। কুঞ্জবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,- 'হে বিহারিন! আমাকে আর সমীহ কেন ভাই? এখন আমরা ত একই সূর্যে ধান শুকাই।' বিহারী মস্তক নত করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হাঁ, তা এক সূর্যে ধান শুকাই বটে, তবে আমরা সকালে, আপনি বৈকালে।'

অসমাপ্ত

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

একটি ছেলের জন্ম হ'ল -- নাম রাখল প্রবীর।

ব্যাকরণ জানলে মিনি গল্প ভালো বোঝা যায়। প্রবীর প্রকৃষ্ট বীর। মা বলে-- জনার প্রবীর নয়। এ প্রবীর আরও বড় বীর, অর্জুনকে এ প্রবীর বধ করবে! কারণ মোহিনীমায়া তার কাছে লজ্জিত হয়ে অন্ধকারে মুখ ঢেকে ফিরে যাবে।

প্রবীর হামা দিল,উঠে দাঁড়াল, টলতে টলতে চলতে লাগল। খিল খিল হাসতে লাগল। মা বললে -- জয় মা কালী। বাবা বললে -- ইনকিলাব জিন্দাবাদ। বাবা মারচেন্ট অফিসের কেরানি। অফিস ইউনিয়নের উৎসাহী সভ্য। বাবা চান ছেলে চাকরি করবে এবং ইউনিয়নের সেক্রেটারি হবে। প্রবীর বলে -- চাঁদ নেবো। মা বলে দেবো। বাবাও বলে দেবো। বলে না যে নিতে নেই, ও নেয়া যায় না রে পাগল ছেলে।

পাগল ছেলে বড় হয়।

প্রবীর বড় হয়েছে, মানে হায়ার সেকেন্ডারি ফেল ক'রেছে দুবার। তিনবার পড়ছে। লম্বা টিঙ্‌টিঙে, চোঙাপ্যান্ট, নামাবলি কাটা হাওয়াই শার্ট গায়ে, পায়ে স্যান্ডেল, প্যান্টের পকেটে চারমিনারের প্যাকেটে পোড়া আধখানা সিগারেট কটা -- গোটা দুই গোটাও আছে। কবিতা লেখে, দুপুরে ময়দানে মুক্তমেলায় যায়। ভাঙা গলায় গান গায় --''তুমি থাক আকাশে আমি থাকি মাটিতে, মাটিতে ও আকাশে - কালচে ও ফ্যাকাশে, বেতারের ঘাঁটিতে , - আমি থাকি মাটিতে। পারি না যে হাঁটিতে।''

আর বোমা বানায়। রাত্রে ফাটে দমা দম্ দমা দম্। প্রবীর অস্ত্র শিক্ষা করে।

প্রবীর বয়সের ধর্মে প্রেমে পড়ে। কার প্রেমে পড়ে বা পড়েছে তা জানে না। তবে সকল বাসের পিছনে পিছনে বাইসাইকেল নিয়ে ছোটে। চলে সেই ইস্কুল পর্যন্ত। মেয়েদের ইস্কুল। হঠাৎ একদিন পুলিশ ধরলে। নাম উঠল পুলিশের খাতায় মস্তান বলে।

মা বলে, এ ওই পান্ডবদের দপ্তরের পুলিশের কাজ। বাবা বললে চূর্ণ করে দিতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

মাস কয়েক পরে ছাড়া পায় প্রবীর। এবার দাড়ি গজিয়েছে জেলে। কামায়নি। চুলগুলো ঝাঁকড়া হয়েছে। চোখে একটা গগলস দিয়েছে। ঘুরে বেড়ায়। চাকরি চাই। নইলে চলে না। মা ডাল রাইসটা কোন মতে দেয়, রাত্রে পোড়া রুটি। ফাদার কিন্তু লবডঙ্কা। চারমিনার পর্যন্ত জুটছে না।

এরপর একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হল প্রবীর। শোনা গেল সে পালিয়েছে -- পালিয়েছে -- ঘুঘুডাঙার নোটন বলে একটি মেয়েকে নিয়ে। গেছে কলে খাটতে। নোটনকে সে বিয়ে করেছে। বাবা বললে -- তার মুখ আমি দেখব না।

মা কাঁদে গোপনে। চিঠিও লেখে। শেষে একদিন দুপুরবেলা যায়ও সেই কলের

শ্রমিক বসতিতে।

গিয়ে দেখা যায় তারা সেখানে নেই। শোনে ছাঁটাই হয়েছে। স্ট্রাইক করেছিল ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে। জোরে চিৎকার করেছিল বলে ধনী মালিক ছাঁটাই করে দিয়েছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

খবর এল -- চিঠি একখানা।

খবর নোটনের একটা ছেলে হয়েছে। নোটনই লিখছে, মা আপনি আমাকে দেখেন নি। আমাকে নিয়ে যায় নি আপনার ছেলে আপনার কাছে। আজ আপনার নাতি হয়েছে। আমি মরতে বসেছি। আপনার ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে। দিনরাত বিড় বিড় করে বকে। বলে অর্জুনকে বধ করতেই হবে। একদিন এসে তাকে আর আপনার নাতিকে নিয়ে যান। এদের বাঁচান। আমি মরব।

মা গেল। গিয়ে দেখলে অর্জুন বধ করতে গিয়ে প্রবীব মরে গেছে। হার্টফেল করেছে। বেশি হাত পা ছুড়ে চিৎকার করেছিল -- পুলিশ তাড়া করেছিল। ছুটতে ছুটতে দম আটকে মাটিতে পড়ে; তারপর হার্টফেল করে মরেছে।

মা কাঁদেন। তারপর ছেলেবউকে নিয়ে বাড়ি আসেন।

ভাবছেন মহাকাব্য অসম্পূর্ণ রইল -- এটাকে সম্পূর্ণ করবে এই নাতি।

নাম দিলেন -- জয় জয়ন্ত। প্রত্যাশায় রয়েছেন।

প্রেম

ঋত্বিক ঘটক

সে এল। সামনের তমাল গাছটা ঝোড়ো বাতাসে দৈত্যের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিল আর পাশের সুপুরি গাছটা মাটির উপরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল।

পদ্মা। শীতের পদ্মার সমস্ত বালুকণা উঠে এসে নাক চোখ কান বন্ধ করার উপক্রম করেছে। শব্দ সে যে কী অপূর্ব, হাওয়ার যে নিজস্ব একটা চরিত্র আছে এটা পদ্মাপারে একা চাঁদ জ্যোৎস্নায় বসে অনুভব না করলে বোঝা যায় না।

তার মধ্যে সে।

এ-আসা যে কী সেটা বোঝানো সম্ভবপর নয়। লোকটি পদ্মার পারে বসে ওপারের তীরভূমি দেখত, কখনো দেখাও যেত না -- ওইদিকের মেঘগুলোকে মনে হত যেন কোথাকার দূরদেশের মন্দির। শাঁখঘন্টার শব্দ শুনতে পেত। ধূপের গন্ধ নাকে লাগত। সে তন্ময় হয়ে যেত, এই অবস্থাতে সে এসে দাঁড়াল।

সামনে সুপুরি গাছটা তার পাগলামি চালিয়েই চলেছে। তমাল গাছটারও বদমায়েশির সীমা নেই। ঘোর ঘনঘটায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হাওয়া পড়ে এল। এবার জল নামল বলে। মাঝিরা পদ্মার পাল গুটিয়ে কোনোরকমে পাড়ের দিকে ভিড়াবার চেষ্টা করছে তাদের নৌকা। মহাজনি ভরগুলো নিজেদের দেহ নিয়ে সামাল দিয়ে উঠতে পারছে না। পানসিগুলো কোনোরকমে ভেতরে ভিড়ে যাবার চেষ্টা করছে। দাঁড়িগুলো দাঁড় টানতে গিয়ে পদ্মা-মার স্রোতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারছে না, হাল সামাল দিতে গিয়ে নিজেই বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। পাড়ে ফাটল ধরেছে। চিরচির করে কালো একটা রেখা মাটির বুকের উপর দিয়ে নিজেকে এঁকে যাচ্ছে। তার পরেই ঝপাং ঝপ্ মাটি ধসে পড়ছে। পদ্মা মা নিজের স্রোত বদল করছেন।

সেদিন ছিল এমন একদিন।

পদ্মার বুকে উত্তাল কামনা। পদ্মা এদের রক্তে অস্থিমজ্জায়। এদিকে আবার একটা দামাল হাওয়া প্রচন্ড বাঁদরামি শুরু করে বালুগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে অভ্রের চিকচিক ব্যাপারটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তখনও তমাল গাছটা গন্ডগোল করছেই। আর সুপুরি গাছটা আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছেই। আর এরা দুজনে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটা মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। ভাবল কত পবিত্র কত জীবন্ত এই মুহূর্তটা। এই যে উদার পদ্মার পাড় হাওয়া প্রকৃতির সমস্ত অবদান। এটা এ মুহূর্তে। এটা তো পরের মুহূর্তে আর থাকবে না। সেই মুহূর্তে মেয়েটি হেসে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আর বলল, "তোমার জন্যই এসেছি এই ঝড়ের রাতে।"

ও তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল, তারপরে মেয়েটির নিজের সুগন্ধি চুলগুলো দিয়ে মেয়েটিরই গলা পেঁচিয়ে ধরল এবং মেয়েটাকে মেরে ফেলল,ভাবল এই মুহূর্তটা অক্ষয় হোক। এরপরে এও তো বুড়ো হয়ে যাবে। আমারও জীবনে বিভিন্ন ঘটনা আসবে। কিন্তু অক্ষয় অব্যয় মুহূর্তটি আর কোনো দিন জীবনে ফিরবে না। এর স্মৃতিটুকুকে মলিন হতে দেওয়া যায় না।

ও মেয়েটির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বাইরে তমাল আর সুপুরি গাছ দাপাদাপি করছেই। পদ্মা তার নিজের মনে চলেছে। ঝড় পড়ে এলো।

পার্থক্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি দেওরের সেবা-যত্ন করে বিধবা সুনীতির দিন কাটে। সুনীতির বয়স বছর তেইশ। বড় দেওর বিনয় তার সমবয়সি, বি.এ.পাশ করে জুটমিলে চাকরি করছে। বিয়ের জন্য সুনীতি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে। আগামী অঘ্রাণের মধ্যে দেওরের সে বিয়ে দেবেই। ছোট দেওর পাঁচুর বয়স বছর বারো। স্কুলে পড়ে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চঞ্চলভাবে বাইরে আসতে গিয়ে চৌকাঠে পা বেঁধে পাঁচু দড়াম করে একটা আছাড় খেল। সুনীতি ছুটে এসে তাকে তুলল। পাঁচুর খুব লেগেছিল। কোলে নিয়ে বসে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে সুনীতি তাকে শান্ত করল।

পাড়ার সরকার-গিন্নি একটু তেলের চেষ্টায় বসেছিলেন। বললেন, বেঁচে থাকো বৌ, দ্যাওর তো নয়, পেটের ছেলের বাড়া।

পাড়ায় সুনীতির সুখ্যাতি রটল। দেওরদের সুনীতি মা'র মতো স্নেহ করে, দিবারাত্রি দেওরদের জন্য খেটে খেটে তার জীবন বেরিয়ে গেল। সবাই বলল, হবে না? লক্ষ্মী বৌ যে!

কয়েকদিন পরে বিনয় জ্বর গায়ে আপিস থেকে বাড়ি ফিরল। জ্বর বেশি হয়নি কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়েছে। সুনীতি তাড়াতাড়ি বিছানা করে দিল। বিছানায় শুয়ে বিনয় ছটফট করতে লাগল। সুনীতি বিছানায় বসে তাব মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মুখের দিকে ঝুঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল, খুব কষ্ট হচ্ছে ভাই?

বৌ কইগো? বলতে বলতে সরকার-গিন্নি উঁকি দিলেন। পরক্ষণে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি গেলেন পালিয়ে। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল। সবাই বললে, আ ছি ছি একি অলক্ষ্মী বৌ?

আমি সেইদিন হব শান্ত

সমরেশ বসু

এদিকে আট, ওদিকে চার, বারোটি বছর পূর্ণ হল।

সমুদ্র এখনো তেমনিই আছে। তেমনি সীমাহীন অতলান্ত ফেনিলোচ্ছল। পায়ের কাছে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আমিও তেমনি আছি। কেবল করবীর মৃতদেহটা আর, একটু দূরের কাঁটা মনসার ঝোপের কাছে বালিতে চাপা নেই। পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে।

বারো বছর আগে, আমার প্রেমিকা আমাকে ছেড়ে অবনীকে বিয়ে করল। অবনীর চরিত্র আমার জানা ছিল। শুরু করেছিলাম, করবীর বিরুদ্ধে তার মনে অবিশ্বাস আর সন্দেহের বিষ ঢোকাবার! সার্থক হয়েছিলাম। তার জন্য কোন প্রমাণ রাখিনি, কিন্তু বিস্তর কাটখড় পোড়াতে হযেছিল, চার বছর ধরে।

তারপরে অবনী করবীকে নিয়ে এল পুবীতে। আট বছর আগে। আমি ছায়ার মত লেগে ছিলাম। কাক জ্যোৎস্না রাত্রে, একটা ভাঙা বাড়িতে, অবনী কববীকে গলা টিপে মেরেছিল। কাছেই , কাঁটা মনসার ঝোপের কাছে বালি চাপা দিয়েছিল। তারপরে ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসেছিল। এখন আমি যেখানে বসে আছি।

পিছন থেকে আমি ডেকে বলেছিলাম, 'অবনীবাবু, করবীকে খুন করলেন, এবার আপনার পালা।' সাইলেনসার লাগানো রিভলভার দিয়ে তাকে গুলি করে মেরেছিলাম। তারপরে সমুদ্রের দিকে নেমে জলে পা ডুবিয়ে অনেকখানি হেঁটে গিয়েছিলাম, যাতে আমার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ না করা যায়। সেই রাত্রেই পুরী থেকে চলে গিয়েছিলাম!

'প্রিয়তোষবাবু'।

পিছন থেকে নিজের নাম শুনে চমকে ফিলে তাকালাম। একটা ছায়ামূর্তি, চিনতে পারলাম না। সে বলল, 'আট বছর বাদে আবাব সেই জায়গায় ফিরে এলেন?'

ছায়ামূর্তি বলল, 'মানে, আপনারই ভুল। অবনীবাবুকে মারবার জন্য যখন রিভলভারটা পকেট থেকে বের করেছিলেন, তখন আপনার পকেট থেকে একটা চিরকুট পড়ে গিয়েছিল। খেযাল করেননি। তাতে লেখা ছিল, ''করবী, আমি সেই দিন হব শান্ত......'' অবিশ্যি চিরকুটের হাতের ছাপও যে আপনার, কিংবা এ ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারেন, ও সব আবিষ্কার করতে আমার অনেক সময় আর কাটখড় পোড়াতে হয়েছে। আসুন এবার যাওয়া যাক।''

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে রইলাম।

যশোদা

বিমল কর

বার বার ডেকেও যশোদার সাড়া পাওয়া গেল না। কলাগাছের পাতার ওপর চড়ুই ফর ফর করে উড়ে গেল। যশোদাকে ডাকতে ডাকতে ভাবছি কোথায় গেল ও! হঠাৎ দরজা খুলে একটা রোগা মতন লোক বেরিয়ে এল। সে কাশছিল, হাঁপাচ্ছিল। মরা পানকৌড়ির মত চোখ লোকটার। শুধলো, কি চাই? যশোদা আমার কাছ থেকে কাপড় কিনত শুনে লোকটা আমায় ঘরে এসে বসতে বলল। বসলাম ঘরে গিয়ে। দড়ি ঠাটিয়ায় বসিয়ে ও চলে গেল। আর ফেরে না, ফেরে না। ভাবলাম, এ বুঝি কেউ দূর জ্ঞাতি-টাতি হবে যশোদার, নতুন এসেছে। যশোদা বাড়ি নেই বোধ হয়। লোকটা ডেকে আনতে গেছে। ঘরটা আজ অন্ধকার অন্ধকার ঠেকছিল, জানলা খোলা নেই, দরজার পাটও পুরো খোলা নয়। কোথাও কোন শব্দ নেই। ....যশোদার পথ চেয়ে বসে বসে কতক্ষণ কেটে গেল। তারপর ও এল। যশোদা নয়-সেই লোকটা, মরা পানকৌড়ির মতন চোখ যেন আরও বাসি দেখাচ্ছে। ওর হাতে হুঁকো। পাশে বসল। বলল, সে যশোদার স্বামী।

অন্ধকারের ওপারে

আশাপূর্ণা দেবী

অফিস ফেরৎ বাসে ভিড় এটা কিছু নতুন কথা নয়, যারা ফেরে তারা জানে। তবু আজকের ভিড়টা যেন একটা হিংস্রমূর্তি ধারণ করেছে। প্রবেশপথে তিন সারি লোক শূন্যে ঝুলছে। একজনের পিছুতে আর একজন, সামনের লোকের প্যান্টের বেল্ট চেপে, পাঞ্জাবির কোণ চেপে।

তবু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বিকাশ জানলার ধারে সিটে বসে আছে। যদিও ক্রমশই ভিড় বাড়তে বাড়তে দম আটকে আসছিল এবং মনে হচ্ছিল গাড়িটারই বুঝি হঠাৎ দম ফুরিয়ে যাবে। তবু দন্ডায়মানদের ঈর্ষা-দৃষ্টির সামনে নিজেকে বেশি ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল বিকাশের।

রাস্তা থেকে কে একজন বলে উঠলো 'ও দাদা এটা একটু ধরবেন?'

'আমায় বলছেন?'

'হ্যাঁ লাকি দাদা, দয়া করে রাখুন একটু, হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছি।'

রোগা ময়লা বুশ সার্ট পরা একটা ছেলে কালো রোগা হাতে বাড়িয়ে দিলেএকটা নতুন জুতোর বাক্স। দু'হাতে জানলার রড বাগিয়ে ধরে ঝুলতে লাগলো এবার। এ ঘটনাও নতুন নয়। এক দিদিমনির ব্যাগ অপর দিদিমনির কোলে, এক বৌদির খোকা অপর মাসিমার কোলে, বাসে এতো হরদম।

বিকাশ অপরের জুতো কোলে নিয়ে বসলো। বাটা'র বাক্স। ডালায় একটা আধা পক্ষীরাজের ছবি, লাল ছাপ যেন হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। বিকাশ অন্যমনস্কের ভান করে দড়ির বাঁধনের পাশ থেকে কোনটা তুলে জুতোটা দেখে নিলো। বেশ মারকাটারি জুতোটা। ছেলেটাব মুখের বাহার না থাক জুতোর বাহার আছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসলো, 'কতো দিয়ে কিনলেন?'

'আর বলবেন না মাইনের অর্ধেক চলে গেল। ছাপ্পান্ন টাকা উনিশ নয়া।' ছুটন্ত বাসে কথার শেষটা হারিয়ে গেল।

বিকাশ মনে মনে হাসলো। শখ আছে বাবুর ওই সরু সরু কালো কালো পায়ে ছাপ্পান্ন টাকার জুতো। বাবুদের আর কিছু না থাক একসেট টেরেলিন, আর একজোড়া মারকাটারি জুতো, এ থাকবেই। মাইনের অর্ধেক দিয়ে একজোড়া জুতো। সাধের প্রাণ গড়ের মাঠ।

'আরে আরে আরে -- এ কী! বাঁধকে, বাঁধকে, সর্বনাশ করেছে --' ঘচাং করে বাসটা থেমে গিয়েও ঘসটাতে খসটাতে দু'খানা পা-ই চাকার তলায় চলে গেছে।

সাবধান হয়েও হাত ফসকানোটা রোধ করতে পারলো না।

বিকাশের কোলে জুতোর বাক্সটা পক্ষীরাজের রঙিন ছবি নিয়ে হাসছে ঠিক আগের মতই।

হরিদত্ত ভাঁড়

ভাঁড়ামি করতে পারত লোকটা, সেই জন্যেই কমিক করে বেড়াত কিন্তু কোন কোন রাজার হাত থেকে যেমন পোড়া মাছ জ্যান্ত হয়ে জলে লাফ মারে, হরিদত্তর হাত থেকেও তেমনি সিনেমা-থিয়েটার পাড়ার ফাংশন সব ফস্‌কে যেতে লাগল।

একদিন সকালে উঠে হরিদত্ত হন্যে হয়ে বেরুল! বড়ই হাঁড়ির হাল সংসারে, তা ছাড়া মেয়েটাকে অজ্ঞান অচৈতন্য জ্বরের অবস্থায় জামাই পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছে গতকাল।

'না হয়, ধার করেই আনো।'

'দেখি।'

বউয়ের হিষ্টিরিয়াকে হরি বেজায় ভয় পায়। ধার করতে পারে না। চট করে অভাবের কথা বলতে পারে না হরি। কচ্ছপের মত বিস্মিত ব্যথিত। শরীরে আধখানা মাংস কসাইকে দিয়ে আধখানা কচ্ছপ বুঝি হরির মত করেই সংসারের দিকে চেয়ে থাকে।

হরি ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকল।

'এসো ক্লাউন এস।'

'সত্যি হরি! আজ তুমি খুব সময়ে এসেছ। আমার বেয়াইরা এসেছেন। ওঁরা তো তোমার কথা শুনে শুনে......রিয়ালি ওঁদের একটু হাসাও না বাবা!'

'পেটুক মাড়োয়ারীর স্কেচটা কর তো?'

এখন ও একজন পেটুক মাড়োয়ারীর খাওয়ার কমিক করতে লাগল। লোকটা রাবড়ি-ক্ষীর-মালাই-চমচম খায় আর দুধ দিয়ে কুলকুচো করে। সবাই হাসতে লাগল। ডাক্তার বললেন হাসির মত খিদে বাড়াবার ওষুধ নাকি তিনিও জানেন না।

'আমার মেয়ের বড় অসুখ......'

হরিকে ডাক্তারবাবু বাড়ীর ভেতর থেকে নারায়ণের তুলসী এনে দিলেন। বললেন, 'বালিশের নিচে রেখ আর দেখ, হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

হরি ওর পরিচিত এক পরিচালকের কাছে গেল।

পরিচালকের বাইরের ঘর তখন সকালের বিয়ার আর সিগারেটের গন্ধে ভুরভুর করছে। উঠতি অভিনেতা রাজনীতি নিয়ে চেঁচাচ্ছিলেন।

'গিভ আস্ সাম লাফ!'

পরিচালকের চোখ লাল।

হরি কমিক করতে লাগল। একজন অভিনেত্রীর সকালবেলার কমিক। ফোন বাজছে, অভিনেত্রী ন্যাকামি করছেন, ন্যাকামি করতে করতেই এবারকার ছবির রেটটা দশ হাজার বাড়িয়ে ফেললেন।

'গুড, ভেরি গুড!' পরিচালক ঘোলা চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ভীষণ রেগে

চেঁচিয়ে বললেন, 'অপমান করছ? জানো, চন্দ্রিমা তোমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট? তোমাদের জন্যে ও রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে সেদিনও টাকা তুলেছে? হাউ ডেয়ার ইউ?'

হরি কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল!

ঘন্টাচারেক পথে পথে হেঁটে হরি বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করল। অগতির গতি পাড়ার মস্তান সর্দারের কাছেই যাবে ও। প্রতিবার পূজোর সময়ে হরিকে দিয়ে ও বিনে পয়সায় কয়েক হাজার লোককে হাসিয়ে নেয়।

বরুণ বলল, 'খুব সময়ে এসেছ।'

'মিটিং হবে জান ত?'

'সে তো রাজনীতির মিটিং ভাই।'

'আরে লীডাররা তো আজকাল সিনেমার হিরোর বাবা। পায়ে তেল দিতে দিতে তবে জনগণের সামনে আনা যায়। এখনো রাম বোস আর মতি চ্যাটার্জি আসেনি। একটু ঠেক দেবে চল তো?'

'আমার কয়েকটা টাকার দরকার।'

ধমকে ওকে পার্কে নিয়ে গেল বরুণ।

হরি একটা অসম্ভব লোকের কমিক করতে লাগল। লোকটা ভাঁড় অথচ সকাল থেকে রাত অব্দি ওর বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না। তবু লোকটা মানুষকে হাসিয়ে হাসিয়ে বেড়ায়। লোকটা অমানুষ, কেননা ওর মেয়ে মরে যাচ্ছে জেনেও ও সকাল থেকে বাড়ি বাড়ি ভাঁড়ামি করে বেড়াচ্ছে।

'কি ব্যাপার?'

বিপক্ষ দলের মস্তানরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। লীডাররা এলে তাদের হাত পকেট থেকে বেরুবে।

'ভাঁড় দিয়ে ঠেক দিচ্ছে। আচ্ছা হেঁকড়বাজি মাইরি!'

'কাপ্তেনরা এল-না বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই তো।'

'মাইরি একখানা ঝেড়ে চল্ কেটে পড়ি।

বেকায়দা বসে থেকে লাভ আছে?

'ডায়াসে ছোঁড়, ডায়াসে।'

হরি নিজেকে নকল করতে করতে কাঁদছিল বলে ওদের দেখতে পেল না।

দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এমনও হয় নাকি! প্রথমে চিনতে পারিনি! এ কার সঙ্গে কথা বলছি! ডাক্তারবাবু প্রোটিন খেতে বলেছিলেন --সপ্তাহে একদিন করে মাংস খেতে হবে! সামর্থ্য থাক আর না-থাক, প্রোটিন খেতেই হবে। বিংশ শতাব্দীর নতুন হুজুগ প্রোটিন। এতে গরীব বড়োলোকের প্রশ্ন নেই, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বিচার নেই। কিছু ওষুধ কোম্পানীর লাভ-লোকসানের খেসারত দিতে হবে আমাদের মত সাধারণ গৃহস্থ লোককে।

তা মাংসের দোকানে গিয়ে প্রথমে চিনতে পারিনি। একজন ভদ্রলোক দোকানের ভেতরে বসেছিলেন টেরিলিনের সার্টপ্যান্ট্। গলায় টাই। হাতে রিস্ট্-ওয়াচ্। চুল ব্যাক্-ব্রাশ কবা।

জিজ্ঞেস করলাম -- মাংসওয়ালা কোথায় গেল?

ভদ্রলোক বললেন -- আমিই মাংসওয়ালা, কী চাই বলুন? মাংস কিনবেন?

আমি অবাক। বললাম -- আপনিই!

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন -- হ্যাঁ আমিই। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি মাংস বিক্রি করতে পারি? লন্ডন ইউনিভার্সিটির পি.এইচ.ডি। মিলটনের থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছিলাম। শেষকালে কোনও চাকরি না পেয়ে এই মাংসের দোকান করেছি। আর আমি তো একলা নয়। ওই যে রাস্তায় ও-ফুটে বিঁড়ি বাঁধছে এক ভদ্রলোক-উনি আগে ছিলেন জলপাইগুড়ি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার, ছেলেরা বোমা মেরে ওর পা খোঁড়া করে দিয়েছিল। শেষকালে কোনও উপায় না পেয়ে এই বিড়ির দোকান করেছেন।

তারপর থেমে বললেন -- আপনার কত মাংস চাই?

বললাম -- পাঁচশো গ্রাম --

ভদ্রলোক একটা ভোজালি নিয়ে মাংস কাটতে লাগলেন। হঠাৎ আমার নজরটা পড়লো দেয়ালের দিকে। দেখি একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ক্যালেন্ডারের মাথায় সাল তারিখ লেখা। কিন্তু ছাপার ভুল। লেখা আছে ১৯৯০, এপ্রিল।

আমি বললাম -- ও কি মাশাই, আপনার ক্যালেন্ডারে যে ছাপার ভুল রয়েছে, ১৯৭০-এর জায়গায় ১৯৯০। ঠিকই তো লেখা আছে --বলে ভদ্রলোক আমার বোকামী দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন। আর তার সেই হাসির শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমি আমার নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছি। দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ছিল সেই দিকে তাকিয়ে দেখলাম। লেখা রয়েছে ১৯৭০ এপ্রিল।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এমন দুঃস্বপ্ন কেন দেখতে গেলাম। ভাবলাম একি আকাঙ্খার প্রতিরূপ, না এ আমার দূর-দৃষ্টি! কে জানে!

"রাজ"-কাহিনী

সন্তোষকুমার ঘোষ

একদিন তাকে দেখেছিলাম; তাকে, যার রাজার পোশাক, বয়সের রোদ্দুরে দড়বাড়ি ঘোড়ায় টানা টমটম হাঁকিয়ে ময়দানের রাস্তায় উদ্দাম উড়ে যাচ্ছে।

জবড়জং জোব্বায় হাত ঢুকিয়ে সে মুঠো ভরে ভরে দু'হাতে রাস্তার দু'পাশে ঝনঝন রুপোর টাকা ছড়াচ্ছিল, দিগ্বিদিকের খেয়াল নেই; রোখে, রাগে; সেই নির্মিমেষ দুপুরে।

কাঠ হয়ে আরও দেখলাম, সর্বনাশ, পর পর কয়েকজনকে, তারা কে কে-জানে, বোধহয় তার বয়স্যই হবে, সে দাঁড়িয়ে উঠে টুঁটি টিপে মারল, তারপর হুড়মুড়িয়ে তাদের ছুঁড়ে দিল তার বে-বল্‌গা চৌঘুড়ির চাকার নিচে। গাপল দুপুরটা ধ্বক ধ্বক জ্বলছিল।

তারও পরে, আরও সাংঘাতিক, দেখা গেল সে ধরে ধরে একটি-একটি চুম্বনের সীল মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে এক-এক জনকে, আকৃতিতে যারা রমণী, স্তম্ভিত এক-একটা বৃক্ষতলে তারা ছিন্ন লতার ন্যায় মথিত। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো কোয়া চুষে চুষে সে তুড়ির কায়দায় টোকা দিয়ে দিয়ে ছালগুলোকে টুক করে দিচ্ছিল এ-পাশে ও-পাশে। সেই রাজা। চলে গিয়েছিল-যেন তুখোর একটা হুর্‌রে!

কিন্তু সেই দিনই মধ্যরাত্রে সে যে ফিরে এসেছিল, তোমরা জানো না, তখন তাকে দ্যাখনি। সেই রাজা! দূরদূর, কিসের রাজা, দেখছনা জোব্বাটা রঙচটা,শততালি? খালি পা, কুঁজোর মতো হাঁটছে, এখন রোদ্দুর কই, সাপের পিঠের মতো শীত, হিসহিস, জিভ্ ছুঁচলো হাওয়া। নুয়ে পড়ে কী যেন হাতড়ে খুঁজছে। শুধু কাঙাল নয়, লোকটা তবে চোরও; মাটি শুঁকে শুঁকে এগোচ্ছে একটা কেন্নো। বুঝছ না? দম বন্ধ করে রাখো। দিনের দাপটে লোকটা যত টাকাকড়ি ছড়িয়ে গিয়েছিল, নতজানু রাত্রে চোরের মতো তাই কি খুঁটে নিতে ফিরে এসেছে? জোচ্চোর, বোকা! রাত্তিরে কি হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়? বেলা থাকলে তবু এই খোঁজা-খুঁজির মানে হত।

ছুঁড়ে-ফেলা টাকাকড়ি গড়িয়ে পড়েছে পাশের নালায়, কিংবা দিনমানেই অন্য কারা কুড়িয়ে নিয়েছে।

আরও দ্যাখো, হা-হা হাওয়ার এক-একটা গাছের তলায় শ্বাস নিচ্ছে লোকটা। চোখ জোনাকির মতো জ্বলজ্বল, অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে কাদের স্পর্শ চাইছে। ও জানে না, যাদের তখন সে ঠেলে ফেলে দেয়, বিসর্জিত সেই প্রতিমারা অন্তর্হিত, অপহৃত অথবা প্রতিটি গাছের তলায় ছিল অন্ধকার, সুযোগ-সন্ধানী, প্রতীক্ষমাণ ছায়ারা তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়ে প্রতিটি রমণীকে আত্মসাৎ করেছে। সেই রমণীরাও অমনই আহ্লাহিতা, কেউ আপত্তি করেনি, ভিখারীর দ্বিরাগমনের অপেক্ষায় কে বসে থাকে!

দ্যাখো, দ্যাখো সেই নকল রাজাকে, অধুনা এক ভিখারীকে। এই রাস্তায় সে আরও একবার আসবে, তাকে আসতেই হবে। তখন সে হাঁটছে না, না রাজা না ভিখারী, সকলে মিলে তাকে টানছে। তাদের মুখে ভয়ংকর সংকীর্তন, পিছনে পড়ে থাকছে-না, ছড়ানো টাকাকড়ি না কিছু খই, আর কয়েকটা নয়া পয়সা মোটে।

ইচ্ছাশক্তি

শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়

মনস্তত্ত্বের এক প্রচন্ড পন্ডিত বলিলেন, 'ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হয় না এমন কাজ নেই। যদি মরীয়া হয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারো, যা চাইবে তাই পাবে। কোনও কাজ করতে হবে না, স্রেফ মনের ইচ্ছাটাকে প্রবল একাগ্র দুর্নিবার করে তুলতে হবে। সেকালের মুনিঋষিরা কথাটা জানতেন, তাই রামায়ণ-মহাভারতে এত শাপ দেওয়ার ছড়াছড়ি।'

পন্ডিতের কথা সত্য কিনা পরীক্ষা করার প্রয়োজন যত না থাক, নিজের মনে একটা বাসনা লুব্ধভাবে কিছুদিন আনাগোনা করিতেছিল। এমন কিছু জোরালো বাসনা নয়-ভাসা-ভাসা একটা আকাঙ্ক্ষা। ভাবিলাম, দেখাই যাক্ না, কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তি খরচ করিয়া যদি কাম্য বস্তু পাওয়া যায়, মন্দ কি?

কাম্য বস্তুটি অবশ্য এমন কিছু অপ্রাপ্য বস্তু নয় -- একটি ফাউন্টেন পেন্। আমি লেখক; স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, আমি ফাউন্টেন পেন্ ভালোবাসি। আমার একটি ফাউন্টেন পেন্ আছে; যুদ্ধের আগে কিনিয়াছিলাম। এখনও বেশ ভালোই চলিতেছে। কিন্তু যাহা ভালোবাসি তাহা একটিমাত্র লইয়া কি মন ভরে? সেকালের রাজারা এতগুলি করিয়া বিবাহ করিতেন কেন? বড়মানুষেরা অনেক টাকা সত্ত্বেও আরও টাকা চায় কেন? আমার মন চাহিতেছেল -- আর একটি কলম। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে ফাউন্টেন পেনের দাম যেরূপ চড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমার মতো লেখক তো দূরের কথা, হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া আর কেহ কলম কিনিতে পারে বলিয়া তো মনে হয় না।

সুতরাং জোরসে ইচ্ছাশক্তি লাগাইয়া দিলাম। মনে মনে এই আশা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল ঃ আমি লেখক; এমন কিছু মন্দ লিখি না; নিজামের মতো কোনও ব্যক্তি যদি আমাকে একটি ফাউন্টেন পেন্ উপহারই দেন, তবে কি এতই অপাত্রে পড়িবে?

কি করিয়া ইচ্ছাশক্তিকে একাগ্র ও দুর্নিবার করিয়া তোলা যায় তাহার প্রক্রিয়া জানা না থাকিলেও, এঁটুলির মতো তাহার গায়ে লাগিয়া রহিলাম। দিবারাত্র কলমের চিন্তা করিতেছি -- কলম চাই, কলম চাই -- ইহা ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। আমি বড় একরোখা লোক; যখন ধরিয়াছি তখন ইহার শেষ দেখিয়া ছাড়িব।

কয়েকদিন এই ভাবে কাটিল, কিন্তু কলেমের দেখা নাই। একদিন একটা পারিবারিক প্রয়োজনে বাড়ির বাহির হইতে হইল। কিন্তু মনটা ইতিমধ্যে এমনই একগুঁয়ে হইয়া উঠিয়াছিল যে ট্রাম-বাসের গুঁতোগুঁতির মধ্যেও কলমের চিন্তা ছাড়িল না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার নিজের কলমটি কে কখন বুকপকেট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলাম; তারপর রাগে ব্রহ্মান্ড জ্বলিয়া গেল। কোথায় আমি 'কলম দেহি কলম দেহি' করিয়া মনে মনে মাথা খুঁড়িতেছি, আর আমার নিজের কলমটাই কোন্

শ্যালকপুত্র হাত সাফাই করিল। রাম এমন উল্টা বোঝে কেন? দুত্তোর ইচ্ছাশক্তি! মনস্তত্ত্বের পন্ডিতটার দেখা পাইলে হয়, তাহার মাথা ফাটাইয়া দিব।

কয়েকদিন বড়ই মন খারাপ গেল। তারপর হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে ডাকযোগে একটি ফাউন্টেন পেন্ ও চিঠি।

অপরিচিত ব্যক্তিটি লিখিয়াছেন যে, তিনি আমার লেখার অনুরাগী পাঠক --

অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ এই কলমটি আমাকে উপহার দিতেছেন, আমি উহা ব্যবহার করিলে ধন্য হইবেন।

কলমটি কাগজের খাপ হইতে বাহির করিয়া দেখিলাম, ঠিক আমার হারানো কলমের জোড়া! তবে নূতন -- বেশ তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

হঠাৎ মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, কলমের গায়ে একটি দাগ রহিয়াছে -- যেমন আমার কলমটিতে ছিল!

ইচ্ছাশক্তির এ কিরকম রসিকতা!

আমারই চোরা কলম কোনও ভদ্রলোক সস্তায় ক্রয় করিযা, মাজিয়া ঘষিয়া নূতন বাক্সে পুরিয়া আমাকেই উপহার দিয়াছেন।

পন্ডিতের সঙ্গে দেখা হয় নাই, হইলে জিজ্ঞাসা করিব, ইচ্ছাশক্তি এমন জুয়াচুরি করে কেন?

কালো নৌকা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

রূপমারি থেকে হিঙ্গগঞ্জ। মাঝি বলল, একটা জোয়ার লাগবে। মাঝ রাত্তিরে পৌঁছে যাবেন। তবে হাসনাবাদ যাবার তো উপায় নেই তখন। টেম্পোগাড়ি বা রিকশা পাবেন সেই সকাল বেলা। বরং থেকে যাবেন কোন দোকান-টোকানে।

বললাম থাকবার জায়গা আছে। তুমি নৌকো ছাড়ো। জোয়ারে ভরা নদী। দু'পাড়ে কাশবন বাইন আর ক্যাওড়া ঝোপ। কুয়াশার টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে হিজল কি বাবলা-পথের ধারে অন্ধ ফকিরের মত। দুপাশে অবাধ মাঠে জ্যোৎস্না কাপন্ত জলে। কাশফুলে। গাছের পাতায়। স্লেটে আঁকা অপটু হাতের গোল্লার মত ধ্যাবড়া চাঁদ-কারণ কুয়াশা দুলছিল। নির্জন মাঠের মাঝে আঘাটায় দেখি ছইবিহীন শূন্য কালো নৌকা বাঁধা। লম্বা লগি পোঁতা আছে কোণের দিকে। যার নৌকো, সে নেই কোথাও। মাঝি বলল, তাইতো। কার নৌকা? কোথায় গেল সে?

যতদূর গেলাম, মনে থেকে গেল নৌকোটা। যতদূর যাচ্ছিলাম, অলৌকিক হয়ে উঠছিল শূন্য নির্জন কালো নৌকোটা। কে এল কোত্থেকে? প্রস্তুত কিংবা প্রতীক্ষিত কিংবা সমাপ্ত? শুরু না শেষ।

নামবার সময় হলে দেখি, নিচের নদী বড় যৌনকাতর -- ছটফট করছে এতক্ষণ। যাওয়া হল না যেতে পারলাম না, এত ভয় আর দ্বিধা আর সন্দেহ! প্রস্তুত ছিল শূন্য কালো নৌকো নির্জন জ্যোৎস্নায়। অমনি থেকে গেল চিরকাল। মনের ভিতর। বোধের ভিতর। নির্জন নিঃশব্দ কালো নৌকো।

বলা ছিল, বাজারের মধ্যেই বাড়ি-ঘর, দরজায় ছাতিমগাছ। অত রাত্রেও জেগে আছে আমার জন্যে। লম্ফ হাতে গ্রামীন যুবতী বউ সলজ্জ ডেকে বলল, আসুন, আসুন আমায় বলে গেছে আপনি আসবেন কলকাতা থেকে। ও ফিরতে পারল না আজ। খবর দিয়েছে। সকালে দেখা হবে। ওই আপনার বিছানা। মুক্তো কেমন আছে? আর দেখুন, কীরকম লোক মশাই আপনি, এত যে চিঠি লিখি-জবাব পাইনে কেন? যা হবার, তা হয়েই গেছে। এত লজ্জা কিসের? আপনি তো আমায় দ্যাখেননি... পরক্ষণেই জিভ কেটে ঘোমটা টানল। .....মুক্তোর বর যে, সে আমার আপনজন ছাড়া কী! হাত মুখ ধোন। খাবার দিচ্ছি। একা আছি-আগে ওর খবরটা পেলে কুসুমের মাকে থাকতে বললাম। যাক্‌গে, আপনি তো থাকছেন। নিজের লোক।.....

আমি থ। পালাব? রান্নার ঘরে ঢুকতেই স্যাঁৎ করে কাটলাম। নির্জন পথে হাঁটতে থাকলাম। সেই নির্জন নিঃসঙ্গ কালো নৌকোটা ফের এসেছিল। আমারই জন্য সে প্রস্তুত। অথচ আমার যাওয়া হল না।

সমুদ্র যদি কাছাকাছি থাকে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল হলেই লিয়ানা সমুদ্রের ধারে নেমে আসত। ফসফেট কারখানা ছুটি হলে তারা বাবা সমুদ্রের মাছ ধরতে যাবে। সেজন্য সে ছোট ছোট চারা মাছ ধরে রাখত। এই মাছ সুরমাহ মাছের খুব প্রিয়। বাপ ছেলে খুব খাটছে। টাকা সঞ্চয় হলেই লিয়ানের বাবা তার মাকে আনতে যাবে বলেছে। কারণ লিয়ানা বড় হয়েই কেবল তার মার জন্য কাঁদে। মা যে তার, অন্য মানুষের সঙ্গে ওসানিকা দ্বীপে চলে গেছে, এবং সে যে আর ফিরে আসবে না এসব বলতে সিনাত্রার বড় কষ্ট হয়। সে বিকাল হলেই ছোট ডিঙ্গিতে লিয়ানাকে নিয়ে সমুদ্রে যায়। লিয়ানার ভয়, ঢেউ উঠলেই ভয় ক্রমে তার ভয় মরে আসে। সে একা একা ডিঙ্গি সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারে। কোন কোন দিন সে একা। যখন ঝড়ের জন্যে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারে না, জানালায় দাঁড়িয়ে ম্যান্ডোলিন বাজায়। এবং একদিন সে তার বাবাকে জাহাজ ঘাটায় দিয়ে এল। সিনাত্রা যাচ্ছে বৌকে আনতে। কারণ সিনাত্রার বড় অভাব ছিল সংসারে। বাপ বেটা দুজনে খেটে অভাব সংসারে থাকতে দেয়নি। একদিন যায়, দুদিন যায়। সে একা, একা সমুদ্রের নীল ঢেউ গুনতে গুনতে দূর সমুদ্রে হারিয়ে যায়। বড় বড় মাছ সে বেঁধে নিয়ে আসে। এবং আশা ঘরে ফিরেই দেখবে, মা-বাবা তার এসে গেছে। অথচ কেউ আসে না। দুঃখে লিয়ানা জানালায় দাঁড়িয়ে ম্যান্ডোলিন বাজায়। আবার সকাল হলে সমুদ্রে, মাছ, ডিঙ্গি, আশা বাবা মা জাহাজে করে আসছে, কিন্তু সেদিন ফিরে দেখল পাশের বাড়ির মেয়েটি ওর ঘরে এসে বসে আছে। সুন্দর নীল রঙের গাউন, লাল রঙের স্কার্ট এবং মাথায় হলুদ রঙের রুমাল। প্রচন্ড শীতে যে সব গাছের পাতা ছিল না, লিয়ানা দেখল ক্রমে তারা কুঁড়ি মেলছে। মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। লিয়ানা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে বলল, আমার মা তোমার জন্য খাবার করে পাঠিয়ে দিয়েছে। লিয়ানা কোন কথা বলল না। জানালা, দাঁড়াল। শীতের ঠান্ডায় মেয়েটা কাঁপছে। সে ওর শরীরে একটা কম্বল জড়িয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক সুরে সে ম্যান্ডোলিন বাজাল আজ। সুরটা অপরিচিত অথচ সুন্দর। জানালা থেকে দূরের সমুদ্র দেখা যায়। মেয়েটা বাজনা শুনছে না দূরের সমুদ্র দেখছে বোঝা যাচ্ছে না এখন। শুধু সে দেখতে পেল ওর সুন্দর নীল রঙের চুল সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে।

কাঁটা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটে ছিল। টিটলাগড়ে আলপথে, তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে। তুমি উঃ বলতেই আমি বললাম, দাঁড়াও, নড়ো না। তোমার পায়ে আমি হাত দেবো, এজন্য তোমার লজ্জা। তোমার পা তো ফাটা ফাটা নয়, লজ্জা কি! তোমার পা কোদালের মতন বড় বিশ্রী নয়। নরম এবং যতটা ছোট হলে মানায়। জাপানি মেয়ের মতন খুব নরম, খুব ছোট নয় অবশ্য। কোন জাপানি মেয়ের পা আমি এ পর্যন্ত হাতে ছুঁইনি যদিও।

আমি মাটিতে বসে, হাতে তোমার পা। তুমি দাঁড়িয়ে, একটু বেঁকে, শরীরের ভঙ্গি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন। তোমার লাল টুকটুকে চটি, পায়ের পাতাও লালচে। কোথায ব্যাথা? যে-খানে কাঁটা ফুটেছে। কোথায কাঁটা? আমি জানি না। ঠিক, কাঁটার কথাটা আমারই জানা উচিত। আমি তোমাব পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম। উঃ, দ্যাখো, কোথায় কাঁটা! এই তো দেখছি। আমি সত্যিই দেখছিলাম, দু'হাতের মুঠোয় তোমার নরম, যতটা ছোট হলে মানায় পায়ের পাতাটি ধরে টিটলাগড়ের সেই অবনত সন্ধ্যায আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। কাঁটা দেখিনি, দেখেছি গোলাপি রঙা সৌন্দর্য। কিন্তু কাঁটা খুঁজতেই হবে, নইলে তোমার পায়ে ব্যথা, বিষ। এই তো এখানে, খুব ছোট, প্রায় দেখাই যায় না। এত ছোট কাঁটা হাত দিয়ে তোলা যায় না। ঠোঁট দিয়ে তোলার জন্য আমি তোমার পদ চুম্বন করলাম। তুমি 'এই অসভ্য' বলে আমার মাথায় হাত রাখলে, দেবী মূর্তির মতন ভঙ্গি।

তুমি এখন স্বাধীন স্বাস্থ্যবান পায়ে অন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। আমি তোমাকে আর দেখি না। তুমি আমার দেখাও চাও না। জানি না, তোমার পদতল এখনও গোলাপি কিনা। কিন্তু সেই ছোট্টা কাঁটাটা আমি রেখে দিয়েছি, খুব গোপনে, খুব ভেতরে, লুকিয়ে। প্রায়ই টের পাই।

অপেক্ষা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানালার চৌকাঠে। দু-হাতে ধরে আছে জানালার শিক, শিকের ফাঁকে মুখ লাগানো। তার বাবা ফিরতে দেরি করছে। বাবা ফিরলে তারা সবাই দোকানে যাবে। আজ ফ্রক কেনা হবে পূজোর। কিন্তু বাবা ফিরছে না।

পাঁচ বছরের মেয়ে, সব কথা কইতে পারে। হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল -- কটা বাজে মা?

মেয়ের মা সারাদিন সেলাই করছে। মেয়ের বাবার বড় শখ হয়েছে ফতুয়া পরবে। পরশু চার গজ পাতলা লংক্লথ কিনে এনেছে। দুটো ফতুয়া সেলাই করতে করতে চোখ ঝাপসা, মাথা টিপ টিপ। মেশিনটা সরিয়ে রাখে বৌ মানুষটা। মন ভাল লাগে না। দুশ্চিন্তা হচ্ছে বড়। সাতটার মধ্যে না আসার কথা নয়।

মেয়ের মা রান্নাঘরে আসে। দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। দেরির একটাই মানে হয়। কিন্তু মানেটা ভাবতে চায় না বৌ মানুষটি, সে ঢাকনা খুলে দেখে রুটিগুলো শক্ত হয়ে গেল কিনা, সে এলে আবার একটু গরম করে ঘি মাখিয়ে কচুর ডালনার সঙ্গে দেবে। চায়ের জলটা কি বসাবে এখুনি? হাতে কেটলি নিয়ে ভাবে বৌটি। জনতা স্টোভের সলতে উসকে দিয়ে দেশলাই ধরাতে গিয়েও কী ভেবে রেখে দেয়। জল বেশি ফুটলে চায়ের স্বাদ হয় না। এসেই তো পড়বে এখুনি, তখন চাপাবো।

মেয়ে আবার চেঁচায় -- কটা বাজল মা?

বুকটা ধ্বক করে ওঠে। ঘড়ি না দেখেই বৌটি উত্তর দেয়-কটা আর! এই তো সাড়ে ছটা।

মিথ্যে কথা, প্রকৃত হিসাবে, সাতটা পেরিয়ে গেছে, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। বৌটি নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলল, না, সে নয়। ওপর তলার লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। বাবা আসছে না কেন মেয়ের প্রশ্ন।

-- এল বলে, তুই বেনিটা বেঁধে নে না ততক্ষণ।

-- বাবা আসুক।

-- আচ্ছা বাপ ন্যাওটা মেয়ে, যা হোক।

-- কেন আসছে না বাবা?

-- রাস্তাঘাটে আটকে আছে বুঝি। আজকাল বাসে ট্রামে বুঝি সহজে ওঠা যায়।

-- রোজ তো আসে।

-- আজও আসবে।

বিশ্বাস, বিশ্বাসের জোরেই বৌটি হাত মুখ ধুয়ে এসে পরিপাটি করে চুল বাঁধল। সিন্দুঁরটা একটু বেশিই ঢালল সিঁথিতে, ইদানিং বাজে সিঁদুরে চুল উঠে যায় আর মাথা চুলকোয়

বলে সিঁদুরটা কমই লাগতো। আজ কম দিল না, একটু ফাউন্ডেশন ক্রিম ঘষল মুখে, লিপস্টিক বোলালো, সূক্ষ্ম কাজলও টানলো একটু।

ঘড়ির দিকে চাইল না।

ঘড়ির কাঁটা জলস্রোতের মত বয়ে চলেছে। কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ বারবার ওপরে উঠে আসে,আরো ওপরে উঠে যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ নেমে আসে, নেমে যায়। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। সময় যাচ্ছে বয়ে।

শিশু মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমোবার আগে ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বলে-- মা, বাবা--।

বাক্যটা শেষ করে না, বৌটি আগ্রহে ঝুঁকে শুনবার চেষ্টা করে বাক্যটি। শিশুরা তো ভগবান, ওদের কথা অনেক সময়ে ফলে যায় কিন্তু শিশু মেয়েটি বাক্যটা শেষ করে না। বৌটির বুক কাঁপে।

এবার বৌটি একা, জানলার পাশে, শিকের ফাঁকে চেপে রাখা মুখ চোখের জলে ভাসে! নটা বেজে গেল বুঝি! বৌটি আসতে আসতে বুঝতে পারে, তার মানুষটা আর আসবে না। অমন মানুষটার নানা চিহ্ন তার মনে পড়ে। কথা বলার সময়ে ওপরের ঠোঁটটা বাঁ দিকে একটু বাঁক খায়, লোকটার দাঁত একটু উঁচু, গাল ভাঙা কপালের ডান দিকে একটা আঁচিল, সাবধানি ভীতু এবং খুঁতখুঁতে মানুষ, বড্ড মেয়ে ন্যাওটা আর বৌ-ন্যাওটা, এমনিতে এসব মনে পড়ে না কিন্তু এখন বড্ড মনে পড়ছে।

বৌটা হাপুস হয়ে কাঁদতে থাকে।

সদর খোলা ছিল, সিঁড়িতে শব্দ হয়নি। অন্ধকার ঘরের ভিতরে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায়, প্রশ্ন করে -- একি! সব অন্ধকার কেন? চমকে ওঠে বৌটি, বুঝতে পারে, মানুষটা ফিরেছে।

-- কী হয়েছিল শুনি!

-- আর বোলো না, সত্যকে মনে আছে?

-- কে সত্য?

-- কোন্নগরের, আমার বুজুম ফ্রেন্ড। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেল, খবর পেয়ে অফিস থেকেই গিয়েছিলুম, মনটা যে কী খারাপ লাগছে।

বৌটি আলো জ্বালে। ঘরদোর আবার হেসে ওঠে। তারা খাওয়া-দাওয়া সারে, হাসে, গল্প করে।

মানুষটা বারবারই তার মৃত বন্ধুর কথা বলে, বৌটি বলে, আহা গো!

কিন্তু বৌটি খুবই সুখী বোধ করে। কারণ তার মানুষ ফিরেছে।

মানুষটা ফিরেছে। মানুষটা বেঁচে আছে।

চিৎকার

দিব্যেন্দু পালিত

রোজকার মতো আজও শুয়েছিলাম ঠিক সময়।

আমার বিছানাটা খুবই পরিচ্ছন্ন আর আরামদায়ক। আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই যা আমার ঘুমের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করবে। শুলেই চমৎকার ঘুম আসে আমার। আর, আপনারা যাকে দুঃস্বপ্ন বলেন, সেটা যে কী বস্তু — এমনকি যথাসম্ভব ফ্রয়েড পড়েও আমি তা বুঝতে পারিনি।

তবু, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট শুনেছি সেই আর্ত চিৎকার -- মানুষের শেষতম কণ্ঠস্বর। যেন আততায়ীর ছুরি পিঠে বিঁধে হঠাৎই কেউ জীবনভিক্ষা কততে ছুটে এসেছে আমারই কাছে!

ঘুম ভেঙে গেল। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু টের পেলাম আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে নির্গত হচ্ছে অনর্গল ঘাম, আমার নিঃশ্বাস পড়ছে স্পষ্ট ও দ্রুত হয়ে, আর বুকের পাশ দিয়ে ক্রমশ করে যাচ্ছে সেই চিৎকার; 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

আলো জ্বেলে বাইরে এলাম। নির্বিকার রাতের নৈঃশব্দ্য আর পরিচ্ছন্ন বাতাস টেনে নিল আমাকে। আকাশে ফুটফুট করছে অসংখ্য তারা। এই পরিবেশে হত্যাকারীরা ফুলের মালা হাতে ঘুরে বেড়ায়।

আমার গায়ের ঘাম শুকিয়ে আসছিল। আমার নিঃশ্বাস সহজ হয়ে আসছিল। শুধু বুঝতে পারলাম না, ওই আর্তনাদ কার!

তাহলে কী সবই ভুল! নাকি ঘুমের মধ্যে নিজের চিৎকার শুনে চম্‌কে উঠেছিলাম!

বাঁচান

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

' আমি কি গাইতে জানি গান।

রাস্তা থেকে ধরে এনে করলে অপমান। '

গান জানি না বলে এই গানটা খুব গাইতাম।

মায়ের দিকে আত্মীয় একজন বড় কীর্তনীয়ার মেজো ছেলে আমার সহপাঠী ছিল। কীর্তনীয়া সম্পর্কে আমার মামা ছিলেন। তিনি অনেক জায়গায় পালা গাইতেন! তখন কলকাতা অনেক সহজ ছিল! বড় হলঘরে তিনি তিন ছেলে নিয়ে খোল কোলে বসতেন। সামনে থালা বোঝাই লেডিকিনি কিংবা পান্তুয়া থাকত।

একবার লোভে লোভে আমিও গাইতে গিয়েছিলাম। গাওয়া মানে আখর ধরে রেশের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়তে হবে। তিনখানা ভাল গলা। তার মাঝে আমার আনাড়িপনা ঢাকা পড়ে থাকবে ভেবেছিলাম।

সামনে সারিতে ভক্তিমতী বিধবারা বসেছেন। তার পাশেই শ্রীমতী নাতনীরা বসে। পেছনের দিকে যুবক, ভাবুক ও প্রৌঢ়দের জটলা।

কোনদিন আসরে বসিনি। পান্তুয়া খাব। দেখার মত অনেককে চোখের পলক না ফেলে নির্বিকারে দেখতে পাব। এই আশায় গাইতে বসেছি।

রেকর্ড শোনা অভ্যেস। ৩/৪ মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু পালাকীর্তন যে এত বড়, এত লম্বা তা আগে ভ'বিনি।

আখের রিপিট করতে করতে আধ ঘন্টার ভেতর চোয়ালে খিল ধরার জোগাড়। তবু শেষ হয় না। আমি কি গাইতে জানি গান! কোথায় কোন জায়গা ধরে ফেলে আসা চরণ বেয়ে উঠতে হবে তা কেউ কোনদিন আম্মায় শেখায়নি। হয়ত হাঁ করেছি –

কিছু একটা আওয়াজ বেরোতে যাচ্ছিল। হাঁ করেই থেমে থাকলাম। একেবারে সিনেমার প্লেব্যাক।

ভক্তিমতী বিধবারা চোখ বুজে শুনছিলেন তাঁদের পাশেই শ্রীমতী নাতনীরা খিল খিল করে হাসছে দু'একজন। আমার বিপদ বুঝতে পেরেছে। খোলে চাঁটি পড়ছে। আমি চমকে উঠেছি। অতক্ষণ পা ভাঁজ করে বসার অভ্যেস নেই। ঝি ঝি ধরেছে। উঠতেও পারি না। আবার শুধু সাউন্ডলেস হাঁ করেও থাকা যায় না।

ওঠা যায় না। থামা যায় না। পালানো যায় না।

কীর্তন থেমেছিল পুরো দেড় ঘন্টার মাথায়।

চিহ্ন

অমর মিত্র

ওই বাড়িতে একটি খুন হয়েছিল। দাঁতের ডাক্তার সুজন কুন্ডু তার বউকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সুজন কুন্ডুর বাপ, ঠাকুর্দাও ডাক্তার ছিলেন। ওই বাড়ির গায়ে যে শ্বেতপাথরের ফলকটি আছে তার গায়ে ডাঃ এল. কুন্ডু মানে ললিত কুন্ডু এবং ডাঃ এম. কুন্ডু মানে মহেন্দ্র কুন্ডুর-নাম লেখা আছে তার ঠিক উপরে কাঠের ফলকে ডাঃ এস. কুন্ডু মানে সুজন কুন্ডুর নাম খোদাই। বাড়িটা এখন ভাঙা হচ্ছে।

সুজন কুন্ডুর বউ মারা যাওয়ার পর খুব গোলমাল হয়েছিল ক'দিন। তারপর ধীরে ধীরে তা থেমেও যায়। সুজন কুন্ডুর তিনপুরুষের পয়সা, তার কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে সব শান্ত করে আবার সে মারুতির অন্ধকার কাচ তুলে চেম্বারে বেরোতে লাগল। বাড়িটার নাম হয়ে গেল ডাক্তার বাড়ি থেকে বউমারা বাড়ি। বউটিকে আমি দেখতাম, দোতলার ব্যালকনিতে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকত। কী রকম বিষন্ন দৃষ্টি। বউটির রূপ ছিল! সেই রূপের মায়ায় পড়েছিলাম আমি পথে বসে বসে। কাজ কম্মো নেই, প্রেম ছিল, সেই মেয়ে বড় চাকুরের ঘরণী হয়ে চলে গেছে, সুজন কুন্ডুর বউটিকে আমার ভাল লাগত। দীর্ঘশ্বাস পড়ত আমার। এ জীবনে কিছুই হবে না, পথে বসে বসেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

সুজনের বউ মারা গেলে আমি পাগলের মতো সুজনকে ধরতে গিয়েছিলাম, পোড়া বউকে ঘর থেকে টেনে বের করেছিলাম আমি। খুন খুন বলে চিৎকার করেছিলাম আমি। বউমারা বাড়ি নাম আমিই রেখেছি। আত্মহত্যা প্রমাণ করে সুজন বেঁচে গেছে, কিন্তু আমি তো জানি কী হয়েছিল।

সুজনদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। সুজন তাদের দোতলাবাড়ি প্রমোটারের হাতে দিয়ে বহুতল তুলছে। ওর কানে গিয়েছিল হয়ত 'বউমারা বাড়ি' কথাটা। তাই সেই বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে সেই বউ-এর সব চিহ্ন মুছে দিতে চাইছে। আমি দেখছি আমার সামনে বাড়িটা ভেঙে দিতে লাগল মজুরের দল। বড় বাড়ির পিছনের দিক থেকে ভাঙছে। চুন সুরকি ইট পাথর, রাবিশ বাইরে এনে ডাঁই করছে, লরি তা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এ বাড়িতে যে বউটি ছিল, সে যে ঘরে থাকত, সেই ঘর ভাঙা হয়ে গেছে। বিবাহের মাঙ্গলিক চিহ্ন ছিল যে দেওয়ালে তা ভাঙা হয়ে গেছে। সুজন এখন ভি. আই. পি.-র ধারে প্রোমোটারের ফ্ল্যাটে থাকে। আমি নিশ্চিন্তে ভাঙা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে মজুরদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছি। খুঁজে বেড়াচ্ছি যদি একটা চুলের কাঁটাও পাওয়া যায়। সব নিয়ে গেছে সুজন। ওর বউকে পোড়ানোর সঙ্গে চুলের কাঁটা, মাথার ফিতে সব পুড়িয়ে দিয়েছে সুজন। কিচ্ছু নেই। বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। আস্তে আস্তে বউমারা কুন্ডু বাড়ি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে উঠে দাঁড়াবে দশতলা বহুতল যার ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বউ ছেলে মেয়ে। সুজন তার নতুন বউ নিয়ে থাকবে হয়ত। খবর পেয়েছি সে আবার বিয়ে করেছে।

বাড়ি শেষ পর্যন্ত ভাঙা হয়ে গেল। গুঁড়িয়ে গেল কুন্ডু বাড়ি। বাড়িটা দেখে তবু

বোঝা যেত এখানে একটা বউ ছিল। মারুতির টাকা জোগাতে পারেনি তার বাবা, তাই সে খুন হয়েছিল। বাড়িটা থাকলে ব্যালকনি থাকত। বউটার কথা মনে পড়ত। আমি যেন দেখতে পেতোম চুল এলো করা বছর বাইশের গৌরী মেয়েটিকে। আকাশে চেয়ে থাকত সে। আকাশ ছাড়া কে দিত তাঁকে আশ্রয়। আকাশ থেকেই যেন নেমে এসেছিল কুন্ডুদের ব্যালকনিতে।

ক'দিন আগেও কুন্ডু বাড়িটা থাকলে তরুণী বধূটির কথা মনে পড়ত, তার মৃত্যুর কথা। বাড়ি না থাকা মানে সব ভুলে যাওয়া। কী ভাবে আর মনে রাখব? সুজন কুন্ডু তার বউ-এর শেষ চিহ্ন মুছে দিচ্ছে।

আজ জোছ্না রয়েছে। সুজন কুন্ডুদের ভাঙা বাড়ির স্তূপে আধো অন্ধকার আধো জোছ্নায় আমি কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছি। সব চলে যাবে, কিছুই থাকবে না। যদি এরপর আবার মোকদ্দমা, মামলা শুরু হয় কখনো? তদন্ত শুরু হয়। কী ভাবে প্রমাণ হবে এখানে একটি গৌরী কন্যা পুড়ে মরেছিল। এখানে যে একটা ডাক্তার বাড়ি, সেই বাড়িতে লম্বা ব্যলকনি ছিল তাই বা কী করে প্রমাণ হবে?

শ্বেত পাথরের ফলক এবং কাঠের ফলকটি আমি খুঁজে পেয়েছি রাবিশের ভেতরে। প্রাচীন শিলালেখর মতো আমি তা বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি আমার কুটুরিতে। প্রমাণ আমার কাছে থাকল। ফের তদন্ত শুরু হলে এই শিলালেখ দিয়েই প্রমাণ করা যাবে এখানে একটি বধূ পুড়েছিল। ফলক দুটিতে সুজনদের তিন পুরুষের নাম লেখা। সব চিহ্ন মুছতে পারবে?

একজন প্রধান শিক্ষকের জবানবন্দি

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

'শিক্ষকবার্তা' পত্রিকায় ধারাবাহিক জবানবন্দি লিখছেন সত্যচরণ মিত্র। আগামি সংখ্যার জন্য লিখছেন,

''বইয়ের ভাঁজ থেকে তুলে আনা তথাকথিত মার্কসবাদ আমাকে ষাট দশক থেকে নিয়ে গেছে শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার মিটিং-এ, মিছিলে, ধর্মঘটে। কিন্তু আজ, এই একবিংশ শতকের প্রারম্ভে, আমি এক মধ্যবিত্ত নাগরিক প্রান্তিক ধূসর জীবনে এসে দেখি 'সুখে থাকো' জীবন থেকে কবে সরে গেছে আমার প্রিয় মার্কসবাদ, আমার প্রিয় জীবনবিজ্ঞান। ভাসমান সাদা মেঘের মতো ভাবি কেন পারিনি কেন পারিনি কোনদিন কৃষকের ঘর থেকে, শ্রমিকের ঘর থেক মার্কসবাদকে তুলে আনতে। মধ্যবিত্ত সুযোগ সুবিধাবাদ থেকে আমি সরে আসতে পারিনি। ভোগপ্রিয় মধ্যবিত্ত জীবনের সুযোগ-সুবিধার বন্দিশালাকে আমি ভাঙতে পারিনি। আমার বিবেক বন্দিশালা থেকে আমাকে মুক্ত করতে পারে নি। হল্যান্ডের বিদেশী গোলাপ আমার সাজানো বাইরের ঘরে শোভা পায়। ভোরের চায়ের কাপ থেকে ছড়িয়ে পড়ে ইংলন্ড থেকে আমদানী করা ভারতীয় সুগন্ধি চা।''

ভেতরে কলিংবেলের হারমোনিয়াম বেজে ওঠে। প্রধান শিক্ষক সত্যচরণ লেখা থামান। লেখার পাতার উপর পাথর চাপা দেন। সত্যচরণ ফ্ল্যাটের অশোকচক্র লাগানো দরজা খোলেন। দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে দালাল, দালাল চন্দ্র সরকার। মুখে দেঁতো হাসি, হাতের-ব্যাগে পাঠ্য-পুস্তক। দালাল চন্দ্র সরকারকে সত্যচরণ বলেন, ' ভেতরে এসো। ওখানে বসো'। গদিআঁটা নরম সোফাটা দেখিয়ে সত্যচরণ ফ্ল্যাটের সদর বন্ধ করে দিয়ে দালালের মুখোমুখি বসেন।

এক ডজন পাঠ্য-পুস্তক হেডমাস্টারের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'লিখছিলেন বুঝি'। আত্মসুখ থেকে যে হাসিটা মুখে ছড়িয়ে পড়ে, সে রকম হাসিতে সত্যচরণ বলেন, 'এই আমাদের শিক্ষক আন্দোলন, আমাদের সততা, অসাধুতা, মার্কসীয় চিন্তাধারা এসব নিয়ে একটি ধারাবাহিক লেখা লিখছি - 'শিক্ষকবার্তা' পত্রিকায়।'

সত্যচরণের পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় তার স্ত্রী অনুরাগিনী, তার কন্যা সুখশ্রী। রান্নাঘরে বিড়ালের প্রবেশ এবং প্রস্থান যেমন সত্যচরণের স্ত্রী ও কন্যা বুঝতে পারে, ঠিক সেইরকম পাঠ্য বই প্রকাশকদের দালাল হেড মাস্টারের ঘরে এসে ওরা বুঝতে পারে। অনুরাগিনী ফুঁ দিয়ে লজ্জা সরম উড়িয়ে দিয়ে যেভাবে বছরে একবার বলতে অভ্যস্ত সেভাবে বলে, 'দালালদাদা এবার আমার জন্যে একটি বালুচরি শাড়ি চাই।' মার কথা শেষ হতেই সুখশ্রী বলে, 'দালালকাকু, এবার আমার টাইটান রিস্টওয়াচ চাই।' দালালচন্দ্র সরকার সেসব কথার চটজলদি উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে সযত্নে একটা আটহাজার টাকার চেক বের করে। সত্যচরণ মিত্রের হাতে দিয়ে বলে, 'এই নিন স্যার চেকটা। ফোনে আপনি মালিককে যেমন বলেছেন তেমনটি চেক পাঠিয়েছেন। তবু সত্যচরণ একবার চেকের টাকার অঙ্কটার উপর চোখ বোলালেন। সাথে সাথে নীচু হয়ে

অনুরাগিনী এবং সুখশ্রী দুজনেই একসাথে টাকার পরিমানটা দেখল। ওরকম একটা দৃশ্য দেখে দালাল বলে, 'এই টাকা থেকে আপনার বালুচরী, আমার সুখশ্রী মায়ের টাইটান ঘড়ি হয়ে যাবে। এর পরেও স্যারের মার্কসিস্ট লিটারেচার কেনার অর্থ থাকবে। একটু থেমে দালাল চন্দ্র প্রশ্ন করেন, 'স্যার, মালিককে কি কিছু বলতে হবে?'

সত্যচরণ উত্তর দেন, 'বলবে, দশটা বই-ই আমি পাঠ্য করে দেবো।' সত্যচরণের কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপল না, জলকম্পন হল না, সামান্য ঢিল ছুঁড়লে ডোবায় যেমনটি হয়ে থাকে।

দালালচন্দ্র সরকার চলে গেলে অনুরাগিনী ঠাকুর ঘরে এবং সুখশ্রী রঙিন টিভির ঘরে চলে গেল। সত্যচরণ আবার শিক্ষকবার্তার জন্যে জবানবন্দি লিখতে শুরু করলেন, ''আমাদের অপবিত্র বিবেককে সংশোধন করতে হবে। তা না হলে আমরা কোনদিন শিক্ষক হতে পারবো না এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, তৎসহ সামাজিক মূল্যবোধ পণ্যদ্রব্যের মতো কেনাবেচা চলতেই থাকবে....''

ঘড়ি

সাধন চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় বার ঘড়িটাকে প্রাচীন দেয়াল থেকে নামিয়ে আনা হল সুধাংশুর চিৎকারে। রঞ্জনার ভোগান্তির একশেষ। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে, ঘরে ঢুকে খাটিয়ায় বৃদ্ধ ও রুগ্ন স্বামীর অস্থির খিঁচুনি, ত্রাশ আক্রান্ত চোখ, অসুস্থ মুখমণ্ডল। দৃষ্টিপাথের দেয়ালে পুরোনো ঘড়িটার কাটাজোড়া, কোমর ভেঙ্গে আনত কোণে অসার, তবু পেণ্ডুলামটা দুলছে। ধর ছেঁড়া মুরগীর মুন্ডুটা যেমন যন্ত্রণায় কাঁপে। কতক্ষণ ধরে এ দশা চলছে কে জানে? সুধাংশু তাকিয়েই আঁতকে উঠল। ভয় পাইয়ে দিল তাকে। সময় যেন হিসেবের বাইরে লুপ্ত হয়ে গেছে। ঘর, দেয়াল, কড়িবর্গা, টেবিল, আলমারি, জলের গেলাস, পয়সা জমাবার ঘট সব কিছু ফ্রিজ - বেশি বেশি স্থাবর। ফেলে রেখে ওদের আত্মা পালিয়ে গেছে যেন। সুধাংশু বোঝাতে পারেনা, কিন্তু ব্যাপারটা কী ভীষণ গভীর থেকে হৃৎপিন্ডে চেপে বসছে! ফুসফুস অক্সিজেন খুঁজে পায়না।

এ ঘটনা দুই বাব হয়েছে আজ। রঞ্জনা পারছেনা আর। সঙ্গে সঙ্গে খুলে নিযে, চোখের আড়ালে সবিয়ে, মোড়ের দোকানেব ঘড়িওয়ালা কলকব্জা, স্ক্রু, ডালা ঘুলে বিকলত্ব ঘটবাব সংগত কারণ না পেয়ে, দু চারবার আনাড়ির মত ঝাঁকা-ঝাঁকাড়ি দিতে ফের সময় চলে। দ্বিতীয়বার ভুতুরে কান্ডে এক চোখে আইপিসের দূরবীণ লাগিয়ে, বৃদ্ধ বলেছিল- মা, কষ্ট করে লাভ নেই। দু চারটে চড় - থাবড়া দেবেন, ঠিক চলবে। ভেতর তো ঠিকঠাক, তোফা।

এবার রঞ্জনা, লোজশেডিং- এর অন্ধকারে, স্বামীকে ধমকাল। কী হয় তাতে? সুধাংশু জেনুইন হয়ে ভয়ে কুঁকড়ে আছে। কি হবে এখন! খুলে নিয়ে যাওয়া বৃথা। টুলে দাঁড়িয়ে, গায়ের জোরে পুরোণো, সুচারু ঘড়িটার গায়ে ক্রমাগত হাতের আঘাত দেয়। ঘড়ি দোলে, দেলায়ে ঘর্ষণ শব্দ হয়; তবু সময়ের লুপ্তহীনতার চিহ্ন পেরোনো যায় না। সুধাংশু বলে কেবল— শরীর কেমন করছে! সারাও! রঞ্জনা পারেনা। টুল ছেড়ে নেমে আসতেই, সুধাংশু মখে রুমাল চাপা দেয়।

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙ্গতেই, ভুলে যাওয়া সুইচে ঘরময় আলো, রুগী টের পায়। আবার সেই দৃষ্টি বরাবর দেয়ালঘড়ি। কোনো শব্দ নেই। কতগুলো নেংটি ইঁদুর ঘড়িটাকে অধিকার করে নাচছে, দৌড়চ্ছে। ঘড়িটা দুলছে মৃদু-মৃদু। কাটাছেড়া চলছে। অভ্যস্থ পথে। পেন্ডুলামের পোটাফোটা শব্দ। মনে হল সময়ের সমস্ত কলকব্জা এখন কিছু ইঁদুরকুলের অধিকার। অসুস্থ সুধাংশু শুধু দেখে যায়।

রামধনু

কিন্নর রায়

ঝমঝমে বৃষ্টির পর আকাশ আলো করে রোদ উঠে এল। গোটা আকাশটা এখন নীল বরফ। তার গায়ে রোদ্দুর পড়ে সে এক ম্যাজিক। পর পর সাতটা রঙ। সাত রঙে আঁকা রামধনু। আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা সেই আশ্চর্য বর্ণালী।

মৌড়িগ্রাম স্টেশনে তখনই একটা লোকাল ট্রেন এসে দাঁড়াল। এবড়ো - খেবড়ো প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনের গায়ে একটু আগের বৃষ্টির দাগ।

স্টেশনের ওপর গোটা তিনেক যাযাবর পরিবার। নিজেদের কাচ্চাবাচ্চা ঘর-গেরস্থালী, রান্না বান্না সামলাতে ব্যস্ত।

যিনি সাত রঙের ধনুক এঁকেছেন আকাশের গায়ে, তিনি অনেকক্ষণ ধরে ব্রাশ আর রঙের টিন নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ লাগছে। কি বিশাল ক্যানভাস, এখানে রঙ লেপে, ছিটিয়ে বড্ড আনন্দ।

সাত রঙের রামধনু দেখে স্টেশনে ঘুরে বেড়ান বানজারাদের একটা সাদাটে বাচ্চা হাততালি দিয়ে উঠল। ন্যাংটো বাচ্চার গালে কালি। মাথায় ধুলো। পায়ে গায়ে হাতে-সবখানে জমাট ময়লা। দু নাকের ফুটো দিয়ে নেমে আসছে সর্দির পাতলা মতো ধারা। নাকের নিচে মাঝে মাঝেই জিভ নিয়ে যাচ্ছে সেই ন্যাংটোপুটো।

লোকাল ট্রেন যেমন এসেছিলো, তেমন চলেও গেল।

যাত্রী নামল। যাত্রী উঠল।

আকাশে রামধনু এঁকে দিয়ে তিনি মুচকি হাসছেন।

একজন বুড়ো মাতো মানুষ চুপ করে স্টেশনের বেঞ্চে বসে। তাঁর কোথাও যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। গাড়ি ধরার ব্যস্ততা নেই। বাড়িতে ফিরলেও কিছু করার নেই। রামধনুর রঙ তাঁকে তেমন করে নাড়াচাড়া দিয়ে যেতে পারছে না। সবটাতেই বিরক্ত লাগে এখন। বুড়ো হওয়ার চেয়ে খারাপ কিছু নেই।

যিনি আকাশে রামধনুর বাহার নিজের মতো করে সাত রঙে এঁকেছেন, তিনি স্টেশনের ঐ তামাটে রঙের চুল, ইট চাপা ঘাস রঙের ছেলেটির হাততালি দেয়া দেখে মনে মনে হাসছিল। মনে একটা গর্ব হচ্ছিল। স্টেশনে বসা বুড়ো মানুষটিকে দেখে কি ভেবে তিনি সাতের পাশে আর একটি রঙও এঁকে দিলেন। শুধু আঁকলেনই না, সাতটি রঙ মুছে দিলেন সেই কালো দিয়ে।

এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বুড়ো মানুষটির মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলেন, আবার বৃষ্টি হবে! বৃষ্টির রাতে একা একা থাকতে বড্ড কষ্ট হয়। আকাশ জোড়া কালোর দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধর চোখে জল এল। আকাশে ছবি আঁকা তিনি কালি ল্যাপা ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে আলতো করে হাসলেন।

ক্ষমা

বীরেন শাসমল

আসে মানুষটা। বসে।

দুধ-সাদা আলখাল্লার ভেতর হাসপাতালের ডিরেকটর চার্লস-এর বিশাল দেহটা নড়ে ওঠে। তাঁর চোখের মধ্যেকার দুর্বোধ্য নীল গোলকের ওপর সামনের মানুষটার ছায়া। বয়েসের ভরদুপুরে তাঁর বিকেলের বিষন্নতা। সজারুর কাঁটার মত ছোট ছোট চুল। গালের মাংসপেশীতে ধস। উঁচু চোয়ালের দু'পাশে দুটো খাদান। চোখ রক্তহীন অথচ তীব্র। আলখাল্লার হাতার ভেতর ভিয়েৎনাম যুদ্ধ-ফেরৎ খাঁটি আমেরিকান মেজরের থাবার ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসা কর্মীদের মুচলেকা। ফাদারের মনে কুলকুল আনন্দ।

অনুকম্পনায় দ্রবীভূত হন ফাদার ঃ গড, ফরগিভ্ হিম।

নিরাসক্ত নির্জনতায় মানুষটা সমাধিস্থ।

"সাইন ইট।" ফাদার বাড়িয়ে দেন একটা কাগজ।

মানুষটার ভেতরে তোলপাড় জলস্রোত। ফরফর শব্দে স্মৃতির স্পুলটা ঘুরে যায় তার মনে। টাটকা কণ্ঠস্বর।

গুলাবী মুখী। অনাহারে কাতরিয়ে মরেছে। মরার সময় শীর্ণ দু'হাতের আঙুলে তাব যুদ্ধের মুদ্রা।

"রাস্তা মত্ ছোড়্ বেটা।"

নরিন্দর সিং। ফুসফুস কুরে খেয়েছে টি. বি।

মোহনের বউ দুলারী। কন্ট্রাক্টরের সাথে ভেগেছে।

বাকী? চুপ্সিয়ে যাওয়া কিছু শুক্‌নো মানুষ। রাক্ষুসে ক্ষিদের সামনে ঠুন্‌কো আত্মসম্মানের আড়ালে তুলে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। কথা ভেবে অন্ততঃ ....

"সাইন ইট।"

"এটা কি?"

"ভবিষ্যতে ক্ষতিকর কিছু করবেনা তার গ্যারান্টি।"

"কারখানা খুললে, কর্মীরা সবাই ফিরবে?"

"অব কোর্স!" লোকটা বিশ্বাস করে। আশান্বিত হয়।

ঘসঘস করে ব্যাঁকাতাড়া সইটা করে দেয় সে। ফাদারের কুঁচকে-থাকা চোখের পাতা এবার সোজা মুখমন্ডলে বিস্তৃত হয় স্বর্গীয় হাসি। ঘরের দেয়ালে একটা টিকটিকি একটা পোকাকে গিলছে। ঘরে ঢোকে দুজন লোক। লোকটার দুচোখের পাতা কুঁচকে যায়। এই ঘর এই মানুষগুলোর ভেতর পর্যন্ত সে হাতড়ায়। বাতাস শোঁকে। কিসের গন্ধ?

'ইউ আর আন্ডার অ্যারেষ্ট"।

লোকটা ধাক্কা খায়। তার চারপাশে কতকগুলো মানুষের ব্যূহ। এই মানুষগুলোই একটু আগে তাকে বাঁচতে বলেছিল। বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল আশায়। এবার সে জিগ্গেস করলো ঃ

"অভিযোগ?"
"দাঙ্গা, উস্কানি, লোক ক্ষ্যাপানো শান্তিভঙ্গ এবং ফাদারের ওপর শারীরিক নির্যাতন।"
"প্রমাণ"?
"এই স্বীকারোক্তি"–

ফাদারের হাতে মানুষটার এইমাত্র সই করা স্বীকারোক্তি। নীল গোলক স্থির। মুখের জমিতে রেখায়িত সেই স্বর্গীয় হাসিটি। মানুষটা শরীরের কোষ জুড়ে সেই হাসির ছুরি ঘুরে ঘুরে কাটছে। ধাঁ করে ঘুরে যার মানুষটা। এক ঝট্ কায় কাগজটাকে ছিনিয়ে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফ্যালে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ফাদারের মুখের নিষ্পাপ জমিতে বিদ্ধ হয় কলমের নিব। নীল গোলক লাল হয়। আধ ইঞ্চি গভীর দাগ ফেড়ে দেয় তাঁর পবিত্র মুখশ্রী।

আর্তনাদ করে ওঠেন ফাদার ঃ " হোল্ড দ্যাট উন্ডেড টাইগার টাইট।"
তিনি বলতে পারেন্না -- গড ফরগিভ্ হিম।

দূরত্ব

মিহির ভট্টাচার্য

মঞ্চের ওপর অনেক আলো। বিজলি বাতির আলো। সেখানে বসে আছে অমিতাভ বন্দোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী। পাশে নীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ি। প্রবীণ সাংসদ, পন্ডিত, বাগ্মী। ওঁরা বলবেন।

দর্শকাসনে দ্বিতীয় সারিতে বসে আছে ভাস্কর চৌধুরি। তার পাশে অজয় মিত্র। অজয়ের পীড়াপীড়িতেই ভাস্কর এই সভায় এসেছে। সত্তরের দশকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ও আত্মনিবেদিত অজয় এখন বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তি প্রচারের আন্দোলনে নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান।

এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতি। অমিতাভের কৃশ, শুষ্ক, মলিন চেহাবায় সে সময় শুধু উজ্জ্বল দুটি চোখ নজর কেড়ে নিতো। ভাস্কবের অধিকন্তু ছিলো দীপ্তি স্বপ্ন দেখার, স্বপ্ন দেখানোর। তখন আর দশজনের সঙ্গে বসে ভাস্কবের মুখ থেকে অমিতাভ শুনতো। হয়তো স্বপ্ন দেখতো, হয়তো দেখতো না। হয়তো অঙ্ক কষতো সাংগঠনিক মই বেয়ে ওঠার। এখন অমিতাভের চেহারা মুখচোখ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। চোখ দুটিতে পুবোনো উজ্জ্বলতা নেই, আছে অভিজ্ঞতার সতর্কতা। পোশাক নিপাট, একটা ধুলোর কণা থাকলে চোখে পড়ে। ভাস্করের সাধারণ চেহারা, সেই সময়ের তুলনায় ভালো চেহারা, দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতার ছোঁয়া থাকলেও স্বপ্ন মুছে যাযনি, সারল্য ধরে রাখা।

হলটি সুসজ্জিত। উপস্থিত শ্রোতারা সুবেশ-সুবেশা। মুখোচোখে চেহারায় বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের ছোঁয়া। তখনকার মাঠ, শ্রমিক এলাকা, অন্ধকাবে হ্যারিকেন জ্বালা ঘব থেকে অনেক দূরে। এখানে বিড়ি নেই, দামি সিগারেট বাইরে গিয়ে খেতে হয। প্রাণের আবেগের চেয়ে অর্জিত সৃষ্টতা সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ভাস্করের কষ্ট হচ্ছিলো। অজয় নির্বিকাব। ও যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক।

মাঝখানে বিবতি হলো। তারপর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। অজয়ের সঙ্গে লবিতে এসে দাঁড়ালো ভাস্কর। অজয়ের সিগারেট-বিড়ির নেশা আছে। ভাস্করের নেই। লবিতে যেখানে সিগারেট ধরাতে দাঁড়ালো তার হাত দুই-তিন দূরে দাঁড়িয়ে অমিতাভও সিগারেট ধরিয়েছে। ওকে ঘিরে লোকজন। তার মধ্যেও অজয়কে দেখে হাসলো। অজয় ওর দিকে পা বাড়ালো ভাস্করকে ছেড়ে। ততক্ষণে অমিতাভের চোখ পড়েছে ওর দিকে। অমিতাভের মুখে পুরোনো চেনা কাউকে দেখে উল্লাসের আলো খেলে গেলো, ওর দুটো ঠোঁট 'ভাস্করদা' শব্দ দুটি উচ্চারণ করার নিঃশব্দ ভঙ্গিমায় নড়ে উঠলো। ওর শরীরে গতি নেওয়ার শিহরণ দেখা গেলো। তারপর সবটাই ফ্রিজ হয়ে গেলো।

ভাস্কর পা বাড়াবে কি না ভাবতে ভাবতে অমিতাভ নিজেকে সামলে নিলো দেখে স্থির রয়ে গেলো। অমিতাভ অজয়ের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত।

ভাস্কর এখনও অমিতাভদের বিরোধী মতবাদের লোক বলে পরিচিত।

দরদাম

সনৎ বসু

আড়চোখে আবার মেয়েটাকে দেখে সুদীপ।

আশ্চর্য! তার দিকেই তাকিয়ে। ঠোঁটের কোণে আলতো হাসি।

এপিসি রোড — মির্জাপুর স্ট্রিট ক্রসিং। শেষ বিকেলে লোকজন গাড়ি ঘোড়ায় জমজমাট।

বাসস্টপ থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে মেয়েটা। বয়েস বড়জোর ত্রিশ-বত্রিশ। রীতিমত সুন্দরী। রানি কালারের শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ্ করা ব্লাউজ, গলার হাড়, কানের দুল মায় কপালের টিপ্‌টি পর্যন্ত। পিঠের কাছে ক্লিপ করা আঁচলের ফাঁকে গলে দৃশ্যমান সুডৌল দুই বুক।

সুদীপ চোখ ফেরাতে পারে না। সবে চল্লিশ পেরিয়েছে সে। স্ত্রী অঞ্জলি আর দু'বছরের পুত্র শুভকে নিয়ে তাব সুখের সংসার। অঞ্জলিও যৌবন প্রাচুর্যে ভরপুর, সৌন্দর্যেও অনেকের ঈর্ষার বস্তু। তবু....

সুদীপ আবার তাকায়।

আবার চোখাচোখি। এবার ভ্রুভঙ্গিতে সুস্পষ্ট ইশারা। আবিষ্ট পতঙ্গের মত পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সুদীপ।

-- কিছু বলছেন?

-- হ্যাঁ, কিন্তু এখানে নয়। মেয়েটার অর্থপূর্ণ কটাক্ষ।

আগে আগে হাঁটে মেয়েটা। পেছনে যন্ত্র চালিতের মত সুদীপ। অঞ্জলির মুখটা বার বার ভেসে ওঠে, শুভর মুখটাও। পাশাপাশি এই অচেনা যুবতীর দেহসুধা পানের অনিবার্য টান। এগলি সেগলি এঁকেবেঁকে পেরিয়ে একটা উঁচু প্রাচীরের গা ঘেঁসে থামে মেয়েটা।

— কোথায় যাবেন। হোটেল না ফ্ল্যাটে।

-- তার আগে আপনার 'রেট' টা যদি ....। মনে পড়ে কলেজ বন্ধু বিদ্যুতের কথা। 'দরদাম ঠিক না করে 'কলগার্ল' নিয়ে হোটেলে ঢুকলে সাড়ে সব্বোনাশ'। বিদ্যুৎ এখন কোথায় আছে কে জানে!

— ইফইউ ডোন্‌ট মাইন্ড, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? মেয়েটি এবার মধুকণ্ঠী।

— 'ও সিওর'। সুদীপের স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা।

ইস্ দিস্ ইয়োর ফার্স্টটাইম্ ...?

-- নো নো। সেভারেল টাইমস্। মিথ্যে বলে সুদীপ।

— আপনি ম্যারেড না আন্‌ম্যারেড?

-- আন্‌ম্যারেড।

চলুন হোটেলেই ওঠা যাক। মেয়েটা সুদীপের হাত ধরে।

— সে কী, কিছুই তো ফিক্সড হয় নি। সুদীপ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে।

-- ইউ আর টুউউ ক্রেজি...। ঠিক আছে এইট হান্ড্রেড পার আওয়ার দেবেন। লিকার

চার্জ এক্সট্রা। মেয়েটাকে এবার সত্যিকারের ব্যাপারীর মত মনে হয়।

-- ইট ইজ টুউউ মাচ্। মেক্ ইট ফোর হান্ড্রেড। সুদীপও সমানে টক্কর দেয়।

-- ইমপসিবল্। এবার খানিকটা যেন রূঢ়কণ্ঠী সেই মেয়ে।

-- দেন ফাইভ্। দিস্ মাই লাস্ট ওয়ার্ড। হাত দিয়ে চোরাপকেটে রাখা পাঁচশো টাকার নোটটা স্পর্শ করে নেয় সুদীপ।

মেয়েটাও যেন চিনতে পাবে সুদীপের শেষ সীমারেখা।

-- ওকে, কাম।

হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচে ছোট্ট ঘর। ডাব্ল বেড খাট, অ্যাটচ্ড বাথ।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে মেয়েটা। সুদীপকে জড়িয়ে ধরে চকাস্ শব্দে চুমু খায়। সুদীপ হাত বাড়িয়ে ধরতে যেতেই পিছলে সরে যায়।

এরপর পোশাক স্খলন পর্ব। দ্বিধা নেই, জড়তা নেই।

একে একে শাড়ি, ব্লাউস্, ব্রেসিয়ার, সায়া।... সুদীপের বিস্ফোরিত চোখের সামনে যুবতীব উলঙ্গ শরীর ... তার প্রতিটি খাঁজ .. গলিঘুঁজি ...।

-- কই খুলুন সব। শরীবে অদ্ভুত বিভঙ্গ করে মেয়েটা ডাকে।

উত্তেজনার গনগনে আঁচে পুড়তে পুড়তে হঠাৎ দুহাতে চোখ ঢাকে সুদীপ। নড়ে না, চড়ে না।

মেয়েটা নরম স্তনদুটো মেলে ধরে সুদীপের মুখের কাছে। স্পর্শ দেয়।

সুদীপ হিস্টিরিয়া রোগীর মত হি হি করে কাঁপে।

বন্ধ ঘরে অঞ্জলির মুখোমুখি এক বিকৃতকাম পুরুষ। তারই মত। এক হাতে গুচ্ছ করা টাকা, অন্য হাত অঞ্জলির দেহের আনাচে কানাচে ...।

-- এই নিন্ আপনার টাকা। দরজা খুলুন বাইরে যাব। চিৎকার করে ওঠে সুদীপ।

কান্না

রতন শিকদার

লোকাল ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝারি রকমের ভিড়। বসবার সিট একটাও খালি নেই, অল্প কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একজন চিনাবাদামের হকার ছাড়াও অন্য জনা চারেক হকারের গলার স্বর ছাপিয়ে একটা শিশুর তীব্র চিৎকারে সব যাত্রীই সচকিত হয়ে উঠল। খানিকটা ভেতরের দিকে একজন অল্প বয়সি লোক হাতে কয়েকটা কমলালেবু নিয়ে খদ্দেরদের দেখাচ্ছে। ওর ঝুড়িটা অরবিন্দের সামনে মেঝেতে রাখা। অরবিন্দ খবরের কাগজের মধ্যে মাথা গুঁজে পাখার নিচে দাঁড়িয়েছিল। বাচ্চাটার কান্নায় মুখ তুলে দেখল হাত তিনেক দূরে এক অন্ধ ভিখারি দম্পতি। বাচ্চাটা তার মায়ের কোলে, তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। তার চোখ দুটো থেকে জল গড়াচ্ছে দু'গাল বেয়ে। অরবিন্দ ভাবল ও বোধ হয় কমলালেবুর চেয়েছিল, ওর মা দেয়নি। তাই কান্না জুড়েছে। অরবিন্দের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। বেচারির মা-বাবা দুজনেই অন্ধ। বড় হয়ে না জানি ওর কপালে কত কষ্ট ভোগ আছে। অরবিন্দকে বেশি সময় ভাবতে হলনা। লেবুওয়ালা তার হাতের লেবুগুলো ঝুড়িতে রেখে ঝুড়িটা মাথায় তুলতে যাবে, এ সময় অরবিন্দ তাকে বলল, 'আহারে, বাচ্চাটা কী কাঁদছে। ওর বোধ হয় লেবু খাবার ইচ্ছে হয়েছে, ওর মা দেয়নি। তুমি ওকে একটা লেবু দিয়ে এসো, আমি দাম দিচ্ছি।'

অরবিন্দর কথায় লেবুওয়ালা দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'না বাবু, লেবু ও খাবে না। ওর হাতে একটা টাকা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ওর কান্না বন্ধ।'

ইতিমধ্যে অন্ধ ভিখারি দম্পতি দ্বৈতকণ্ঠে ভিক্ষা চাইতে অরবিন্দর সামনে হাজির। অরবিন্দ লেবুওয়ালার কথা পরখ করার জন্য ঠিক নয়, ওদের প্রতি করুণায় বাঁ পকেট থেকে একটা এক টাকার কয়েন বের করে বাচ্চাটার হাতে দিল। আশ্চর্য ব্যাপার, মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চার কান্না উধাও।

ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকছে। ওরা দরজার কাছে এগিয়ে গেল। অরবিন্দর মনে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব। মাত্র একটা টাকা, অথচ একটা শিশুর মুখে কেমন পরিবর্তন এনে দিল। অরবিন্দ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। স্টেশনে ট্রেন থামল। ট্রেন থেকে নামার আগ মুহূর্তে ভিখারিনী মা তার বাচ্চা মেয়ের হাত থেকে কয়েনটা কেড়ে নিল। তারপর ওরা ট্রেন থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল পরের বগির দিকে।

বাচ্চাটা তারস্বরে কান্না শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণ।

উৎসবের ধারাবিবরণী

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

নমস্কার, রাক্ষসপুরী থেকে বলছি। রাক্ষস রাজের জন্মদিনে রাক্ষসপুরী আজ দারুণ সেজেছে। গাছে গাছে কাটামুন্ড, মুন্ডকোটরে টুনিলাইট। মাইকে কান্না বাজছে। রাজার গলায় জিভের মালা। অনেকগুলো জিহ্বা গেঁথে মালাটি রচিত হয়েছে। রাজপুরী আজ আনন্দে মেতেছে, আপনারা নিশ্চয়ই হৈ হট্টগোল শুনতে পাচ্ছেন। রাজপুরীর সামনের মাঠে হস্তশিক্ষা সামগ্রী বিক্রী হচ্ছে!

জমাট রক্তের তাল ছুরিতে ছেঁচে কী সুন্দর শিল্প সামগ্রী তৈরী করেছে রাক্ষস শিল্পীরা। বিক্রী হচ্ছে স্তন চুচুকের মালা, চোখের মনির ব্রেসলেট। এক ফুঁয়ে ফুসফুস ফাটানোর প্রতিযোগিতা চলছে। এজন্য রেশনে পাওয়া ফুসফুস ব্ল্যাক হচ্ছে, দশকা বিশ দশকা বিশ করছে সদ্য শিং গজানো তরুণ রাক্ষস। ওধারে ব্রয়লার মানুষের জন্য লম্বা লাইন পড়েছে। আপনাদের নতুন করে বলার দরকার নেই, ব্রয়লার মানুষেরা খুব সুস্বাদু। কচিকচি হাড় - মাখন - চর্বি। ব্রয়লার মানুষরা জানালা বন্ধ ঘরে থাকে, অন্ধকার ঘরে রিমোটে চ্যানেল পাল্টে পাল্টে ওরা টি. ভি. দ্যাখে শুধু। তাবপর একদিন কোন সু-সময়ে টেবিলে চলে যায়, খেতে নয়, খাবার হিসেবে।

ও পাশের মাঠে ভীড় জমে উঠেছে। এখনি শুরু হবে ডানাকাটা পরীদের খেলা। রাজার জন্মদিনে এটা এক বিরাট আকর্ষণ। দেখতে পাচ্ছি জনস্তম্ভটার উপরে পরীদেব মজুত করা হযেছে। উৎসাহী রাক্ষসরা চোখে বাইনাকুলার লাগিয়েছে। একটি পরীর একটি ডানার অর্দ্ধেক ছোট স্তম্ভের উপর থেকে ধাক্কা দেয়া হ'ল। পরীটা পড়ছে, টাল খাচ্ছে, একটু ভাসতে চেষ্টা করছে, পারছেনা, টাল খেতে খেতে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে যাচ্ছে পরীটি। অন্য একটি পরীর দুটো ডানাই কেটে দেয়া হ'ল। কাঁধের কাছটায় ডানার গোড়াদুটো তিরতির করে কাঁপছে। রাজা তাঁর বাতায়ন থেকে এই পরীঝাঁপ উপভোগ করছেন।

ঐ তো পেশাইকল এসে গেল। পরীর জুস হবে। পরীর জুস।

চলুন এবার আপনাদের অন্তঃপুরে নিয়ে যাই। রাক্ষস রাজার স্ত্রীদের কলহাস্য শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। তাদের পায়ে বাঁধা ইলেকট্রনিক নূপুর। ঝুমঝুম বাজেনা, বিপ্ বিপ্ করে। পাত্র মিত্র আমাত্য রাজ কবি সবাই বগলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। এই মাত্র রাজা পরীঝাঁপ দেখে উল্লসিত বদনে ফিরলেন। জগঝম্প কাড়ানাকাড়া বিউগল সিন্থেসাইজার শিলাজিত নচিকেতা বেজে উঠল। রাজা এবার আসন গ্রহণ করেছেন। ফুসফুস ফুলোনো বেলুন দিয়ে সভাগৃহ যথেষ্ট সাজানো। রাজার সামনে একটি স্ফটিকের টেবিল। এই টেবিলেই কেক কাটা হয়। এ বছর কেক নয়, অন্য সারপ্রাইজ। বলেই ফেলি, এবছর রাজা কাটবেন একটি আইসক্রীমের নারী। ওটা স্পাইস্‌ক্রীম। রসিকতা করলাম। হাসুন!

জানতে ইচ্ছে হচ্ছে নিশ্চয়ই এবছর একটু অন্যরকম কেন! আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই রাজা একটি গন্ধর্ব যুবতী আমদানী করেছিলেন কিছুদিন আগে। রাক্ষসরাজাকে সংক্ষেপে রারা বলতে পারি। রারা ওকে লাইক করেছিলেন। শিল্পীদের দিয়ে ন্যুড আঁকিয়েছিলেন। কবিদের দিয়ে ওড্ রচনা করিয়েছিলেন, তাতে সুর দেয়া হয়েছিল, দুশো কিলোওয়াট স্পীকারে বারশো ডেসিম্যালে বাজানো

হ'ত সেই গানগুলি ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে। সেই মেয়েটিকে দেয়া হ'ত আর বেশি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পানীয়। গায়ে মাখানো হ'ত আরো ও বেশি ভিটামিন ই-ল্যানোনিন-হলুদ-চন্দন সব কিছু যুক্ত বিউটি ক্রিম, তবু ঐ মেয়েটি পালিয়ে গিয়েছিল এক তরুণ রাক্ষসের সঙ্গে। কয়েকদিন পরে দুজনার গলিত মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল শকুন মাখা। রারা মেয়েটিকে খায়নি ঠিক মত তাই রারার মনে দুঃখ ছিল।

রারার দুঃখ ছিল বলে পাত্র মিত্রদের দুঃখ আরও বেশি। তখন তারা একজন পোষা শিল্পীকে ডাক করালেন। ঐ গন্ধর্ব মেয়েটির ন্যুড সামনে রেখে ঐ শিল্পীকে বলা হ'ল-অবিকল ঐরকম একটা আইসক্রিম প্রতিকৃতি তৈরী কর। রারা ঐ আইসক্রিম নারী চেটে খাবেন।

ষোলদিন ষোলরাত জেগে ঐ ভাস্কর তৈরী করেছিলেন গন্ধর্ব নারী। ঢোকানো ছিল ডিপ ফ্রীজে। আজ বার করা হবে।

আসছে। আসছে। দেখা যাচ্ছে জরির ঝালব ঢাকা রাক্ষস সুন্দরীরা একটা ট্রলি করে টেনে আনছে ঐ অনিন্দ্য আইসক্রিম সুন্দরী। স্বর্ণচাপার মত গায়ের রং। গলায় কাজুবাদামের হার। কেশদাম রঞ্জিত। গায়ে পেস্তা-কুঁচির উল্কি।

আইসক্রিম নারীটিকে শোয়ানো হয়েছে স্ফটিকের টেবিলে। জ্বলে উঠল বাহারী আলো। রারা কি একটু উত্তেজিত? মৃতপীরদের কেটে ফেলা ডানার পাখায় স্বস্তির বাতাস দিচ্ছে সুন্দরী বাহিনী। রারার সামনে রাখা হ'ল ছুরি ও চামচ। রারা দেখছেন। দেখছেন। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওর লাল জিভ। লালাময় জিভ। রারা ছুরি তুলে নিলেন হাতে। সমবেত সুধীজন জন্মদিনের শুভ কামনায় হ্যাপি বার্থডে গাইছে। রারা ছুরি দিয়ে গন্ধর্ব নারীটির বুকের মাংস ছাচলেন। মাপ করবেন মাংস নয়, মালাই। মালাই।

ছুরিতে মালাই। বেরিয়ে এসেছে রারার জিভ। জিভ তৈরী। জিভ স্বাদ নেবে জয়ধ্বনি চলছে হাত তালি, আহ্লাদ ধ্বনি, হুলু ধ্বনি চলছে। লালা ময় লাল জিভের দিকে যাচ্ছে ছুরি।

কী হ'ল! রারা চিৎকার করে উঠলেন কেন? রক্ত। রারার জিভ কেটে মুখ থেকে পড়ে গেছে। টেবিলের উপর রারার জিভের অর্দ্ধেক লাফাচ্ছে। রক্ত ঝরছে রারার অর্দ্ধেক কাটা মুখ গহ্বর থেকে। গন্ধর্ব মেয়েটির স্থির শরীরে রাজরক্ত পড়ে যাচ্ছে। রারা সম্ভবত খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। বুকের মালাই মাখানো ছুরিটা এত জোরে কেন ঘষলেন জিভে? জিভ কি রাজতন্ত্র জানে? বেচারা খসে গেছে। করতালি থেমে গেছে। নিভেছে রোশনাই। স্ফটিক টেবিলের উপর কর্তিত রাজজিহ্বা নড়তে নড়তে স্থির হয়ে গেল। রারার হা মুখের বাকি অর্দ্ধেক জিভ এখনো অস্থির। কিছু বলতে চায় রাজা। জিহ্বাহীন উচ্চারণে গোঙানীর শব্দ মেশানো রাজার বক্তিতা চলছে। কিন্তু সেই আইসক্রিম নারী ধীরে ধীরে নিজস্ব নিয়মে গলে যাচ্ছে। শীতল হলুদ জলের ক্ষীণ স্রোতধারা এখন স্ফটিক টেবিলে পড়ে থাকা জিভের করুণ অবশেষের পাশ দিয়ে বয়ে যায়। দূর থেকে দেখে যাচ্ছি এক নীল মাছি উড়ে এসে মৃত জিভের উপরে বসেছে!

রাজার গলায় জিভের মালা।

আমি এক সামান্য ধারা বিবরণীকার। নিজের জিভের মায়া ছেড়ে আমি এখন বলি-রাজা, ও রাজা, তোমার কাটা জিভটাকে এবার তোমার গলার জিভের মালার লকেট করে নাও!

সম্পর্ক

ভগীরথ মিশ্র

কপোতাক্ষর বড় একটা ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সুপ্রভা নাছোড়বান্দা। বললেন, এখনো অবধি এমন দ্বীপবাসী হয়ে উঠিনি যে এমন একটা গভীর আনন্দের দিনে পাড়া-পড়শিদের অনাহূত রেখে দিতে হবে। বিশেষ করে যারা খুবই ঘনিষ্ঠ...। কিছু পাড়া-মহল্লা জনপদ তৈরী হচ্ছে এই মহানগরীর চারপাশে, যেগুলো বাইরে থেকে মনে হয় বুঝি পুরু কাজ দিয়ে ঘেরা। ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে সামাজিক সম্পর্ক গুলো। পড়শিদের একজন মরল, শ্রাদ্ধশান্তি চুকেবুকে গেল,পাশের ফ্ল্যাটে জানতেই পারল না। মাসখানেক বাদে মাছের বাজারে দেখা হতেই প্রশ্ন, কি পাড়াটা এখনো অবধি ঐ পর্যায়ে পৌছয়নি। এখনও পরস্পর সুখে-দুঃখে, বিপদে আপদে. ..-! সুপ্রভা সেই কারণেই অতখানি নাছোড়বান্দা। এমন একটা গভীর আনন্দের দিনে নিজের পাড়াকে অভুক্ত রেখে শুধু অফিস-কলিগদের চায়ের নেমন্তন্নে ডাকা, এটা হয় না। বিয়ের এগারো বছর পর বাচ্চা হল, সেই বাচ্চার মুখে ভাত, এমন আনন্দের মুহূর্তটুকু পাড়া-প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করতে কার না মন চায়! শেষ অবধি একটা রফা করা গেল সুপ্রভার সঙ্গে। সবাই নয়, বাছাবাছা জনাকয়েক যাদের সঙ্গে কপোতাক্ষাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি, তাদেরই কেবল নেমন্তন্ন করা হবে। তাও দশটি বাহারি পরিবার তো হবেই।

সেন বাড়ির বাহারি নাম 'সেন ভিলা'। আধুনিক ডিজাইনের ছিমছাম একতলা বাড়ি। দূর থেকে বেশ চোখ টানে। কপোতাক্ষ বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনেকক্ষণ। পাড়ার মধ্যে যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠ তাঁদের নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছেন এই সন্ধ্যায়। জানেন, সময় নেবে কাজটা শেষ করতে। প্রত্যেক বাড়িতেই একটুখানি বসতে হবে। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দাবি করে তেমনটা। সাত-আটখানা বাড়ি ঘুরতে একটা সন্ধ্যা পুরো লেগে যাবে।

'সেন ভিলা'র সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িখানাকেই দেখছিলেন কপোতাক্ষ। ভেতরে আলো জ্বলছে। সেন অবশ্যি এখনো ফেরেন নি। এখন কলিংবেল বাজালেই দরজা খুলবেন মিসেস সেন। এই পাড়ায় সুপ্রভার সঙ্গেই তাঁর যেটুকু ভাবসাব। অন্যদের সঙ্গে তেমন মেশেন না। দরজা খুলেই বলে উঠবেন, আসুন, আসুন, একা যে। মিসেস ভাদুড়ি আসেন নি? কপোতাক্ষ অপেক্ষা করতে থাকেন। এরই মধ্যে দু'-একজন পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। কেউ বা ঠোঁটের কোণে হাসল, কেউ বা দেখেও দেখল না। ঘোষদস্তিদার সাইকেলে টুংটাং আওয়াজ তুলে আসছিলেন। পাশাপাশি এসে স্পীড কমালেন, কী ব্যাপার? একা এভাবে দাঁড়িয়ে?

-- এই, এমনি। মিঃ সেনের বাড়িতে একটুখানি...।

-- সেন, এখনো ফেরেন নি?

-- না। সময় হল।

ঘোষদস্তিদার কি ভাবলেন, কপোতাক্ষর দিকে তাকাতে তাকাতে প্যাডেলে চাপ দিলেন। একটু বাদেই সেন ফিরলেন অফিস থেকে। গেটের মুখে কপোতাক্ষকে দেখে বললেন,

কি ব্যাপার?

-- এই এমনি। ফিরলেন বুঝি?

শুকনো হাসলেন সেন। গেট খুলে পায়ে পায়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

সময় বয়ে যায় তিরতিরিয়ে। সাড়ে-আটটা বাজতে চলল। কপোতাক্ষ অস্থির হয়ে ওঠেন মনে মনে। চার-পাঁচটা বাড়ি আজকেই সেরে ফেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এক বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল....। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে অনেকেই। কেউ কেউ অদ্ভুত চোখে দেখছে ওঁকে। ওদের চোখে ভারি সন্দেহজনক এই দাঁড়িয়ে থাকাটা। স্বাভাবিক।

সাইকেলে টুং-টাং শব্দ তুলে ফিরে আসেন ঘোষদস্তিদার। ভুরু কুঁচকে তাকান।

-- কি ব্যাপার বলুন তো ভাদুড়িদা? তখন থেকে 'সেন ভিলা'র সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে? এনিথিং রং?

কপোতাক্ষ কী বলবেন ভেবে পান না। চোখেমুখে অস্বস্তি চাপা থাকে না। মরিয়া হয়ে বলেই ফেলেন সমস্যাটা।

-- একটু ভারি সমস্যায় পড়েছি ভাই। আপনাকে নিজের মানুষ ভেবে বলছি। কাউকে বলবেন না যেন। ছেলের মুখেভাতে নেমন্তন্ন করব সেন দম্পতিকে। কিন্তু ওঁর নামটাই জানি নে। দরজার মুখে পৌঁছে, কার্ডের ওপর নামটা লিখতে গিয়ে... কী লজ্জার কথা বলুন দেখি। মিঃ সেন বলেই তো ডাকি। কি যেন নামটা? জানেন নাকি?

আধুনিকতা
প্রগতি মাইতি

রজত অর্কিডের সাথে দেখা করতে আসে। অর্কিড বাড়ি ছিল না। বাজারে। অর্কিডের ছ'বছরের ছেলে সৌম্যদ্বীপের সাথে কথা বলে সময় কাটাচ্ছিল রজত। ইতিমধ্যে সুকন্যা চা দিয়ে গেছে।

-- তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

-- আই এ্যাম ইন ক্লাস ওয়ান।

রজত বুঝে নেয় সৌম্যদ্বীপ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। সুকন্যা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে বসেছে।

-- রজতদা আপনার মেয়ে কোথায় পড়ে?

-- আমাদের পাড়ারই একটা স্কুলে।

-- আই.সি. এস. ই. নাকি সি. বি. এস. ই?

-- না না ওসব কিছু নয়, বাংলা মাধ্যম স্কুলে।

-- ও তাই!

এরপর রজতের চোখ পড়ে অর্কিডের প্রয়াত বাবা চিত্তপ্রসাদের ছবির দিকে। রজতকে খুব পছন্দ করতো চিত্তপ্রসাদ। রজত সৌম্যদ্বীপকে বলে -- ঐ ফটোটা কার বাবা?

-- ইটস্ মাই গ্র্যান্ড ফাদার।

-- তোমার দাদুর নাম কী বলতো?

সৌম্যদ্বীপ তার মায়ের দিকে তাকায়। সুকন্যা আম্‌তা আম্‌তা করে সৌম্যদ্বীপের হয়ে উত্তর দেয় -- আসলে ও দাদুর নাম জানে না।

রজত কিছু পরে উঠে পড়ে। সুকন্যা আর একটু অপেক্ষা করতে বলে,অর্কিড এসে পড়বে।

-- আজ যাই সুকন্যা। অর্কিডকে বোলো আমার একটু তাড়া আছে। পরে ফোন করবো।

রজত ও অর্কিড দু'জনে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত। অর্কিড ঐ সংগঠনের সম্পাদক। ঐ সংগঠনের উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য রজত অর্কিডের বাড়িতে এসেছিল। অনুষ্ঠানের অন্যতম বিষয় ছিল আলোচনা সভা। বিষয় : বিশ্বায়ন ও শিশুশিক্ষা। রজত বাড়ি ফেরার পথে ভাবে প্রধান বক্তা হওয়ার জন্য অর্কিডের নামটাই প্রস্তাব দেব।

দৌড়

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

যত তাড়াতাড়ি হাত চালানো যায় ততটাই দ্রুত গতিতে বাড়ির সমস্ত কাজ সামলাতে থাকে দিশা। ছেলের কাল ক্লাস টেস্ট। এই নম্বরগুলো ফাইনালে যোগ হয়। সুতরাং...। রোদ্দুরকে নিয়ে এই ছোটা চলছে দিশার। যেমন করেই হোক ছেলেটার রেজাল্ট ভালো করাতেই হবে। গত বছর যাচ্ছেতাই হয়েছে। এক থেকে দশের মধ্যেই নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনটা থম্ মেরে যায়। আকাশ জুড়ে পাখি, উড়ছে মন্থর। মেঘ জমছে কালো হয়ে . .। যদি বৃষ্টি নামে। তাহলে চিত্তির। এই রাস্তার যা অবস্থা হয়।

ছেলেকে তাড়া লাগিয়ে ওঠাতে গিয়ে থমকায় দিশা। 'গা যেন গবম গরম,গত দু'দিন বৃষ্টির মধ্যেই ছেলেকে পাঠিয়েছে। জোলো হাওয়া গায়ে লেগেই বোধহয়। কচি শরীব। এক একবাব তো মনে হয থাক্ পাঠাবে না। কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপার ঝড়-জল বৃষ্টি মানে না কোনো গার্জিয়ান। ছোট্ট গিনিপিগদেব নিয়ে দৌড়ায সব্বাই। অ্যাবসেন্ট হলে, বেকর্ড খারাপ। অ্যাটেনড্যান্স সর্বোচ্চ হলে বর্ষশেষে প্রাইজ মিলবে। জীবন মানেই তো কমপিটিশন্। সুতরাং শৈশব থেকেই শুরু হোক না দৌড়।

প্রেসারে সিটি পড়ছে। দৌড়ায় দিশা। ছেলেকে এক ধমক দ্যায় - "ব্যাপারটা কী তোর? আর কতক্ষণ বিছানায় থাকবি? দোলা আন্টি আজ অঙ্ক পরীক্ষা নেবে মনে আছে তো?" দোলা আন্টি র রাগি মুখটা মনে পড়তেই বুঝি রোদ্দুর একটু চোখ মেলে...।

-- "আমার শরীরটা খারাপ লাগছে মা। স্কুলে যাব না?" মাথার ভিতর আগুন এবারে তীব্র হয়। বেলা সাড়ে আট। অঙ্ক প্র্যাকটিস করাতে হবে। দিশার নিজের অফিস আছে। বলে কিনা স্কুলে যাব না।

-- স্কুলে তোমাকে যেতেই হবে। একটি কথাও নয়, উঠে পড়ো। নইলে, ... হাত উদ্ধত করে এগোতেই বিছানা ছেড়ে নামে রোদ্দুর। মার খেতে নারাজ সে।

"কি গো ছেলেকে স্কুলে পাঠাবে কি? বৃষ্টি তো শুরু হয়ে গেল।"

পৌনে দশ, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি চলছে। সঙ্গে ছেলের ঘ্যান ঘ্যান।

-- "মা স্কুলে যাব না।" মাথার ভিতর কেমন করতে থাকে। কি করবে দিশা। হঠাৎ করেই জোরে নামে বৃষ্টি। গায়ের আঁচল উড়িয়ে দিয়ে, সঙ্গে গর্জন তর্জন। সাড়ে দশে বৃষ্টি প্রবল। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াও। আগস্টের মাঝামাঝি। এখন তো বর্ষারানি পেখম মেলবেই। ভ্রু কুঁচকে বৃষ্টিকে দেখতে দেখতে ছেলের রেইন কোট বের করে দিশা। থামলে হয় বৃষ্টিটা। পাঠাতেই হবে ছেলেকে।

-- "আজ ওকে পাঠিও না।" দিতে হবে না ক্লাসে টেস্ট।"

-- "বলছ কি! এমনিতেই রেজাল্ট ভাল হয় নি।"

— "এই বৃষ্টিতে কেউ পাঠাবে না। পরীক্ষা ক্যানসেল হয়ে যাবে।"

-- "না। দেখ তুমি সক্কলে পাঠাবে। এরা কেউ নম্বর হারাতে রাজি নয়। নইলে কি আমি এত ভাবতাম....।"

দিশার বেলা একটায় যেতে হয়। স্কুলে দিয়ে আসে ছেলেকে দিশা নিজেই। হাঁটাপথে, বৃষ্টি মানেই জল কাদা। ওই সময় রিকশাও পাওয়া যায় না। দিশা বুঝে পায় না কি করবে। অখিল তো বলেই খালাস। হঠাৎ করেই রোদ্দুর শুয়ে পড়ে...।

"...মা আমার কেমন যেন লাগছে মা...।

কপালে হাত দিয়ে ঘাবড়ায় দিশা। ভাল গরম। বৃষ্টির তোড় বাড়ছে। ছেলের গায়ের তাপও যেন বাড়ছে পাল্লা দিয়ে।

ফোন করে সোহমের মাকে। ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

--"ওমা, পাঠাবে না কি গো, আজ ম্যাথ ক্লাস টেস্ট। আমার ছেলের গায়েও টেম্পারেচার আছে। তো ট্যাবলেট দিলাম, এক্ষুনি বের হচ্ছি"।

—"বলেন কি ভদ্রমহিলা। এই প্রবল বৃষ্টিতে! বেরোচ্ছেন!" অখিলও কম অবাক নয়। দিশাও একবার উদ্যোগ নেয়। আবার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন মায়া হয়।

--"আমাকে পাঠিও না মা।" পিছিয়ে যায় দিশা।

পয়লা সেপ্টেম্বর। স্কুল জুড়ে প্যান্ডেল। প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রীকে মালা পরাবে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানের ফার্স্টবয় সোহম চৌধুরি। অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে বার বার। কোথায় সোহম?

সোহম ডাক্তারের নজরবন্দিতে রাখা হয়েছে। টাইফয়েডের চূড়ান্ত আক্রমণ। তবে ক্লাস টেস্টে সোহমের নম্বর নজর কাড়া বটে!

বিকেলবেলা দিশার দু'চোখ ফেটে জল আসে। শুয়ে আছে ম্রিয়মান সোহম। রুগ্ন, ফ্যাকাশে, একা। ও যে সাহস করে বলতে পারেনি -- "মা আমি পরীক্ষা দিতে যাব না। আমার শরীর কেমন করছে।"

ওর বাবা চোখ দু'টো বলছে সেকথা। বলবেও, যতদিন সুস্থ না হবে। দিশার রোদ্দুর দৌড়েছে মাঠময় দুরন্ত। ক্লাস টেস্টে অবশ্যই জিরো।

একটি টেলিফিল্মের আউটলাইন

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দমদম এয়ারপোর্ট। অপেক্ষা করছেন এক সুন্দরী বৃদ্ধা। কি জানি কি হয়। ১৫ বছর পর পলাতক স্বামী দেশে ফিরছেন মেলবোর্ন থেকে। অধ্যাপক অবিনাশ সেন। অবসর নিয়ে জীবনের শেষ ক'টা দিন স্ত্রীর সঙ্গে শান্তি পেতে আসছেন। সেখানকার বাড়ি-গাড়ি-বাগান ফার্ণিচার সব বেচে দিয়ে শুধু একটা সুটকেশ আর সাইড-ব্যাগ নিয়ে তিনি ফিরে আসছেন।

বৃদ্ধ অবিনাশবাবু দূর থেকেই চিনেছেন। বৃদ্ধার চোখ সারিবদ্ধ মানুষের মুখে মুখে চঞ্চল। শেষে যাঁকে আন্দাজ করেছেন, তিনিই সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন।

--' সারদা, তুমি কত বদলে গেছ! ' আর কোন কথা নেই। এরপর দুজনা ট্যাক্‌সিতে। সারদা বললেন -- 'আর তুমি বুঝি আজও ইয়ং ম্যান?' বলেই আলতো করে অবিনাশের হাতে হাত রাখলেন। সারদা যদি লক্ষ্য করতেন, তবে দেখতে পেতেন বৃদ্ধের চোখ দুটো বুজে গেল। সারদা ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে। সেই সূত্রে কলকাতায় তিনখানা বাড়ি। দুখানা ভাড়া। একটায় পার্ক স্ট্রিটে নিজে থাকেন মাইনে করা লোকজন নিয়ে। নিঃসঙ্গতা ভরাতে নিচে একতলার হলঘরে সপ্তাহে দুদিন ডান্স একাডেমি, আর 'চিত্রালী' নামে আঁকার স্কুল বাকী দুদিন। নিজেই চালান। ভাড়া দেওয়া নয়।

দাম্পত্য রঙ্গরসের পরস্পর সেবাযত্নের স্পর্শ নিয়ে সারদা-অবিনাশের প্রেম দিনে দিনে ছয় মাস কেটে গেল। এরই মধ্যে পারিবারিক দূষণ একমাত্র মেয়ে-জামাই। ওরা এই পুনর্মিলন সুস্থ মনে নেয় নি। ওদের কথা -- লোকটা উড়ে এসে জুড়ে বসল। সহ্য করা অসম্ভব। যে লোকটা তাদের মা'কে এতদিন কষ্ট দিয়েছে, তার সঙ্গে মা'র এত মাখামাখিই বা কেন।

একদিন নাচের ক্লাস থেকে দোতলায় এসে সারদা দেখলেন, স্বামীর নিথর দেহ সিলিং ফ্যানে ঝুলছে। তার সারা শরীর কাঁপছিল। হাতে চা নিয়ে ভৃত্য গগন ঘরে ঢুকে হতবাক। সে তখনও জানে না ঘরের মধ্যে কী ঘটে গেছে। সারদা যন্ত্রের পাশের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। জ্বরের বিকারের মত দু-একবার উচ্চারণ করলেন 'এ তোরা কী করলি।'

পুলিশ এসে লাশ নামিয়ে দেখল গলায় নয় খানা গিঁট আর আঙুলের ছাপ। গলার পিছনে কেউ নিজের হাতে অতগুলো গিঁট দিতে পারে না। সেদিন খাস খবর বলল, সন্দেহ, খুন করে ঝোলানো হয়েছে সত্তর বছরের বৃদ্ধকে।

মেয়ে-জামাইকে তাদের উড স্ট্রীটের বাড়িতে ফোনে পাওয়া যায়নি।

সারদা দেবীর আইনজীবী মন্তব্য করলেন -- মা'র সব সম্পত্তি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স তো ওরাই পাবে। বাবার উপর এত আক্রোশ কেন! অন্ধ আক্রোশ মানুষকে ক্রিমিনালে পরিণত করে।

দেবদাস

শাহার উল ইসলাম

আজ সরলার জন্মদিন। কোটিপতি বাবার একমাত্র সন্তান। সকাল হতেই বাড়িটাতে উৎসবের ঢল নেমেছে। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবীরা আসছে বহু মূল্যবান উপহার নিয়ে। মাইকে বাজছে সুমধুর গান। গোটা অট্টালিকা রঙে উপছে পড়ছে। সুসজ্জিত সরলা পশ্চিমের ব্যাল্কনিতে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রত্যাশিত মানুষটা তো এখনো এল না। দৃষ্টি দূর থেকে দূরান্তের দিকে প্রসারিত হয়। কখন কোন দিক থেকে সে আসবে।

দু'জনে একই কলেজেব ইংরাজি অনার্সের ছাত্র-ছাত্রী। দেবু আর সরলা যেন এক গাছে ফোটা দুটি ফুল। দেবু কলেজের 'জি.এস.'। ওদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। সব কিছু জেনে শুনেও সরলা তাকে ভালবেসেছে। সে প্রকৃত মানুষ, মানবিকতাবোধ তার প্রখর।

হঠাৎ সরলা দেখতে পায় তার দেবু আসছে। হাতে একটা বই আর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। সে প্রায় নাচতে নাচতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দেবু ফুল আর বইটা এগিয়ে দেয়। চমকে ওঠে সরলা।

-- একি বই এনেছে দেবুদা? শরৎচন্দ্রের "দেবদাস"! ঝংকার দিয়ে ওঠে সরলা। 'আমাদের দেশে কি আর বই ছিলনা।' সে বিদ্যুত বেগে বই আর ফুল দেবুর হাত থেকে ছিনিয়ে ছুঁড়ে দেয় ধুলোতে। দেবু নির্বাক। তবে কি তার মনের ভাষা পড়ে ফেলেছে সরলা! তার ভালবাসা এমন আয়নার মতো স্বচ্ছ!

সহসা সরলা আকুল কণ্ঠে বলে, 'না দেবুদা। না। আমি বেঁচে থাকতে কোনদিন, কখনো তোমাকে দেবদাস হতে দেব না।'

উচ্ছ্বাসিত কান্না এড়াতে সরলা ঝড়ের গতিতে বাড়ির ভিতরে ছুটে যায়।

ছবি

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মুগ্ধ জননীর কোটি বেকার সন্তানের বিশ্বায়ন ঘটছে। কম কথা নয়। সামগ্রী নয় বদলে যাচ্ছে আধার। নিয়ন্ত্রকের সাফল্যের মুকুটে জুড়ে যাচ্ছে রঙ বাহারী পাখির পালক। করতালিতে ফেটে পড়ছে স্প্যাপ্সটিক সোস্যাইটির পরিশ্রমী পরিচর্য্যায় গড়া, খঞ্জ হাতের হাততালি। স্থানিক উল্লাস আর হাসির ছিঁটেফোটা তুলছে ঘাড়ের কাছে খাড়া নিয়ে সাংবাদিক বন্ধু অনিকেত।

লাভজনক সংস্থা বিক্রীর কোপ এল। অভিরূপ শুনল। বলিয়ে কইয়ে হিসেবে অফিসে তার একটা সুনামও আছে।

প্রথম লটের ভি.আর.এস শুরু। অভিরূপ টাকাব চেক ও প্রশংসাপত্র নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে। বাড়ি ফিববে। অন্য কলিগ্রা এসে ঘিরে ধরল যেন জ্যোতির্বলয় রচিত হয়েছে তাকে ঘিরে। আর তার শরীরটা ক্রোধ-রাগ-অভিমান-জেদ প্রভৃতি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড হয়ে আছে।

অনুরাধা পাশে এসে দাঁড়াল। পারফিউমিটিক শীতলতা ছড়িয়ে পড়ল। জানতে চাইল, এরপর কি করবেন অভিরূপদা?

জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড ধীবে ধীরে শীতল হয়ে সূর্য হয়ে উঠেছে। রশ্মি ছড়িয়ে বলল, 'শব্দ বিক্রির দোকান দেব ভাবছি।''

সূর্যের ছবিটা পশ্চিমদিকে গড়িয়ে যেতে যেতে একটি কালো চাদর ছড়িয়ে দিয়ে গেল। স্বদেশী কর্তারা আনিয়েছে পিওর বিদেশী।

লজ্জার মুখ ঢাকার জন্য কি হুড়োহুড়ি।

আলো-আঁধারের কৌণিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে অনিকেত শেষ ছবি তুলতেই পারিনি!!

অপেক্ষা

সমীর হালদার

আমি মারা গেলে তুমি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে ক'রো।

— ছি রানি! ও কথা বলবে না, তাহলে আমিও মারা যাবো।

-- আচ্ছা যদি আমাদের বিয়ে না হয়।

— প্রকৃত ভালবাসার মৃত্যু হয় না। তোমাকে নিয়ে আমি চলে যাবো অনেক ....অনেক দূরে। সেখানে গিয়ে রচনা করবো ভালবাসার ছোট্ট একটা তাজমহল। যে তাজমহলের তুমি হবে রানি আর আমি হব রাজা। কি তুমি যাবে তো রানি?

— নিশ্চই যাবো। তুমি-ই তো আমার সব। তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি। আই লাভ ইউ ভেরি মাচ্ রাজা .... আই লাভ ইউ ভেরি মাচ্। .... বিয়ের পর যতক্ষন বলবে তোমাকে আদর করবো, প্লিজ আজ আর নয়, দেরী হয়ে যাবে।

ট্রেনের জানালায় বসে রাজা যখন জীবন স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত তখন ঘড়িতে ঠিক পাঁচ'টা বেজে পাঁচ মিনিট। সূর্যাস্তের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে দীগন্তে। দূরে গাছেব ডালে বসে একটা পায়রা। অন্য ট্রেনের জানালায় বসে থাকা রানির হৃদয়ে জমে থাকা বরফ তখন নদী হয়ে বয়ে যায় সাগর সঙ্গমের দিকে। দীর্ঘ সাত বছর পর দুজনের হঠাৎ আবার দেখা। তাও আবার খড়গপুর স্টেশনে। মাত্র দশ মিনিটের জন্য। আজ থেকে সাত বছর আগে ভুল বুঝে রানি তার হৃদয়ের সিংহাসন থেকে রাজাকে সরিয়ে দেয় অনেক .... অনেক.......দূরে। রাজা চলে যায় ব্যাঙ্গালোরে। সে এখন এক মার্কেটিং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার। যাবার আগে বলে যায় সে রানির জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করবে। রানি এখন দিল্লীতে এক প্রাইভেট কোম্পানির কর্মী। আজ রানি তার ভুল বুঝতে পারে—আমাকে ক্ষমা করে দাও রাজা। তখন ভুল বুঝে তোমাকে অনেক যন্ত্রনা দিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করো প্রতি পদে আজও অনুভব করি তোমরা শূন্যতা। তুমি নতুন করে স্বপ্ন দেখো।

ট্রেনে সিটি পরে। রানির হাতে একেঁ দেয় বিদায় চুম্বন। যাবার আগে বলে যায় -- তুমি তো বলেছিলে যাকে ভালবাসবে একজনকে, যাকে সুখী করতে পারি। তাই আজও রানির জন্য আমার হৃদয়-সিংহাসনে আসন পেতে রেখেছি। তুমি সুখে থেকো। তোমার সুখ আমার শান্তি। তোমার দুঃখ আমার চোখের ফোঁটা ফোঁটা জল।

ট্রেন এগিয়ে যায় অজানা ভবিষ্যতের দিকে ....

আমার আমি

গিরীধারী কুন্ডু

জানেন, আমার না কেউ নেই। মা নেই , বাবা নেই, ভাই-বোন-বন্ধু-বান্ধবী কেউ, কেউ নেই। মনের ভেতর প্রশ্ন তাই কবর খোঁড়ে। বেঁচে আছি কার জন্যে?

ভেবে ভেবে মনস্তাত্ত্বিকের কাছে দৌড়লুম। ভদ্রলোক ত প্রথমেই বললেন, কি করেন আপনি?

-- লেখালেখি করি।

-- আর কি করেন?

-- মাঝে মাঝে এই আঁকাআঁকি করি।

-- আর কিছু না?

-- এই ধরুন খেয়াল হলে ফাঁকা রাস্তায় টো টো করে ঘুরি। আবার রাত বারটাতেও গাছের অন্ধকার ছায়ায় বসে থাকি।

জোর গলায় বললেন -- তখন কি বিশেষ কিছুর সন্ধান করেন?

-- হ্যাঁ। অন্ধ আকাশে নিজেকে খুঁজি।

হাসলেন চেয়ার কাঁপিয়ে।

আপনি তো সাংঘাতির মশাই! আরে, এসব আপনার ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্‌সের জন্যেই হচ্ছে। একা থাকেন, মনের ভেতর সমানে তাই যুদ্ধ চলে। সে সময়ে ভাবেন, সত্যি আপনার কেউ নেই। বিয়ে করুন। নতুবা ভাল বন্ধুর সঙ্গে মিশে যান। দেখবেন, এসব চিন্তা পালাবে। নিজের প্রতি হীনতাবোধও থা'কবে না।

ওঁর হাসি গরম লোহার মাথায় হাতুড়ি পেটার মত শব্দ তুলল। শিরশির করল বুক। অমনি পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই শরীরের ভেতর প্রায় তিনশ গ্রামের হৃদপিন্ড ধড়াস ধড়াস করে চলে বেড়াল। অন্ধকার মাখা ঘরে ফিরে আলো জ্বাললুম। দেখি, খাটের নিচেকার পায়ায় কাগজের মতন কি একটা গোঁজা। ইস্ যা ময়লা! তবু তুললুম। একদিক অল্প সাদা। উল্টো পিঠে লেখা।

আমার কথা যদি রাখ, তবে আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াব। দাঁড়াব, দাঁড়াব, দাঁড়াব। লক্ষ্মীটি চিঠির কথা কাউকে বলবে না কিন্তু। এ যে ওই চিঠি! কে লিখেছিল যেন? অনেক করে মনে আনার চেষ্টা করতে মনে পড়ল। একদিন অন্যমনস্কভাবে ছিমছাম এক কিশোরীর ছবি এঁকেছিলুম। সবাই জানতে চাইল, কে রে? বেশ দেখতে! না?

ওদের কিছু বললুম না। নাম দিলুম মন্দিরা। পাঁচ লিটার রক্তে ভরা সত্যিকারের মন্দিরাকে যখন গুরুতর ভাবে ভাবছি, চিন্তার পদ্মায় ডুবে যাচ্ছি, ঠিক ওই সময় এ চিঠি নিজেই লিখে ফেলি।

কাগজের গা খিমচে দলা পাকাবার সময় আবার প্রশ্ন। আমার যখন কেউ নেই, তখন কার জন্যে বাঁচা?

তিনশ গ্রামের হৃদপিন্ড বুকের দেয়ালে ধড়াস করে মারল এক ধাক্কা এই প্রথম অনুভব করলুম, আমি আমারই জন্যে বেঁচে আছি।

রক্তিম মুক্তির পাপড়ি

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ফোন বুথের দিকে যেতে যেতে পলাশ দেখল, গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে। মনে পড়ল এক লাল চোখ সন্ন্যাসীর কথা, পূর্ণিমার রাত্তিরে একা থেকো না কখনও, অন্ততপক্ষে স্ত্রী যেন সঙ্গে থাকে --

-- কেন? অন্ততপক্ষে কেন? সে হেসেছিল। সন্ন্যাসী বোধহয় বোঝেননি মজাটা, দৃষ্টি তাঁর অন্যমনস্ক, সুদূর। আপনমনে বলছিলেন, ভেসে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

চাঁদের মুখে বসন্তদাগের ছিটেগুলো দেখতে দেখতে সে ভাবে, বউকে ওসব মনে করিয়ে দিলে কেমন হয়? ধুর, বউ ফোন ধরেই না কখনও! মেয়ের সঙ্গে সামান্য দু-কথার কুশল বিনিময়ের বেশি কিইবা দরকার? কলকাতার দিকে অত কি কেউ টের পায় পূর্ণিমা-অমাবস্যা কবে?

ফোনে দু-কথার সুযোগ এল আধ-ঘন্টা বাদে। সিঁথির নতুন সিঁদুরের লালিমা মুখে ছড়িয়ে পড়া লাল সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটাকে প্রায় সাপটে ধরে দরজা জাপটে দাঁড়িয়ে আছে জিনস পরা ছেলেটি। কলকাতার দিকে অন্তত সাত-আটটা ফোন করল দুজনে। সবই শোনা যাচ্ছে। পালিয়ে বিয়ে করে দুর্গাপুর এসে বন্ধুর বাড়িতে আজই উঠেছে ওরা, একটা ভাড়া বাড়ির জন্য অনেক টাকা অ্যাডভান্স করেছে, আনুষঙ্গিক কত কি যে একাধিক জনকে বলল! এক সহৃদয় মাস্টার মশায়ের কথার জবাবেই প্রকাশ পেল, দুজনকেই নাকি নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। আশ্চর্য, তার পরের ফোনটাতেই, বন্ধুস্থানীয় হিন্দুস্থানী কোনও বউদির সঙ্গে কত মজার কথাবার্তা, তোমাদের বাড়ি গিয়ে অমুক রান্নার রেসিপি শিখে আসব -- এদিকটা একটু গুছিয়ে নিই, এইসব কত কি!

অদ্ভুত কৌতূহলে এসব শুনছিল পলাশ। নতুন বউয়ের অমন লালিমা লালিত্যে ভরা দিন তার জীবনে কখনও কি ছিল? দুইটি বাড়ির উদ্যোগে আনুষ্ঠানিক বিবাহে, বন্ধু-- আকুলতা বোধহয় একখানি থাকে না। থাকে না বিজন-বিভুঁইতে হরেকরকম সংগ্রামের মজা। অদ্ভুত কৌতূহলে দুজনকে দেখছিল সে। চেহারা কিংবা পোশাকে ছেলেটির মধ্যে তেমন স্বামীত্ব আসেনি এখনও। হয়ত সেজন্যই জাপটে ধরেছিল বুথের দরজা কিংবা লাল বউটির বাহু। কথা না শুনতে পেলে তাকে ছোট ভাই-টাই মনে হতো।

অনুষ্ঠানের বিয়ের পর বোধহয় বন্ধুবান্ধব বা বাইরের মানুষেরা সত্যিই হয়ে যায় পর। এ তো আর পরস্পর জানাশোনার শেষে ঘর বাঁধার এক্সপেরিমেন্ট নয়, বরং দুজনকে হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পরস্পরকে জানাজানি সূচনা। স্বতঃস্ফূর্ততার ঘাটতি থাকলে, একটু বেসুর বাজলেই সেই আকস্মিকতার ঘরে জড়িয়ে যায় অবসাদ, অসুখ-বিসুখ। কোন লালিমার উচ্ছ্বাস মনে আসে না পলাশের। বরং রোজকার অশান্তি এড়াতে এ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি অতিক্রান্ত যে তাগা-তাবিজ-কবজ-সংস্কার-অবিজ্ঞানের আবছা জগৎ, সেখানে বউয়ের বিহ্বল

ম্লান মুখটিই পলাশের মনে আছে। স্বামী যেন কখনো লাল জামা না পরে, ঘরের পর্দায়, বেডকভারে, বইয়ের মলাটে কোথাও যেন না থাকে লাল রঙ.....

আচ্ছা, সংগ্রামের রঙও তো লাল! তাহলে, জীবনসংগ্রাম? সহসা, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে অকালপ্রয়াত এক মাস্টারমশাইকে তার মনে পড়ে। অকালপক্ক কিশোরকূলের মহিলা-মনস্কতায় উপদেশ দিতেন, কেরিয়ার-সংগ্রামের শেষে পুরস্কারের মতন সবাই ওটা পায়, অসময়ে বেশি বেশি চাইতে নেই -

সত্যি, সবাই পায়? চাঁদের বসন্তদাগ দেখতে দেখতে ফের ভাবে পলাশ। দু-মিনিটের ফোন শেষে পথে এসে সে দেখছে, ওই তো আগে আগে চলেছে দুজন। রিকশাচালকের সঙ্গে দরদস্তুর করছে। কি যে হাসিখুশির উচ্ছ্বাস দুজনের, কি কথায় যেন রিকশাচালকও হাসছে! জ্যোৎস্না আর রাস্তার গেরুয়া হ্যালোজেনে যেন বাদামি ডানাওয়ালা পরি মনে হচ্ছে লাল ওড়নার মেয়েটাকে, সে যেন ভেসে যাচ্ছে কালো পথ ধরে, ছেলেমানুষ স্বামীটাকে ভাসিয়ে নিচ্ছে ..:

মাঝরাত্তিরে, হঠাৎ কে যে তাকে ভাসিয়ে নিল, টের পায়নি পলাশ। ঘর সংসারের অবসাদ এড়াতেই বুঝি বেশি বেশি ডুব দিয়েছিল অফিসের কাজে। আর গার্হস্থ্য অশান্তি এড়াতে, বউয়ের বদলে বইয়ের প্রতি আসক্তি তো তার লাল লাল সেই দিনগুলো থেকে বেড়েই চলেছে ক্রমে। হোটেলের বারোয়ারি রাথরুম থেকে শোবার ঘরে যেতে যেতে নিজেকে সে আবিষ্কার করল, বারান্দায় পড়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। মাথার পেছনটা ভেজা ভেজা, লাল লাল। মেঝেতে ছোপ ছোপ লালের বিন্দু।

অভ্যেস তাকে চেনা বিছানায় নিয়ে যায়। মাখো মাখো লাল হয়ে যাচ্ছে বালিশের ঢাকনা। ঘুম আসছে না, কিন্তু এমন একটা ছুটি ছুটি আনন্দ তবে আসছে কোথা থেকে? নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ — সুর থৈ থৈ করছে মস্তিষ্কে ...

ভোরের পাখিরা প্রথম ডাক দেয় যখন, ছানার জলের মতন আকাশ যখন লাল হয়ে উঠতে অনেক দেরি, তখন বারান্দায় সিনেমায় দেখা রক্তারক্তির দৃশ্যের মতন শুকনো লালচে বাদামী ছোপগুলো যেন লাল ওড়না চুঁইয়ে নামা জ্যোৎস্নার বসন্ত-ক্ষত বলে মনে হয়। ভাগ্যিস ওই রক্তিম উচ্ছ্বাসের চিৎকার বিন্দু বিন্দু প্রতিবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে! ওর মধ্যে যে সত্যি সত্যি এতখানি সংগ্রাম আর প্রাণস্পন্দন আছে, আগে তো এভাবে দেখার সুযোগ ঘটেনি!

আগুন ফুলের বিন্দু বিন্দু পাপড়ি ভেসে যাচ্ছে, ভাসিয়ে নিচ্ছে পলাশের আত্মঅবলোপী সমস্ত অবদমন, খুলে যাচ্ছে সমস্ত খর্বতা, খঞ্জতার গিঁট। যেন শাশ্বত জীবন জুড়ে জ্যোৎস্নার স্রোতে ভাসছে চিরন্তন মানুষের হৃদস্পন্দন, ফোঁটা ফোঁটা সংগ্রাম —

একটি-দুটি করে উৎকণ্ঠিত মানুষের দৃষ্টি ভিড় করছে রক্তের শুকনো ছোপ ঘিরে। গত সন্ধ্যায় দেখা ছেলেমানুষ স্বামীটির মতন, ওখানে সাপটে দাঁড়িয়ে ও বলতে চাইল, কিছু না, কিছুই না। ওগুলো আসলে আমি ...

পাসওয়ার্ড

অমিত মুখোপাধ্যায়

নেতা লোকটাকে আমার চাই-ই, না-হলে বিপদে পড়ে যাব। বকুল সব বলে দিয়েছে। রাতে কখন ফোন করতে হবে। কীভাবে নিজেকে চেনাতে হবে। সব।

অথচ ফোনেই আমার যত আড়ষ্টতা, যন্তরটা সব সময় তাড়া দিতে থাকে সংক্ষেপে কথা সারতে। ওপারে শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতির ভয় দেখায়। এত সবের মাঝে দরকারি কথা ঘুলিয়ে যেতে থাকে। তবু আজ বেপরোয়া না-হলেই নয়।

বুথের কাঁচের ওপারে একজন কম্প্যুটার খুলছে। চাবি টিপে চলেছে। যন্তরটা একগুঁয়ে, পাসওয়ার্ড দাবি করছে। ঢোকা বড় কঠিন। চারিদিক কেমন বর্মে ঘেরা পড়ে যাচ্ছে। না ফুঁড়ে পৌঁছানোর উপায় নেই কোথাও।

এতক্ষণে পেয়েছি। হ্যালো, রতনবাবু আছেন?

-- আপনি কে বলছেন? মহিলার স্বর। রতনবাবু আছেন কি নেই, সেটা বড় কথা নয়। আমি কে তার উপরই সব নির্ভর করছে। নির্ভর করছে তার থাকা না - থাকা, ধরা না ধরা।

অথচ আমাকে ধরতেই হবে। অত কথা বলে পরিচয় দিতে হলেই হয়েছে। সরাসরি রতনবাবুকেই আমার দরকার। আমি মরিয়া হয়ে বলার চেষ্টা করলাম, চিচিং ফাঁকের মত কি একটা শোনাল। তবু গুহামুখ খুলল না। বেরনো নয়, ঢোকাটাই সমস্যা আজকাল ।

ফিরে ফোন করি বকুলকে। হ্যালো।

-- আপনি কে বলছেন? বকুলের মেয়ে।

চুপ করে আছি দেখে আবার বলে, আপনি কে বলছেন, হ্যালো?

ফেলে আসা দিন

মঞ্জুলা ভট্টাচার্য

ফাগুনের আগুন ছড়ানো কৃষ্ণচূড়া আর পলাশের শাখায় উদাসী কোকিল ডাকে পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা। আকাশে বাতাসে আবির। চারিদিকে রঙের খেলা জমে উঠেছে। সব কেমন রঙের আলোয় ভরা। এ আবির ছড়ানো বাতাসে চেনা চেনা গন্ধ আর রঙ ছড়ানো। এ ভালো লাগার দিন, আর ভালবাসার দিন। কিন্তু মল্লিকার মন আজ এ ভাললাগা দিন আর ভালবাসার দিন ছাপিয়ে যেখানে শ্রাবণী, শিমূল, শুভ্রা, শুভম, ইন্দ্র, পার্থ,পায়েল, দোয়েল রঙে রাঙিয়ে নিজেদের চিনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল সেখানে, সেই দিনে।

ইন্দ্রকে তো একেবারে চিনতেই পারছিল না। ওই ফর্সা রঙ। বেগুনী আর রূপালী রঙের মিশ্রণে একটা বিমিশ্র রঙ ধারণ করেছিল। চশমাটা খুলেই সেদিন রঙ খেলতে নেমেছিল। অতএব কুতকুতে চোখে মল্লিকার কাছে এসে রং মাখাতেই পিছন থেকে শিমূল বলে উঠেচিল

— কিরে চিনতে পারছিস?

মল্লিকা দুহাতে বাধা দিতে দিতে বলেছিল— খানিকটা।

বসন্তের তির তির বাতাসে সেদিন ইক মল্লিকার আবিররাঙা মন কেঁপে উঠেছিল?

দু-তিন মাস হল মল্লিকার বিয়ে হয়েছে। দক্ষিণের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তায় রং খেলা দেখতে দেখতে বিষাদে মনটা ছুঁয়ে যায় মল্লিকার। চোখে জল নেমে আসে চুপিসাড়ে। কখনো দুমাসের নতুন সঙ্গী অলোক কখন মল্লিকার পিছনে দাঁড়িয়েছে এসে। মল্লিকা জানে না। নতুন বৌকে ওরকম হাসতে দেখে অলোক জিজ্ঞাসা করে — কিগো একা একাই হাসছ।

মল্লিকা আচমকা লজ্জা পেয়ে সরে যেতে চায়, অলোক পথ আটকায় — কেন হাসছিলে?

— ওদের দেখতে পাচ্ছিলাম।

— কাদের?

— আমার ফেলে আসা দিনগুলোকে।

অপ্রকাশিত

অনিন্দিতা চক্রবর্তী

কি তারক নতুন গল্প কিছু এসেছে, ছোটদের পাতায় দেওয়া যাবে?

— আর বলেন কেন মুখার্জী দা, আজকাল লোক যেখান থেকে যা পাচ্ছে, তাই লিখছে, এই যে এই গল্পটা দেখুন না, আনকোরা নতুন লেখক। কয়েকটা ছোট ছেলে মেয়েদের চরিত্র তৈরী করে আদতে লিখেছে একটা বড়দের গল্প। আবর ওপরে বড় বড় করে লিখে দিয়েছে 'ছোটদের জন্য'।

— বল কি হে,

— তাছাড়া, আর বলছি,কি, তাও প্লটটাও যদি নিজস্ব হত। আরে গতমাসের কাগজে দেখেননি, একটা খবর বেরিয়েছিল। কয়েকটা ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। তাদেরই মধ্যে একটা দশ আর একটা ছ'বছরের মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা লোক। অচেনা লোক দেখে ওদের মধ্যেই একটা ছেলের সন্দেহ হয়। ছেলেটা পিছু নেয়। কিছুদূর গিয়ে গাছের আড়াল থেকে দেখে লোকটা মেয়ে দুটোকে নিয়ে একটা ভাঙা মন্দিরে ঢুকে যাচ্ছে। ব্যাপার দেখে ছেলেটার সন্দেহ বাড়ে। ও থানায় খবর দেয়। পুলিশ যখন ওখানে পৌঁছায় তখন বড় মেয়েটি অলরেডি.. .., অন্যটা বেঁচে যায়। এই আর কি। এটা নিয়েই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছে।

—কই দেখি।

—এই যে।

সাদা ফুলস্কেপ পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা গল্প। 'নবপত্র' পত্রিকার এডিটর সবিতাব্রত মুখার্জী গল্পটা আগাগোড়া পড়ে দেখলেন সাব এডিটর তারক মিত্র যা বলেছে ঘটনাটা মোটামুটি তাই-ই। শুধু নতুন লেখক গল্পের আবেগপ্রবণ সমাপ্তি ঘটিয়েছে, লিখেছে অনেকগুলো দিন কেটে গেছে, গাঁয়ের লোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অন্য প্রসঙ্গে। শুধু সায়রার মা নুরজাহানের চোখের জল থামেনি। আর ওই দিনটার পর থেকে ফুটফুটে হাসিখুশি সায়রা আর কারুর সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। এখন কেউ কোনও কথা বললে ও শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ছ'বছরের রাবেয়া এখনও মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে। আর সৈয়দ বুঝতে পারে, তার আরও কিছুটা আগে যাওয়া উচিৎ ছিল ওখানে, অন্তত সায়রা-র শেষ হয়ে যাওয়ার আগে।

চোখ থেকে চশমটা খুলে টেবিলে রাখলেন মুখার্জী সাহেব। গল্পটা ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখলেন ড্রয়ারে। উনি জানেন গল্পটা কোনদিনই হয়তো প্রকাশ করতে পারবেন না।

সৈয়দ-সায়রারা যে আর ছোট নেই। আমাদের পাপ এক মুহূর্তে ওদের অনেকটা বয়স বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। ওখান থেকে কোনদিনই ওরা আর শৈশবে ফিরতে পারবে না। কোনদিন না।

টেলিফোন

বিভা বসু

ভোর হয়েছে কি হয়নি। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেছে। নহবতে বিসমিল্লা বাজছে। নীলু ছাতা মাথায় সবে বাইরে পা দিয়েছে কালো বর্ষাতি গায়ে একটি ছেলে বাড়ির সামনে বাইক থেকে নামল। হাতে বিশাল ফুলের বোকে। শুধুই লাল গোলাপ। নীলুকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ায়। রূপাকে একটু ডেকে দেবেন। রূপা তো ঘুমোচ্ছে। সে কি! এখনো ঘুমে? আজতো ওর ...। হ্যাঁ সেই জন্যই তো। অধিবাস হয়ে যেতেই ওকে বিছানায় পাঠানো হয়েছে, হিন্দু ম্যারেজের যা হুজ্জোত। তা আপনি? ছেলেটি একটু রহস্যময় হাসি হাসল। চিলবেন না, আচ্ছা, এটা ওকে দিয়ে দেবেন। ও ঠিক বুঝতে পারবে। লম্বা চওড়া চেহারার ছেলেটি একটা রহস্যের আমেজ ছড়িয়ে বাইকে স্টার্ট দিল। চন্দনা, রূপার মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। কেঁ ছিল রে? নাম বলল না। চন্দনার মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। অসিতকে ডেকে তুলল। নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ। এদিকে দে'খ কী কেলোর কীর্ত্তি হচ্ছে। অসিত কোছা সামলে কোনমতে উঠে বসল। চন্দনার কাছে ব্যাপরটা শুনে হাই তুলল। তো কি হয়েছে। কোনো বন্ধু টন্ধুই পাঠিয়েছে হয়তো। চন্দনা রেগে গনগন করে। হাজারবার বলেছি কো-এডুকেশন কলেজে পড়িও না, খেলাধূলো শিখিও না, ক্যারাটে ট্যারাটে শিখিও না। এখন গুচ্ছের ছেলে বন্ধু জুটেছে। পটুয়াটোলা লেনের মেয়ে তুমি, মনটা আর কত বড় হবে। হ্যাঁ সেতো বলবেই। জানো আমার দিদির এক বন্ধুর কনে যাত্রীর সঙ্গে গুচ্ছের ছেলেবন্ধু গিয়েছিল। ব্যাস ডিভোর্স। তুমি অত ভেবনা তো, রূপাকে ডাক। ঘুমচোখে রূপাকে দেখাচ্ছে এখন রবীন্দ্রযুগের নায়িকার মতো। তসরের শাড়ি পরেছে মা-মাসির মতো করে। আঁচলে নতুন আলমারির চাবির গোছা। গলায় দুনরি মপ্ চেন। কানে কানবালা। ব্যাপারটা শুনে বললো - তা আমি কি জানি। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকেই তো তোমরা আমাকে মাসখানেক হ'ল বাইরে বেরতে দাও না। চন্দনার কপাল থেকে তবু ভাঁজ কাটে না। এ্যাই দেখতো কোনো চিরকুট্ টিরকুট্ আছে নাকি? নীলু বোকে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যাঁ এইতো, ভালবাসা লেখা শুধু। চন্দনা খপ করে চিরকুটটা নিয়ে নেয়। এই শোন কারো কানে যেন না যায়। আত্মীয় স্বজনের কাজইতো কেবল ঘোঁট পাকানো।

বেলা হয়ে যেতেই বাড়িটা উৎসবে মেতে ওঠে কিন্তু চন্দনার মনের মেঘ কাটে না। রূপার কোনো ছেলে বন্ধুকেই সে নেমন্তন্ন করেনি। কার মনে কি আছে কে জানে। এখন ভালয় ভালয় দুহাত এক করতে পারলেই বাঁচি।

রাত সাড়ে দশটায় লগ্ন। ঠিক সাতটায় টেলিফোনটা এল। ভরাট গলা। রূপার বন্ধু রূপাকে ডেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। রূপারই ফোন। চন্দনাও পেছন পেছন গেল। এখনও কুঁচকে আছে তার কপাল। ওমা। মেয়ে দেখছি হাসে। ফরসা মুখ একটু একটু করে লাল হচ্ছে। রূপা মুখ ফেরাল। তুমি ধরবে? আমি? চন্দনা থতমত খায়। ক্ কে? তোমার হবু জামাই গো। জিজ্ঞাসা করল পেয়েছি কিনা। এবার চন্দনার মুখ লাল - লজ্জায়।

ভালোবাসার ফেরিওয়ালা

দেব চক্রবর্তী

ভালোবাসা আছে, ভা.... লো......বা.....সা.....।

কেতকী অবাস। আশ্বিনের মেঘ কাটা রোদে ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে-ভালোবাসা আছে, ভা.... লো....বা....সা....! প্রায় ষাটোর্দ্ধো বৃদ্ধ মানুষটির মাথায় কোন ঝাঁকা নেই, হাতে নেই কোন ভারী ব্যাগ, কাঁধেও বাঁক নেই। শুধু বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে পুরনো শান্তিনিকেতনী সাধারণ একটা ব্যাগ। বেশ ক্লান্ত পায়ে হাঁটছে। হাঁক দিচ্ছে অতি দুর্বল কণ্ঠে। তবু ভা.... লো......বা.....সা..... টানটায় কাকডাকা দুপুরের নৈশব্দের মতো অদ্ভুত একটা মাদকতা মিশে আছে। কেতকী কৌতুহল বসে ডেকেই ফেলল ফেরিওয়ালাকে-

ফেরিওয়ালা, ও ফেরিওয়ালা.....!

যুবতী কন্ঠের ডাক শুনে ফেরিওয়ালা পিছন ফিরে তাকায়, কিন্তু বুঝতে পাবে না ঠিক কোথা থেকে ডাক আসছে। কেতকী বারান্দার গ্রীলের বাইরে হাত নেড়ে ডাকল, 'এই যে, এদিকে'।

ফেরিওয়ালা এসে পৌছতে পৌছতে কেতকী গ্রীলের তালা খুলে দিল। চেয়ার এগিয়ে দিল বসতে। বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসল। কিছুক্ষণ দম নিয়ে বলল, তোমাদের পাড়ায় তুমিই প্রথম ডাকলে আমাকে।

কেতকী কৌতূহল চেপে না রেখে ফেরিওয়ালা সরাসরিই জিজ্ঞেস করে, আপনি কী ফেরি করেন?

ভালোবাসা, মা! সহজ শিশুর মত জবাব।

ভালোবাসা! কেতকীর চোখে মুখে বিস্ময়।

ফেরিওয়ালা আবার হেসে বলল, হ্যাঁ মা! আমার ঝোলাটা ভালোবাসায় ভরে থাকে। যারা ভালোবাসে তারাই আমাকে ডাকে। আমি তাদের সাথে ভালোবাসা কেনাবেচা করি। না, কোন অর্থের বিনিময়ে নয়। অনুভবে, হৃদয়ের আর্তিতে। মানুষের সুকোমল মনের তরঙ্গে যে তাল-সুর-লয়, সেখানে একটু খানি ঝংকার তুলে দিতে পারলে আপনা থেকেই আমার থলি ভ'রে ওঠে।

কেতকী ফেরিওয়ালার কথা শুনে অবাক, ভাবে এ কেমন হেঁয়ালির লোক রে বাবা!

জগৎ সংসারে এমন মানুষও হয় নাকি? ফেরিওয়ালা ততক্ষণে ব্যাগ থেকে বের করলো প্রায় ডিক্শনারির মত মোটা একটা খাতা। দু হাতে খাতাটি ধরে কেতকীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, যারা ভালোবাসা, ভালোবাসা, নিয়ে দু চার কথা তাদের কাছ থেকে লিখে নেওয়াই আমার কাজ। কেতকী এবার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফেরিওয়ালার ক্লান্ত মুখ অথচ উজ্বল চোখ দুটোর দিকে তাকাল। তারপর খাতার পাতা উল্টে পাল্টে ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু লেখা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলল। শেষে সাদা পাতায় এসে থামতেই ফেরিওয়ালা কলম এগিয়ে দিল-তুমিও

কিছু লিখে দাও মা।

কিন্তু কী লিখবে কেতকী? প্রেম তার কাছে আজও অধরা যে! ভালোবাসার ছোঁয়াই লাগেনি হৃদয়ে। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় বিপন্ন, ছোট এবং অবহেলিত মনে হল কেতকীর। হঠাৎ এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল খাতায়। চমকে ওঠে কেতকী। লজ্জায় তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে ফিরিয়ে দিল ফেরিওয়ালাকে।

বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা মুখ নিচু করে ব্যাগ গুছিয়ে নিঃশব্দে নেমে গেল রাস্তায়। কেতকী গ্রীলের ফাঁকে মুখ গুঁজে সামনের দিকে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে দেখলো, ফেরিওয়ালা নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে। এ পাড়া ছাড়িয়ে চলে গেল, তবু আর একবারও হাঁকলো না, 'ভালোবাসা আছে, ভা.... লো......বা.....সা.....!

রসিকতা

প্রণবেশ কর

নূতন অফিসার এই সেকশানে বদলি হয়ে এসেছেন। হাল - হকিকত জানেন না। প্রায়ই সারপ্রাইজ ভিজিট দিচ্ছেন। রমেনবাবু, আপনি দেখছি প্রায়ই লেট্। হোয়াই?

রমেন পেট চুলকে বলল ঃ স্যার, গল্পটা তাহলে বলি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে বললেন--গোপাল, সভায় আসতে তোমার প্রায়ই লেট হচ্ছে কেন? গোপাল বলল ঃ মহারাজ আমার দুজন মালিক। একজন আপনি, আর একজন আমার পরিবার। তা, একজনের মন রাখতে গেলে আর একজন মান করবেই। স্যার, আপনি আমার এক নম্বর মনিব। দুনম্বর পেটের ভেতর। ডাক্তার নিদান হেঁকেছেন--তেরমাস তিনদিন। তাই--

-- হোয়াট? তের মাস প্রেগনেনসি? লজ্জা করছে না? আপনি টাইমলি ছুটির দরখাস্ত দেবেন।

-- তারও বোধ হয় দরকার হবে না স্যার। টাইমলি ঠিক কেটে পড়ব।

-- আপনার অডাসিটি তো কম নয়! বড়বাবু --

বড়বাবু একটু বিষন্ন হাসি হাসলেন ঃ স্যার, যার প্রেগনেনসির কথা ভাবছেন তিনি হুইল চেয়ার নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছেন। রমেন নিজেকে নিয়ে একটু রসিকতা করছে। ওর পেটে ক্যানসার!

'দাদা একটু শুনবেন'

সমুদ্র ঘোষ

ট্রেনটা লেট। নৈহাটী স্টেশনে নেমেই গঙ্গার দিকে ছুটছি। লন্‌চ ধরতে হবে। চুঁচুড়া যাব। সেখান থেকে হুগলী কলেজ। প্রথম ক্লাস ১০ টায়। কাজেই তাড়া ছিল। স্টেশন চত্বর ছাড়াতেই ভিড়ের মধ্যে কাঁধে আলতো হাতের ছোঁয়া। সঙ্গে মৃদু মোলায়েম কণ্ঠের অনুনয়, 'দাদা শুনছেন?' তাকিয়ে দেখি কড়কড়ে ইস্ত্রিকরা সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, এক সুদর্শন স্মার্ট যুবক। বাঁ-হাতটা দিয়ে মুখটা আড়াল করে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, 'এদিকে একটু শুনুন'। রাস্তার ধারে নিয়ে এল। বাঁ হাতে মুখটা আড়াল করেই বলল, 'লজ্জায় বলতে পারছি না স্যার, ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া করিনি বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। একটা সেকেন্ডহ্যান্ড টাইপ রাইটার কিনব, নিজের পায় দাঁড়াতে চাই। কিছু সাহায্য করেন!' চেহারা-ছবি দেখে ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হল। কথাগুলো অবিশ্বাস করিনি। পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে দিলাম। টাকা সুদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে মুহূর্তে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আর দেখতে পেলাম না। কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগলো। তবু ভাবলাম দেশের বেকার যুবকরা যদি এভাবে স্বনিযুক্তি কর্মে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায় তবে তো খুবই আশার কথা!

ঘাটে এসে দেখি লন্‌চ্ ছেড়ে গেছে।

এরপর মাস পাঁচ-ছয় কেটে গেছে। রানাঘাট স্টেশনে বুকিং কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। যাব বহরমপুর। ময়লা ধুতি-সার্ট পরা একটি ছেলে এসে বল্ল, 'দাদা, একটু শুনবেন?' বাঁ হাতটা দিয়ে মুখের আধখানা আড়াল করা। 'ভদ্রলোকের ছেলে, চাকরি বাকরি নেই, বাবার টি.বি. একটু সাহায্য করবেন?

তাকিয়েই মনে হ'ল একে কোথায় দেখেছি। সোজাভাবে চোখের দিকে তাকিয়ে কড়া সুরেই বললাম, ' দেখুন, আপনাকে আমি চিনি, নৈহাটি স্টেশনে .... কথাটা শেষ না হ'তেই দেখি মা কালীর মতো লম্ব জিভ বার করে লোকটা সড়ৎ করে প্ল্যাটফরমের ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল, আর দেখতে পেলাম না। গম্ গম্ শব্দে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার এসে ঢুকল।

ঈজেলে নানা রং

কেতকী দত্ত

জীবনের সায়াহ্নে এসে মণিমালা একা স্বেচ্ছা নির্বসনের জন্য বেছে নিয়েছে উত্তরবাংলার ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত এই ধানজমির আলের পাশে, আকাশের সাথে কোলাকুলি করা বাড়িটাকে। বাড়িটাতে হয়তো কেউ থাকতো গতবছরও। তবে এখন মণিমালা কিনে নিয়েছে মাত্র ১৫০০ টাকায় এই তিন কামরা বিশিষ্ট অনাদরে রাখা প্রকৃতিবুকে বেড়ে ওঠা এ কুলায়। কুলায়ই বটে; কারণ মণিমালার জীবনে বারবার বাড়িছাড়া হওয়া, তারপর মাত্র বছর তিনেকের বিয়ের স্বাদের মধুরতা কাটতেই অম্লস্বাদের শুরু ও সে সম্পর্কের ইতি, একমাত্র সন্তান অনিকেতকে স্থির নিশ্চিত জীবনের ঠিকানা খুঁজে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দার্জিলিং তথা উত্তরবাংলার পথে পা বাড়ানো আর একা জীবনে অভ্যস্ত হতে হতে এখন একেবারে এখানে এসেই স্থায়ী বসবাস। মণিমালার একা লাগে না এখন। অনিকেত শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কোলকাতার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে, নিজের সংসার নিয়ে পুরোপুরি ব্যস্ত এক দায়িত্বশীল পুরুষ। মণিমালার নিস্তরঙ্গ জীবনেও বৈচিত্র্য আছে বৈকী। সকালে উঠেই নীল আকাশে নানা রং-এর খেলা দেখতে দেখতে, সে রং-এর মাঝে নিজেকে হারাত হারাতে, দুপুরের নিঃস্তব্ধতায কোনো নতুন মনন — রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে করতে আর রাতে কিছু অহেতুক আঁকাআঁকি মানে ঈজেলের বুকে অর্থহীন আঁচড় কাটতে কাটতেই সময় বেশ কেটে যায় মণিমালার।

'মা তোমার কাছে কিছুদিন থাকব, কোলকাতার চাকরি, বাড়ি আর মহুয়ার আবদার -- উঃ, হাঁফিয়ে উঠেছি, তাই তোমার কাছেই কিছুদিন থাকতে এলাম,' হঠাৎই একদিন অনিকেত একটা স্যুটকেশ আর কিছু আবশ্যক সরঞ্জাম নিয়ে এসে হাজির হয় মণিমালার কাছে।

ব্যস্ততার হাতছানি আবারও, দৈনন্দিন জীবনে। আবার নতুন করে সংসারের প্রয়োজনে লাগে সে। মণিমালা মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছিল বটে, তবে হঠাৎই উধাও হয় তা। ভালোই লাগে এই হঠাৎ ব্যস্ততা।

'হ্যাঁরে অনি, বৌমাকে আনলি না কেন?'

'না, মা, ওর তো স্কুল, তার ওপর বাচ্চাটারও তো নার্শারি ক্লাস, সবমিলিয়ে বোঝোই তো। তবে ও যে আসতে চায়নি তা নয়, আমিই, মানে একলা তোমার কাছে অনেকদিন থাকিনি তো। তাই লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'কেমন হয়েছে সন্তুটা? দুষ্টুমি করে খুব?'

'হ্যাঁ ঠিক যেমন ছিলাম ছোট্ট আমি, তোমার মুখে যেমন শুনেছি, ঠিক তেমন।'

একটু নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসে দুজনকেই। ব্যস্ত হয়ে প্রেসার কুকারের সিটি শুনেই দৌড়ায় মণিমালা রান্নাঘরে। আলুর পরোটা আর কড়াইশুঁটির শুকনো তরকারি আজকের বিকেলের মেনু। হঠাৎ দৃষ্টি অজান্তেই চলে যায় জানালার বাইরে। ছেঁড়া মেঘ, এককোণে হাল্কা চাঁদের আভাস আর সবুজের মেলায় হাওয়ার মাতন। ঈজেলে আধখানা আঁকা দু'হাত মেলে আহ্বান

জানায়। খোকা আছে যে, তারই তো সব সময়টুকু প্রাপ্য তাই না? এ'কদিন খোকা বুকের কাছে শুয়ে ঘুমিয়েছে মণিমালার। মাতৃত্বের অপূর্ব স্বাদ আবারও মণিমালা অনুভব করেছে, সম্পূর্ণ নতুন করে। পুরনো এ্যালবামটা আর মা'র আঁকা পুরনো ছবিগুলো বারবার ঘুরিয়ে ... ফিরিয়ে দেখেছে অনিকেত এ'কদিন।

আজ সন্ধ্যেয় দার্জিলিং মেলে আনিকেত যাচ্ছে। অনিশ্চিতের বুকে নয়, ওর সংসারের কাছে। ব্যস্ততায় ভরা পালের নৌকোয় দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে আসে। বিকেলের আলোর জোর কমতেই রিক্‌সা এসে হাজির। অনিকেত মাথা নুয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই মণিমালা স্থাণু। চলে যাবার সময় ঘনিয়ে এলো অনিকেতের! বুক ফাঁকা মণিমালা। দু'ফোঁটা জল এসেছিলো চোখের শুক্‌নো কোণটাতে। সংবরণ করেছে নিজেকে অতিকষ্টে মণিমালা। এক ঝলক মেঘলা বাতাস ওলটপালট করে দেয় ঘরের ভেতরটা। ঈজেলের ছবি আজ রাতেই রূপ পাবে। নিশ্চিত মণিমালা। চাঁদ ক্ষীণ থেকে স্পষ্ট হতে থাকে ক্রমে ক্রমে উত্তরবাংলার আকাশের ঈজেলে।

বর্ণনা

বিধান মজুমদার

বিসিভার তুলতেই ও পাশে মেয়ে গলা — স্যার, আর পারছি না, আপনার দ্বারস্থ। আপনাকে একটা কিছু ভাবতেই হবে। করতেই হবে।

গলাটা কার হতে পারে! চন্দ্রার, রীতার না মল্লিকার!

মেয়েদির গলাগুলো যেন কীরকম! একই রকম শোনায়। চট্ করে বুঝে ওঠা কঠিন। স্যার বলে যখন সম্বোধন করছে, ছাত্রীই হবে। আবার নাও হতে পারে। আজকালকার রেওয়াজই স্যার বলে সম্বোধন করা। কি ব্যাটাছেলে কি মেয়েমানুষ। পুরুষকে স্যার মহিলাকে ম্যাডাম। বললাম, তোমাকে ... সরি আপনাকে ঠিক ... আপনার নামটা যদি ...

ওপাশ থেকে মিহি সুরে উত্তর - অ্যাতো শিগ্‌গির গলাটা ভুলে গেলেন! স্ট্রেঞ্জ! ভারি অদ্ভুত ...!

খুবই কি চেনা! খুবই কি পরিচিত! রোজই তার গলা শুনছি! অথচ খানিক ভেবেও অস্পষ্ট। বলতেই হ'ল, সরি, খুবই দুঃখিত নামটা যদি একবার ..

— না না কিছুতেই না। গলা আপনাকে চিনতেই হবে, আর আমাকে হঠাৎ আপনি বলে ... কি যে বিশ্রী লাগছে আমার ... প্লিজ গলাটা চিনুন।

মুস্কিলে পড়া গেল। দশ বছর ধরে টিউশন করছি। কত ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েছি। এখনও পড়াচ্ছি। সবার গলা কি এই মুহূর্তে আমার ... তবে ইদানীং, আমি সিওর, যাদের পড়াচ্ছি তাদের গলা হতে পারে না।

— হ্যালো স্যার, থম্ মেরে গেলেন কেন? এখনও সিউর হতে পারলেন না! কি আশ্চর্য অথচ আপনিই একদিন বলেছিলেন, একবার কারোর গলা শুনলেই চিনতে ভোলেন না। সেটা কি গানের গলার কথা বলেছিলেন?

মহিলা কি রসিকতা করছে ... কে সে - ছাত্রী না অন্য কেউ? ছাত্রী হ'লে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে পারতাম। যাক্ গে মনে হয় নামটা বলতে অনিচ্ছুক। কোথাও বাধা আছে হয়তো। একটু অন্যভাবে ধরি।

— হ্যালো, বলছিলেন আমার দ্বারস্থ। কেন? আপনার জন্য কিছু ...

— আবার আপনি ... তাহলে তো আপনার সঙ্গে কথাই বলা যাবে না।

— দেখুন পরিচয় না পেলে আপনি বলাই রীতি। আমি ঠিক আপনাকে এখনও...

— ওহ্ তাই বলুন। আপনার স্মরণশক্তিটা ছিল প্রখর ... কেন যে ইদানীং বুঝতে পারছি ভেতরে, গোলমাল চলছে ...

— গোলমাল! কি যা তা বকছেন! গোলমাল থাকতে যাবে কেন; ও পাশে নিরুত্তর। যত সব খেজুরে আলাপ। অনর্থক সময় নষ্ট। ছাত্রীটাত্রী নয়। বাজে ... সব বা... জে! ফোনটা ক্রেডেলে রেখে পাক খাচ্ছি। কে হাতে পারে ... আবার ফোনটা বেজে উঠল, ঝাঁঝালো গলা, -

- স্যার এভাবে অপমান করলেন! কতদিন বাদে ভাবুন তো! আর এই কতদিন আপনি যে কিভাবে পাক খাচ্ছেন! ভাবলে কষ্ট হয়।

— পাক খাচ্ছি! আপনার কষ্ট হয়! আচ্ছা ধেষ্টামি তো! কার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! - হ্যালো, আপনি যা তা বকছেন। আপনার নামটা না বলা পর্যন্ত কিন্তু একটি কথাও ...

— হ্যাঁ স্যার, আমি জানি এটাই আপনি বলবেন। নামের মধ্যেই তো ধরা থাকে সবকিছু, ভাব, ভালবাসা, প্রেম, ঐশ্বর্য গর্ব সবকিছু। আমি রিমি, আপনি দিয়েছিলেন মানসী। যখন কলেজে পড়তাম, আপনি রবি ঠাকুরের কি কবিতা পড়াতে পড়াতে যেন আমার চেহারা ও মনের যে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে এখনও আমি গর্ববোধ করি। তখনও করেছিলাম, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন অনেককে বলেছিলাম। তারা কি বলেছিল জানেন ... যাক গে, আয়নার সামনে দাঁড়ালে এখন আর কিছু মেলাতে পারি না। বুকে উঠে আসে কষ্ট। তবে কি আমার জন্য ভাবছেন ... নাহ্, তা নয় ...

কার জন্য কি ভাবছেন ... বিরক্তির সঙ্গে বললাম, তা আমি কি করতে পারি!

মানসী মিষ্টি হাসল। হাসিটা আমি শুনলাম। সেই শিউলির হাসি। ভোরের শিশিরমাখা চোখের পাতা, মাখন রং, মাখন মসৃন ত্বক, ঢাউস চুল, চুড়ো করে বাঁধা। টিয়া নাক, চাঁদ কপাল। চেরা ঠোঁটে গিরিখাত। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে উপত্যকা।

— স্যার, আপনিই তো সব! ইচ্ছে করলেই ... আপনি না বললেও খবরে প্রকাশ যে আমার মতই ... আমার চেহারার যে রকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, ঠিক যে বর্ণ, অমর শব্দ বাক্যে সেভাবেই বর্ণনা সাজিয়ে পাত্রীর জন্য পেপারে পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে। পান নি নিশ্চয়ই। খোঁজ নিয়েছি, পাবেনও না। একটু উল্টো পাল্টা করে দিলেই কিন্তু পেতেন। সেটা পারেন নি। কারণ আমার সবটাই আপনার মনে ধরে আছে।

জলছবি

আনসার উল হক

শীত এখনো জাঁকিয়ে পড়েনি। তবে উত্তুরে হাওয়া আছে। গরম পোশাক ছাড়া শরীরটা যেন নিজের ভেতর কুঁকড়ে থাকে।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। বারুইপুরে ন'টার লোকাল পাইনি। অগত্যা ডায়মন্ডলক্ষ্মীর ওপর ভরসা। এ গাড়িতে গেলে কোনদিন অফিস হয়, কোনদিন হয় না। কলকাতার এক সওদাগরী আপিসে কাজ। লেট হলেই আর রক্ষে নেই। উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারী করছি। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি দেখলাম বেশকিছু লোকের জটলা। উঁকি মেরে দেখলাম, নাচ আর গান-বাজনা চলছে। বিনা টিকিটে নাচ গান মন্দ লাগে না।

বছর পঞ্চাশের একজন সাদাসাপটা লোক, প্রায় ছ'ফুটের ওপর লম্বা। দু-গালে কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথার চুলে কাকের বাসা। গায়ে একটা সাদা স্যাডো গেঞ্জি। পরনে আটপৌরে ধুতি, হাঁটুর ওপর তোলা। বাম পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, হাতে খঞ্জনী। যেন একাই একশ। লোকটার নাচের কায়দা দেখলে হাসি পায়। তিড়িং বিড়িং করে লাফ দিয়ে খুব দ্রুত ডাইনে বামে ঘুরে যাচ্ছে। সঙ্গে নিজের সুরে মজার গান। দর্শক শ্রোতারাও আনন্দে ভাসছে। মেঝেতে পাতা গামছায় দু'চার পয়সা পড়ছে।

আমি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। নিজেকে ওদের জীবনের আয়নায় দেখতে গিয়ে চুপসে গেলাম। গান শেষ হলে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম। নাম জিজ্ঞেস করতে বলল, রসময। স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল, নামের সঙ্গে কাজের মিল তো বেশ। বললাম, - তুমি তো খুব সুন্দর নাচো! এত বেশি বয়সে এত লোকের সামনে নাচতে তোমায় লজ্জা করে না? বাড়িতে আর কে কে আছে?

বাবু, লজ্জা তো হয়, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। বাড়িতে আমার বড় মেয়ে আছে। সামনের আশ্বিনে তার বিয়ে দিতেই হবে। জোয়ান মেয়ে। ফনফন করে বেড়ে উঠছে। নাচ থামানো মানে নির্ঘাৎ তার বিয়ে বন্ধ। তার মা নেই। কেউ নেই.....।

বলতে বলতে রসময়ের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল। বুঝলাম সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। এতক্ষণ জীবনের কষ্টের দিকটা ভুলেই ছিল। নিজেকে দোষী মনে হল। ভাবলাম, পৃথিবীর দুঃখ শোক সব লুকিয়ে এরা মানুষকে কেমন সুন্দরভাবে হাসায়, আনন্দ দেয়। পকেট থেকে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিতেই সে সেটাকে একাধিকবার কপালে ঠেকিয়ে আমায় প্রণাম করলে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। সেদিন আমার অফিস হল না। কিন্তু তার পায়ের ঘুঙুরের মধ্যে দেখতে পেলাম আমাদের চলমান জীবনের জলছবি।

প্রেম

নিখিলরঞ্জন মাইতি

এতো করে বলছি একটা মেয়ে রাখ। আর পারছি না বাবা। ছেলে-মেয়ে, রান্না - বান্না, কাজ কর্ম

অফিস টাইম। নাকে মুখে গুঁজছিল দিব্যেন্দু। তবুও উত্তরটা না দিয়ে থাকতে পারলো না। বললো -- তুমি তো জানো সবই। এই মাইনেতে --

-- মাইনে? বিয়ে করেছিলে কেন?

কেন! মনে মনে একটু হাসলো দিব্যেন্দু। অনেক কিছু বলার ছিল। তবুও কিছুই বললো না। যন্ত্র চালিতের মতো আধময়লা জামাটা গায়ে চড়িয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। আগে পিছে অতো খেয়াল করেনি সে। ঘরের কথা গুলোই যেন প্রতিধ্বনির মতো কানে বাজছিল তার ... ..!

আর কিছুই মনে নেই দিব্যেন্দুর। জ্ঞান হতে দেখলো ডাক্তার.....নার্স......আর হাসপাতালের ছোট্ট কেবিন........!

শৈবাল প্রতিদিনের মতো সেজেগুজে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কৈ? এখনো তো এলো না! তবে কি --

ক্রিং..........ক্রিং..........ক্রিং..........বেজে উঠলো ফোনটা.........

-- আমি আলপনা বলছি। আমার উপর রাগ করো না শৈবাল, লক্ষ্মীটি -- রাগ করো না। হাসপাতাল থেকে বলছি--

-- হাসপাতাল? কি হলো? তোমার কি --

-- আরে না না। একটা হাসির ফোয়ারা ছুটলো ফোনে। মানে বুড়ো একটা এ্যাক্সিডেন্ট করেছে। অবস্থা ভালো নয়।

-- তবে তো গুড্ লাক! কখন আসছো?

-- ঠিক বিকেল পাঁচটায়। আজকে কিন্তু লাম্বডিং পার্ক.....।

হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে দর্শকদের ছ'টা পর্যন্ত থাকবার কথা। আলপনা কিন্তু পাঁচটারও কয়েক মিনিট আগে বেরোল। থম্‌কে দাঁড়ালো গেটে এসে। রক্তাক্ত অবস্থায় একটা অচৈতন্য লোককে স্ট্রেচারে করে নামানো হচ্ছে..........।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সেখানেই দাঁড়িয়েই পড়লো আলপনা। লাম্বডিং পার্কটা কেমন যেন শূন্য মনে হচ্ছিল তার............

একটু পরেই দিব্যেন্দুর কাছে ফিরে এল আলপনা। বললো -- তোমাকে ছেড়ে আজকে আর মন চাইলো না যেতে।

বুড়ো বিস্ফারিত নেত্রে তরুণী ভার্য্যাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছিল।

শৈবাল দত্তের মৃত্যুর খবরটা একটু আগেই আকার-ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল ওয়ার্ড বয়.........

আলপনা তার আশার জগতে আলপনা হয়েই রইলো। বাস্তবের জীবন সত্যকে আজকে যেন নতুন করে উপলব্ধি করলো!!

তন্দ্রাচোখে

শিশির পাইক

মনুর চোখে ঘুম আসে। দখিনের জানালাটা তখনও খোলা। জানালার ফাঁক থেকে বাতাস বইছে। ভাসছে অতি চেনা গানের সুর গুলো। যে সুরগুলো মনুর শিল্পী সত্তার অমোঘ প্রেরণা মাত্র নয়, যার বিনিময়ে সে একদিন মহুয়ার হৃদয় বীনার সুর ঝঙ্কার শুনেছিল। থমকে দাঁড়ানো চাঁদের চারিদিকে দুরন্ত মেঘেদের ছুটোছুটি তখনও চলছে। মনুর মনে পড়ে, চঞ্চলা হরিনীর মতো মহুয়ার কথা। মনুর দু'চোখের কোণ থেকে বেগবতী গঙ্গা যেন উপছে প'ড়ে বয়ে চলেছে সাগর সঙ্গমের দিকে।

তন্দ্রাঘন চোখে মনু দেখতে পায় মহুয়ার মুখটা। করুন দৃষ্টিই সম্বল। মহুয়া ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি আনে। বোঝাতে চায় মনের কথা।

'মনুদা, আর কটা দিন ধৈর্য্য ধরো। আমি কারোর কথা শুনবো না। বাবা মা নাই বা মেনে নিলেন। প্রেমের মাঝে প্রাচীর গড়ার সাধ্য কারোর নেই। অপেক্ষা ধৈর্য্য'ই তো পূর্ণ প্রেমের বাহক।' মহুয়ার কথায় মনুর চোখের কোণে প্রবাহিত গঙ্গা মূহুর্তেই যেন ভাটার পথে এগিয়ে চলল। আনন্দে ভরে উঠল মনুর বুক। পেল মহুয়ার নরম হাতের ছোঁয়া!

মনুর তন্দ্রা ভাব কেটে গেল। শুনতে পেল প্রতিদিনের ডাকটা। 'মনুভাই, উট্টে-পোড়ো, সোকাল হো-য়ে-চে।'

মনুর একমাত্র সঙ্গী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ফাঙ্ক। তার ডাকে মনুর সম্বিৎ হ'ল বরীন্দ্র ভারতী বিশ্বাবিদ্যালয়ের হোস্টেলে রুমের বিছানায় 'সে' শুয়ে।

গত দু'মাস হ'ল মহুয়াকে ফেলে মনু এখানে এসেছে। স্নাতক স্তরে চারুকলা বিভাগে প্রথম বর্ষের ছাত্র।

বাবা-মায়ের চাপে মনু-মহুয়ার প্রেম মধ্যাহ্নেই অস্তগতের পথে!

স্থাপত্য

সুমিত মোদক

রাত সাতটার খবর। চারিদিকে আগুন। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। ভাঙা হচ্ছে মন্দির-মসজিদ। ঘরে বাইরে উত্তেজনা। পথে 'পা' রাখা দায়। কখন যে কে বলি হবে কেউ জানে না।

সাহিল টি.ভি.-র খবরে বুঁদ হয়ে থাকে। আম্মি চা দিয়ে যান। চুমুক দেয়। স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে ওঠে। কয়েকটা দিনের মধ্যে পাল্টে গেল গোটা দেশের চেহারা - গতি প্রকৃতি। দু'দিন আগে ফাঁকা মাঠে পাওয়া গেছে তনুশ্রীর লজ্জা মাখা মৃত শরীর। ও'র বোনের সঙ্গে পড়তো এইটে। ঈদে ওদের বাড়ি এসেছিল। গতকাল সামশের মুন্ডকাটা লাশ। আর আজ অনুপের রক্তাক্ত নিস্তেজ মন্দির না বাবরি মস্‌জিদ। মন্দিরে-মস্‌জিদে তার কিছু যায় আসে না। বিরানব্বুয়ের পর সব-ই তো ঠিক ছিল। আবার কেন! কি হবে নতুন করে স্থাপত্য নির্মাণ। তাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষের কিছু যায় আসে! কেবল নেতাদের আখের গোছানো।

হঠাৎ রহিম। খবর দিল পাশের পাড়া থেকে এক দল আসছে। মন্দির ভাঙতে। সাহিলের বুকটা চড়াৎ করে ওঠে। উঠে দাঁড়ায়। লাঠিটা হাতে তুলে নেয়। বেরিয়ে পড়ে পথে। তাদের রুখতে হবে। রুখে দাঁড়ায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সাহিলকে এ' ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দেয় একটা সোড়্। শেষ বারের মতো কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে লা-ইলাহা- ইল্লালাহ্. . ..

তারা চম্‌কে ওঠে। রহিমের খবরে হিন্দু পাড়া থেকে বেরিয়ে পড়ে লোকজন। তারা পালায়। তখন কেবল মন্দির গাত্রে প্রতিধ্বনি হতে থাকে লা-ইলাহা-ইল্লালাহ্ ....।

জননী

কালীকুমার চক্রবর্তী

-- আরে শুভ! কি খবর তোদের?

-- তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণেন্দু। আমার সুখ-দুঃখ বিপদ-আপদের বন্ধু। অনেকদিন পরে দেখা।

-- উড়িব্বাস্, তুই! আমরা সব ভাল।

-- বাচ্চাটা কেমন আছে?

-- খুব ভাল। ও এখন রাখির চোখের মণি।

-- তাই নাকি! জানতাম, ওকে নিয়ে তোরা সুখে থাকবি।

-- তা ঠিক বলেছিস। চল্ চা খাওয়া যাক।

চা'র দোকানে বসে কৃষ্ণেন্দু বলে, আসলে পরিবেশ। পরিবেশই মানুষকে তৈবী করে। জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল।

-- মানে? আমার চোখে বিস্ময়।

-- হাসে কৃষ্ণেন্দু, কথাটা তোকে বলা হয়নি। বাচ্চাটার মা-বাবা দাঙ্গায় মারা গেছে। বাচ্চাটা অন্যজাতের।

ধ্বক্ করে ওঠে বুকটা। ভেতরে হাতুড়ির ঘা পড়ে।

-- কি বলছিস তুই! মুসলমান? আমার জন্মার্জিত সংস্কারের দেয়ালটা ভেঙে পড়ে হুড়মুড় করে।

-- হতে পারে আশ্রমের সুপার সেইরকম ইঙ্গিত দিয়েছিল।

-- এ কি করলি কৃষ্ণেন্দু, আমার এত বড় সর্বনাশ!

-- এটা আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণাও বলতে পারিস্। ওর নির্বিকার কণ্ঠস্বর।

-- এসব তোর জীবনে করলি না কেন?

করেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, জাত-পাতের নয়, মানবতাবাদী পাত্রী চাই। তছনছ হতে থাকে আমার অতীত-বর্তমান। আমার বাবারও মৃত্যু দাঙ্গায়। তা তো জানে কৃষ্ণেন্দু। তা জেনেও....

যন্ত্রণা পাক খায় বুকে। মগজে আগুন। শরীরটা অস্থির। কী কুক্ষণে কৃষ্ণেন্দু কে একটা বাচ্চা যোগাড় করতে বলেছিলাম। তখন অবশ্য আমার উপায়ও ছিল না। নিঃসন্তান রাখি পাগলের মত, মানুসিক ভারসাম্য হারাছিল। সন্তানের জন্য কবজ, তাবিজ, পীরবাবা, সাধুবাবার শরণাপন্ন হয়েও ব্যর্থ সে। ডাক্তার বলেছিল , আপনার স্ত্রীর বাচ্চা হবে না।

-- আমি ওকে বাচ্চা দেব, শুনে কৃষ্ণেন্দু বলে।

-- কি হচ্ছে? সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।

অথচ আশ্চর্য। দেড় মাসের মাথায় কৃষ্ণেন্দু আমাকে একটা হোমে নিয়ে যায়। একটা

সুন্দর বাচ্চা পেয়ে যাই সেখানে। তাকে দেখে রাখি উল্লসিত, ওমা কি সুন্দর ছেলে, দেখ দেখ হাসছে। ওকে নিয়ে রাখি মশগুল। হাসে, গায়ে নাচে। শোন ওকে অয়ন নামে ডাকবে, রাখি ঠোঁট সুচলো করে বলে। ও যেন পুরাণ কাহিনীর যশোদা হয়ে যায়। নন্দ ঘোষের নিঃসন্তান স্ত্রী যশোদা। আমি নন্দ?

কয়েক চুমুকে চা শেষ করি। ভাবি, অয়ন যদি যশোদার "বাছাধন" আমি নন্দ নই। কংস, পিতৃহত্যাকারীর প্রতিপক্ষ। উঠে দাঁড়াই। 'চলিরে', বলেই দ্রুত দোকানদারকে পয়সা দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকি।

ঘরে এসে অয়নকে দেখি। রাখিকে দেখি। রাখির কোলে অয়ন। ....ও তুমি এসে গেছ? অয়নের পাশে একটু বস। আমি চা করে আনি।

এখন আমার সামনে অয়ন ... বেজাতের ঘরের কিব্‌লিশ। বাবার খুনির জাত। তা-তা শব্দ তুলে অয়ন আমার দিকে এগিয়ে আসে। আমি হাত রাখি ওর গায়ে, মাথায়, গলায়। হঠাৎ আমার হাতটা কেড়ে নেয় কংসরাজ। অয়নের গলায় চাপ দিতে থাকে। আরো চাপ, আরও....

অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ ... গোঙানি ওঠে। ওই গোঙানির শব্দে হুঙ্কার মিলে মিশে যায় ... তোমারে বধিবে যে গোকুলে .... আমার ভেতরে একটা পুরাণ কাহিনীর মোরগ ডেকে ওঠে ... কংসরে মর্, কংসরে মর্। ভয় পেয়ে যাই আমি। — কী হলো কাঁদছে কেন? রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে রাখি।

দ্রুত ছুটে চলে আসে। আমার দিকে তাকায়। অয়নের দিকে তাকায়। আবার আমার দিকে, সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, কি করেছো, কি করেছো সোনামণিকে, কাঁদো কাঁদো গলা তার। উদ্ভ্রান্ত দেখায়। তাড়াতাড়ি অয়নকে কোলে তুলে নেয়। ওর চোখে-মুখে-গালে-সারা শরীরে চুমো খেতে থাকে।

আমি নিশ্চুপ। মাথা নিচু করে দুহাতের তালু পরখ করি। কংসরাজের জিঘাংসা বৃত্তির চিহ্ন খুঁজি। পাই না। ভেতরের ঝড় সামলাতে টিভিটা খুলে দি - সেখানে ছবি ফুটে উঠেছে ... ইজরাইলিরা প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে অভিযান চলেছে। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দি টিভি।

অয়ন গলায় হিক্ তুলছে। রাখি আবার জিজ্ঞেস করে কি হলো ... বলছো না কেন? অয়ন সোনা হিক্ তুলছে কেন?

কি উত্তর দেব আমি রাখিকে, অয়নের জননীকে? কংসরাজ যে পরাস্ত। জানালা দিয়ে দেখি আকাশের মেঘ কেটে কেটে যাচ্ছে।

অভাগী

অশোক রায়চৌধুরি

সব পাল্টে গেছে। মায় স্টেশনের নাম। আগের চিংড়িপোতা এখন সুভাষগ্রাম। তিরিশ বছর মানে, আড়াই যুগ। কলকাতা থেকে একুশ মাইল দূরে এটা আমার বাল্যভূমি। জীবনের অনেকগুলো বছর মিশে আছে ওই হাওয়া আর মাটিতে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে পা দিতেই হৈ হৈ ছুটে এল শৈশব। কাঁঠাল আর শিরীষের মাথা ছুঁয়ে উড়ে এল কৈশোর। ওই তো সেই বিলটা। এখন এটা ধোপদুরস্ত ঝিল। ওর নিষ্ঠুর জলের তলায় ডুবে আছে আমার অন্ধ অতীত। বাল্য ও কৈশোর। এই গ্রামে অঞ্জনা নদীর ধারে শ্মশানে ছাই হয়ে, মাটি হয়ে মিশে আছে আমার বাবা ও মায়ের নশ্বর দেহ।

ওই তো সেই ঝাড়েশ্বরের ভাঙা রংচটা মন্দিরটা। গা-ফুঁড়ে উঠেছে অশ্বত্থ বটের চারা। পরগাছা। লতাপাতা। ওইতো মন্দিরের সিঁড়ির ওপর সেই পাগলিটা ব'সে। যেমনটি ব'সে থাকত তিরিশ বছর আগে। ধুস্, তাই হয় নাকি! তখুনিতো ওর বয়স ছিল সত্তব ছুঁই ছুঁই। মানুষ কি এত দিন বাঁচে? এটা হয়তো অন্য আরেকটা পাগলি। মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াই। সব কিছু চেনা মনে হয়। বড় মায়া। বড় শাস্তি এইখানে। পাগলিটা আমাকে আড়চোখে দেখে নেয়। নাহ্ এটা সেই পাগলিটা নয়। এটা অনেক কম বয়েসী। তারই মেয়ে নাকি? সেই পাগলিটা শুনেছি অচেনা যুবক দেখলেই ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ত তার ওপর। মুখের কাছে মুখ নিয়ে দেখত ওইটাই তার পলাতক, প্রতারক প্রেমিকটি কিনা? তারপরই একপ্রস্থ শাপশাপান্তি, গালাগালি, সিন ক্রিয়েট....

আমাকে দেখে পাগলিটা ঝটিতে উঠে দাঁড়ায়। ওর মুখটা যেন খুব চেনা, আপন মনে হয়। কে ও? ও কি কৈশোরের কোনো ভুলে যাওয়া সাথী? স্কুলের সহপাঠিনী? এত চেনা মনে হচ্ছে কেন ওর মুখটা? মনের মধ্যে সমুদ্র মন্থনের মতন তোলপাড় তোলপাড়। কিন্তু কিচ্ছু মনে পড়ছে না। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে একনাগারে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে আমার স্মৃতিযন্ত্রের ওপর ছয় ইঞ্চি ধুলো পড়ে গেছে। একটু কিছু যেন ভেবে নেয় ও। তারপরই গুটিগুটি একেবারে আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার চোখ মুখ পরখ করে। হঠাৎ তার শীর্ণ ঠোঁটে এক চিলতে ম্লান হাসি টেনে বলে ওঠে -- 'অ্যাদ্দিনে এলে? এবার তোমার মেয়েকে নিয়ে যেও। আমি আর কতদিন?'

এই বলে, 'অভাগী, অভাগী' ডাকতে ডাকতে ঝড়ের মতো ছুটে চলে সে।

গাধা বৃত্তান্ত

আনন্দময় রায়

একটু আগেই ঘুম ভেঙেছে গাধার।

জানালার বাইরে চোঁয়ানো ঢেঁকুরে ঈষৎ মত্ত টকটকে ভোর। পাকপাখালি ডানা ঝাপটানোর সময় করে উঠতে পারেনি তখনও। লাল আভা জাগেনি আমলকির ডালে ডালে।

সদ্য ঘুম ভাঙা গাধার মন ভাল নেই। একদম ভালো নেই।

অন্যান্য দিন ঘুম ভেঙে গেলেই চোখ বুজে দৃষ্টি প্যান করিয়ে নেয় গাধাতন্ত্রের জনক পরমাত্মা গাধাস্বামী মহারাজের ছবির দিকে। মহারাজের কেমন প্রভুপাদ ভঙ্গী! মহারাজকে বার দুয়েক বাড়িতেও এনেছে গাধা। কিন্তু মন ভরেনি। বড়্ডো প্রভুপাদ ইয়ে মনে হয়েছে। মানে বড়্ডো গাধী ঘেঁষা। গাধার মডেল যুবতী গাধী কন্যাকে বার বার ডেকে পাশে বসাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে তার পিঠে, কাঁধে হাতে হাত বুলিয়ে বিপুল হোঁক্‌কা ডেকে বলছিলেন, "তবে এ কোমল অঙ্গ কুসুম পেলব।" লোমশ ভুঁড়িতে প্রায়ই জাগছিল সাত সাগরের ঢেউ।

উঠে বসার ইচ্ছে হলেও তখ্‌খুনি উঠে বসলো না গাধা। আধশোয়া হল জানালার দিকে। নীচ থেকে গাড়ি ধোয়ার ছর্‌ ছর্‌ শব্দ। কাজ করছে চাকর গাধা। ব্যাটা ড্রাইভার-গাধা এসে পৌছায়নি তখনও। তলে তলে নাকি খরগোশ পার্টি করে। খবর এসেছে গোপনসূত্রে। কাজ থেকে তাড়ালেই গেরো। দলে দলে খরগোশ এসে বাড়ি ঘেরাও করে উর্ধ্বতন চতুর্দশ গাধাপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেবে। এই এতবড় গর্দভনগরীতে এরা নাকি সংখ্যায় অনেক। এখানে ওখানে, অলিতে গলিতে ঘাপটি মেরে থাকে।

এসব কথাই হচ্ছিল গতকাল। জনৈক গাধাশ্রীর থ্রো করা পার্টিতে। খানাপিনা হল জব্‌বর। হলো মার হাব্‌বা আড্ডা, চালিয়াতি রাজা- উজীর মারা।

গাধার সেটাই হলো কাল।

কাল বলে কাল? একেবারে হ্যাটা করে দেওয়া কাল।

এই হ্যাটা শব্দটা গাধার সেক্রেটারী-গাধা ব্যবহার করে খুব। একবার তো ওটা নিয়ে দৈনিক গর্দভবাজার আক্ষরিক অর্তেই গরম করেছিল গর্দভনগরী। নির্বাচনের আগে সে এক হুলুস্থুলু ব্যাপার। তা সত্বেও দানা ছুঁড়ে, ছোটখোকা-বড়খোকা দিয়ে চমকিয়ে মাকাল ফল চিহ্নে জিতেছিল গাধা। খবর-জোগাড়ে গাধারা ছবি তুলেছিল ছিলিক্‌ ছিলিক্‌।

গতকালের পার্টিতে আসেনি কে!

ফেরেববাজ বিপ্লবী গাধা, দিন পালটে রামছাগল থেকে গাধা হওয়া গায়ক গাধা, যখন তখন রঙ পাল্‌টে সবাইকে ভড়কে দেওয়া সম্পাদক গাধা, বেধড়ক পাবলিক ঠ্যাঙানো খাকি-উর্দি গাধা, ভোজবাজী দেখানো তামাসাবাজ-গাধা, খলনায়ক গাধা, খেলোয়াড় গাধা, চিত্রকর-গাধা, নাটুকে গাধা, কবি-গাধা, কথাশিল্পী-গাধা, শিক্ষাব্রতী-গাধা এবং অবশ্য অবশ্যই শিল্পপতি গাধা।

আশ্চর্যের ব্যাপার কোন আমলা-গাধা ছিল না সেখানে।

গাধীশ্রী ভেবেছিলেন, ভেবে রেখেছিলেন, তাদের কাউকে দিয়ে চট্ করে ফিতে কাটিয়ে নেবেন সদ্যসমাপ্ত গাধাংস্কৃতি ভবনের। কিন্তু অ্যাততো বড় চ্যাটালো রাষভ কপালে ঘি না থাকলে ঠক্ঠকিয়ে লাভ কি।

এরপর আরেক গেরো। কোন এক কবি-গাধা নাকি ফাঁকতালে এক মদালসা-গাধীর আপত্তিকর স্থানে চিমটি কেটেছে আর সেও সুযোগ মতো দিয়েছে ম্যানিকিওর করা ঘুড়ই নখ ফুটিয়ে। গেরোর ওপর গেরো।

হঠাৎ করেই গাধাভাবে খবর এসেছে ঃ গর্দভনগরী কোন আমলা গাধাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু খুঁজে পাওয়া নয়, কোন চিহ্ন নেই কোথ্থাও। একজনেরও না।

খবর জোগাড়ে গাধারা ছুটে ছুটে ক্লান্ত। খাকি-উর্দি গাধারা সাইবেন বাজিয়ে বাজিয়ে ক্লান্ত। গর্দভনগরী রাজপথে শুধু খুরের শব্দ। মাঝে মাঝে শিশু গাধাদের কান্না, কষ্ট, যন্ত্রণা।

গোপন সূত্রে খবর এলো ফের।

সব আমলাগাধাকে কারা যেন জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছে শহবেব বাইরের কবরখানায়। গাধার মনে হলে ঃ ড্রাইভার - গাধার খরগোশ পার্টির কাজ নয়তো? ওরা সব পারে। মানুষের দেখাদেখি ওরাও শিখে ফেলেছে সব। নয়তো আচার আচরণে মানুষের এত কাছাকাছি?

সব গাধাদের চারচাকা ছুটলো কবরখানার দিকে। শহরের বাইরে। আবার তটস্থ সবাই। আবার তটস্থ গর্দভনগরী।

সবুজ বন্দুকধারী গাধারা ঘিরে রেখেছে কবরখানা। বাযভদর্শন- এর ক্যামেরা লাগনো গোটা চারেক গাড়ি নাক উঁচিয়ে আছে এদিকেই। কিন্তু কোথায় সেসব? কোথায় শুয়ে আছেন তাঁরা?

সব গাধারা ঘামতে লাগল .... ঘামতে লাগল ..... . এবং ঘামতে লাগল। তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে কবরখানা।

চারদিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বৃত্তটাকে ছোট করে আনে গাধার দল। হঠাৎই খেয়াল হয় ঃ তাদের চোখজোড়া বেয়ে সাপের মত লকলকে জিভ বাড়িয়ে নেমে আসছে নোনাজলের স্রোত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সবাই।

হঠাৎ আকাশে বাজের চিক্কুর। এক টুকরো মেঘ ফাটিয়ে নেমে আসে নিশানের মতো পত্পত্ উড়তে থাকা বিশাল একখন্ড লম্বাটে কাগজে। তাতে লেখা ঃ আমলাদের সমাধিক্ষেত্রে কেবল গাধারাই চোখের জল ফেলে।

নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত-সম্প্রতি বুদ্ধিজীবীদের একটি সুবিশাল সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে সরকারী পৃষ্ঠপোষণা ছাড়া সুস্থ শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়।

সম্মোহ
নন্দিতা ঘোষ

রেনুদেবী দোতলার রান্নাঘরে রান্না করছিলেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ছিল।

আজ ভাইফোঁটা। বড়ো মেয়ে জামাই কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। বড়ো মেয়ে তাঁর হাতের ফ্রয়েড রাইস খেতে খুব ভালোবাসে। সেইজন্যই তিনি যত্ন করে ফ্রয়েড রাইস রান্না করেছেন। রেনুদেবীর চার সন্তানের মধ্যে তিনটি সন্তান একত্রিত হয়েছে।

সেজ মেয়ে থাকে আমেরিকায়, সে আসতে পারেনি। মেজ মেয়ে এসেছে লন্ডন থেকে। ছেলে আর বড়ো মেয়ে কলকাতায় থাকে। মেজ মেয়ে বিদেশ থেকে এসে প্রথমে উঠেছিল শ্বশুর বাড়িতে। দিনকয়েক হলো বাপের বাড়িতে এসেছে। ছেলে পলিটেকনিকের কোর্স শেষ করে একটা কোম্পানিতে শিক্ষানবিশী করছে। চাকরি পাওয়া এখন এক দুরূহ ব্যাপার। অনেক জায়গাতেই নতুন লোক নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেব ভবিষ্যৎ রেনুদেবীর চিন্তার শেষ নেই।

স্বামীর কথা মনে পড়তেই রেনুদেবীর দুচোখ ছাপিয়ে আবার জল এলো। মানুষটি চলে গেলেন অকালে। তার আগে এই বাড়িটুকু ভাগ্যিস করে গিয়েছিলেন। চারটি ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে, এই বাড়ি করে সঞ্চয় বিশেষ কিছুই করে যেতে পারেননি।

রেনুদেবী ফ্রায়েড রাইসটা চাপিয়ে একবার নিজের ঘরে গিয়ে আলমারিটা খুললেন চাবি দিয়ে। ড্রয়ারটা টেনে ব্যাঙ্কের পাশবইটা খুললেন। খুব সামান্য টাকাই পড়ে আছে ব্যাঙ্কে। পিন্টু এখন মাত্র আটশ টাকা পাচ্ছে। সে টাকাও আজ আছে, কাল নেই। চাকরি কবে হবে তারও কোন ঠিক নেই। এই অবস্থায় ছেলে বিয়ে করার জন্য খেপে উঠেছে। মেয়েটি মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়া। মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য খুব চাপ দিচ্ছে।

আগের দিন রাতে এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মেজ মেয়ে আর ছেলের সঙ্গে রেণুদেবী তুমুল তর্কবিতর্ক হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে নিজের স্থান ভালো করার জন্য মেয়ে ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে মাকে অনেক কটু কথা বলেছে। বলেছে, তুমি ওল্ড এজ হোমে চলে যাও।

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলেছে -- হ্যাঁ, তাই যাও। মেজদি ঠিকই বলেছে।

দুপক্ষের উত্তর প্রত্যুত্তরে তর্কের জাল ছড়িয়েছে। পরিবেশ উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হয়েছে। একসময় উত্তেজিত পিন্টু খামচে ধবলো মায়ের স্তনের উপরিভাগ। তীক্ষ্ণ নখের ডগা বসে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। ছেলের ভ্রূক্ষেপ নেই।

চমক বিস্ময়ে আহত দৃষ্টিতে মা তাকালেন ছেলের চোখের দিকে। সেই চোখে কামনার আগুন জ্বলছে।

সারা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে, চোখের জলে বালিশ ভাসিয়ে রেনুদেবী সকালে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। বড়ো মেয়ে জামাই আসবে, তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে হবে। জামাই-এর বোন থাকে দিল্লিতে, তাই ভাইফোঁটায় সে শ্বশুরবাড়িতে আসছে আনন্দ করতে।

অলক মেঘ

রানা মুখোপাধ্যায়

"সজলবাবু, আমার কথাটা বোঝবার চেষ্টা করুন"— ভদ্রমহিলা অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন টেবিলের ওপর।

"শীলাদি আপনি আমাকে দেখছেন না — আমার সারাজীবনের সঞ্চয় ইনভেস্ট করেছি এর পিছনে"

"হতে পারে, কিন্তু অন্য পাবলিশার বইটা চাইছে"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার লেখাটা Edit করে আমিই প্রথম ছাপাই — বইটা যদি বিক্রি না হত অন্য বিগ্ হাউস এর রিস্ক নিত বলে মনে করেন?"

"এখন যখন নিতে চাইছে তখনও নিত — আর লিখেছি তো আমি"—

"হতে পারে, কিন্তু কে চিনতে আপনাকে? ওরা ছাপাত আপনার লেখা?"

"সে সব কথা আপনি ভাবুন, সজলবাবু, আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করেছি দীর্ঘদিন তরাইয়ের পাহাড়ি পথে পার্টির সংবাদ নিয়ে গেছি - পুলিশের বন্দুকের নলও রিস্ক নয়? কি বলেন?"

" সেই জন্যেই তো বলছি — একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন আপনারা মানুষের মুক্তির জন্য। তখন প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন?"

"আবে ভুলতো সেখানেই। সিস্টেমের ভিতরে থেকেই সিস্টেমের বিরুদ্ধতা করতে হয়.... একটা সিস্টেম না তৈবী কবে আর একটা সিস্টেম ভাঙা যায় না।"

"তার মানে আপনি আপনার তৎকালীন বিপ্লবী ভূমিকাকে ইগনোর করছেন।"

"সে অন্য আলোচনা। জানেন কতদিন জেল খেটেছি — কত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি সেখানে?

"সেই জন্যেই তো আপনার বই ছাপিয়েছি আমরা। রাজনীতি জেল এগুলো একেবারে অপরিচিত নয আমাব। তাব জন্য আপনার জেলবাসের দর্শন — বন্দিদের প্রতি মমত্ববোধ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা চেয়েছি এর কথা মানুষ জানুক। আমার পিএফের লোনের টাকায় আমাদের ছোট প্রকাশনী থেকে আপনার বই বেরিয়েছে।"

"ধন্যবাদ, আমি অস্বীকার করছি না — কিন্তু আপনার প্রকাশনী — কতটুকু তার আয়তন - কত লোকের কাছে সে পৌঁছতে পারে - কটা মানুষের কাছে সে হাজির করত পারে এই মর্মবেদনাকে?"

"মানে?"

"আমার বইটা পুবস্কার পেয়েছে। বিগ্ হাউস নিতে চাইছে। তারা বইটা ছাপালে কত লোক পড়বে বলুন তো। আপনি যেটা চাইছিলেন সেটা কত বিপুলভাবে ঘটবে বলুন তো।"

"আমি তো শেষ হয়ে যাবো। আমার একটা পরিবার আছে। তাদের কাছে আমি কি

কৈফিয়ত দেবো -- কি করে বলব আমার নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কাহিনী।''

''দেখুন সেটা আমি কি করে বলব? আমি একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ ব্যাপারটা চাইছি।''

''আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি -- আপনি এই মনোভাব নিয়ে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন তাদের জন্য শোষনহীন সমাজ গড়বেন? ভাবতে পারছিনা।''

''আপনি ভাবতে পারবেন না সজলবাবু খনি অঞ্চলে কয়লা শ্রমিকদের জন্য আমাদের কাজ। কিভাবে তাদের জীবন থেকে নৈরাশ্য দূর করবার চেষ্টা করতাম আমরা।''

''কিন্তু আমার পরিবার। তাদের কি হবে? তাদের প্রতিতো এত নিষ্ঠুব আচরণ করতে পারেন না। তারাতো আপনারই দেশের মানুষ।''

''সজলবাবু আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না-- পৃথিবীতে সমস্ত বড় বড় পরিবর্তন আসে মানুষের পিঠে পা রেখে।''

''চমৎকাব! আপনার বই পরিবর্তন আনবে আর তা আসবে আমার পরিবারের বুকে পা রেখে? কি মনে করেন আপনি? আমি ছাড়ব না বই -- দেখি আপনি কি করতে পারেন?

''সজলবাবু দয়া করুন, আপনার দুটো হাত ধরে বলছি''

''একি! একি করছেন আপনি!''

''অবশেষ পাবলিকেশনের কুন্ডুদা বলেছেন, এই বইটা ওনাদের দিলে তিনি আরও দুটো বই লেখাবেন। এখনতো লিখেই বাঁচতে হবে।''

সজল তাকিয়ে দেখল ভদ্রমহিলার মুখের দিকে। ফরসা মুখে বন্ধ্যা মেঘের কালো ছায়া। এ মেঘ বৃষ্টি হয় না।

''ঠিক আছে। তবে, আমার একটা শর্ত আছে শীলাদি''

''কি?''

''আপনার একটা লাইফ সাইজ ফোটোগ্রাফ দেবেন, বাড়িতে বাঁধিয়ে রাখব।''

অপরিচিত

দিলীপ চৌধুরি

মা বললো — কি রকম দেখলি ছোট পিসিকে?

ভাজা মৌরি মুখের ভেতর চালান করতে করতে অজয় জানালো — ভালোই, পরশু রিলিজ করে দেবে ডাক্তারবাবু।

এবার শুয়ে পড়, অনেক রাত হল — বলেই মা নিজের ঘর মুখো হলেন।

অমনি একরাশ ভাবনা এসে অজয়ের মাথায় চেপে বসলো, বেডে শুয়েই ছোটপিসি আজই ওকে চিনতে পারলো, প্রায় পাঁচ সপ্তাহ বাদে। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, কেবল দু'ঠোঁট নাড়া আর মুখের ভাষায় মনের অভিব্যক্তি প্রকটিত হয়েছিল, সম্ভবত বাসায় ফিরে গিয়ে ফিজিক্যাল থেরাপির পর কথা বলতে পারবে। পিসি বাড়ি গেলে হয়ত অসীমাও মামাতো দাদার ওর মা সরোজিনীকে কোলকাতা হসপিটালে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটাকে খুব হাল্কাভাবে নেবে।

অজয় কিন্তু ছোটপিসির হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার খবরটা টেলিফোনে হঠাৎ পাবার পরই দেখতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাড়িতে অধিকাংশরই অমত ছিল। ও এতসব ধর্তব্যেই আনেনি। অফিসের কাছাকাছিই হাসপাতাল, সুতরাং অফিস ফেরতা খুব অসুবিধে হত না ছোটপিসিকে দেখতে যেতে। দু' পিসতুতো বোন অসীমা-- নন্দিতার বর, ছেলে মেয়েরা সবাই ওর দিকে আকস্মিক দেখার গভীরতায় প্রথম প্রথম তাকিয়ে থাকতো।

এরমধ্যেই একদিন অসীমার বর মনোজ বলেছিল - দাদা, আপনি যে আমার শ্বাশুড়িকে এত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে দেখতে আসবেন, ভাবতেই পারিনি।

স্বভাবতই সত্যি ব্যক্ত করেছিল ভগ্নিপতি। যারা গত তিন বছর ধরে কোনো খোঁজই রাখেনা বিধবা, বয়স্কা বড় মামীর, অথচ ওর বড় ছেলে ফোনে ছোটপিসির অসুস্থতা জানতে পেরেই নিজের দায়িত্ব পালন করলো।

একবছর আগে অজয়ের অ্যাপেন্ডেসাইটিস অপারেশনের খবর পেয়েও বাড়ির কেউ হাসপাতালে দেখতে আসেনি। তাই স্ত্রী সুপর্ণাও ছোটপিসির প্রতি অজয়ের অত গদ্গদ ভাবকে মেনে নিতে পারছে না। রাতে সুপর্ণা ঐ প্রসঙ্গ তুললে ও কথা ঘুরিয়ে দেয়। মাও অজয়ের বাড়াবাড়িকে ভালো নজরে দেখছে না। সব বাধা সরিয়ে অজয় ওর কর্তব্য পালন করেছে মানুষ হিসেবে, আবেগ ওর বিবেককে কেড়ে নিতে পারেনি।

আজও হাসপাতালের গেটের বাসস্ট্যান্ডে ছোট পিসতুতো বোন নন্দিতা মুখ খুলেছিল -- অজয়দা তুমি এ বিপদে নিজের দাদার মত ঝাঁপিয়ে না পড়লে মায়ের কি যে হতো?

অজয় ভাবে বাস্তবে ও ঘটনা (দুর্ঘটনাও বলা যেতে পারে) নতুনভাবে ছোটপিসির বাড়িতে তাকে উদ্ভাসিত করেছে।

ঠিক তক্ষনই সুপর্ণার ডাক — রাত দু'টো বাজলো, ঘুমোতে এসো, সকালে যে আবার অফিসে বেরুতে হবে।

সঞ্চয়িতা

মুকুল নিয়োগী

কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ থেকে অনেকগুলো পুরানো বই, তার মধ্যে কিছু দুস্প্রাপ্য, এক এক করে টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলেন পরিতোষবাবু। কফি হাউসের একটা টেবিলকে ঘিরে তখন ছ'জন উৎসাহী, আগ্রহী পাঠক এক এক করে বই গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করলো। পিয়ালের হাতে উঠে এলো একখানা বই, বাঁধানো মলাটের পাতা উল্টে দেখেই পিয়ালচমকে উঠলো, 'সঞ্চয়িতা'। এবং প্রথম পাতার পরেই তারই হাতের লেখা, যা প্রায় বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু পড়া যায়, 'সঞ্চারী, তোমার জন্মদিনে – পিয়াল'। তারই নীচে ক্ষুদে অক্ষরে তারিখ লেখা এবং হিসেব করে দেখা গেল, তারিখটা উনত্রিশ বছর আগেকার এক উনিশে আগষ্টের। পিয়াল পরিতোষবাবুর কাছে বইটার দাম জিজ্ঞেস করলো এবং কোনরকম দরাদরি না করে বইয়ের দাম দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো। বন্ধুদের কাছে এটা একটা আকস্মিক চমক। পিয়াল একটু স্মিতহাস্যে বিদায় জানিয়ে বললো, 'শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ বাড়ি চলি।'

উনত্রিশ বছর আগে বেলেঘাটার যে বাড়িটাতে ওরা ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করতো, তারই পাশের দুটো ঘর নিয়ে থাকেতো সঞ্চারীরা। পিয়াল তখন বঙ্গবাসী কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। সঞ্চারী দেশবন্ধু স্কুলের ক্লাস নাইনের। সঞ্চারীকে ইংরেজি পড়াবর দায়িত্ব নিয়ে বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল পিয়াল সেই সময়ে। কিন্তু ক্লাস নাইনের বার্ষিক পরীক্ষায় সঞ্চারী পাশ করতে পারলো না। এই লজ্জাটা সঞ্চারীর নয়, যেন পিয়ালেরই এবং সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার একটা সুযোগ কিংবা যোগাযোগই ঘটে গেল। সঞ্চারীরা দু'মাসের মধ্যেই বেলেঘাটার বাড়ি ছেড়ে ধানবাদে একটা চাকরির সুযোগ পেয়ে চলে যায়। বছর পাঁচেক হলো কলকাতায় কলেজ ছেড়ে ধানবাদে একটা চাকরির সুযোগ পেয়ে চলে যায়। বছর পাঁচেক হলো কলকাতায় ফিরে এসেছে পিয়াল। পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরে কফি হাউসের আড্ডায় প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করে। স্মৃতির পাতায় অনেক পুরানো ঘটনা চাপা পড়ে গেছে। চাপা পড়ে গিয়েছিল সঞ্চারীর স্মৃতিও।

সেই স্মৃতির দরজা এমন করে কেউ কোনদিন খুলে দেবে ও ভাবতে পারেনি। জন্মদিনের উপহার, তাও আবর সেই প্রথম যৌবনের স্মৃতির প্রতীক, তাকে কেউ ফুটপাথের বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিতে পারে, পিয়াল ভাবতে পারে নি। ঘরে ফিরে পুরানো ডায়েরির পাতা খুঁজে সঞ্চারীদের মানিকতলার একটা ঠিকানা খুঁজে বার করলো, ঠিকানাটা সঞ্চারীই দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ঠিকানায় পিয়াল কোনদিনই যায়নি।

পরদিন সকালে মানিকতলার খালধারের একটা পুরানো বাড়িতে অনেক চেষ্টায় যখন পিয়াল গিয়ে পৌঁছলো, তখন ব্যস্ত সে বাড়ির সমস্ত লোকই। তারই ফাঁকে যেটুকু খবর সংগ্রহ করা গেল, তাতে জানা গেল,ওই বাড়ি থেকে সঞ্চারীর বিয়ে হয়েছিল এবং বিয়ের পর বেহালার

শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়। কিন্তু সঞ্চারীদের পরিবারের কেউই তখন ওই বাড়িতে থাকে না। অন্য ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে বেহালার ঠিকানা সংগ্রহ করে যখন পিয়াল সেখানে পৌঁছলো, তখন সেই বাড়ির সামনের জলের কলে বিরাট লাইন পড়ে গেছে। লাইনেই দাঁড়ানো ছিল সঞ্চারী। কিন্তু পিয়াল তাকে শনাক্ত করতে পারেনি। পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করতে সঞ্চারীকে চিনিয়ে দিলেন তিনি।

বিস্ময়ের একটা চিহ্ন ফুটে উঠলো সঞ্চারীর চোখ মুখে। পরিচয়পর্ব শেষ হতে না হতেই সঞ্চারী পিয়ালকে নিয়ে গেল ওর ঘরে। শুধু একখানা ঘরই। সে ঘরের সামান্য আসবাবপত্রের মাঝখানে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বের চিহ্ন নেই।

পিয়াল সেই মুহূর্তে সঞ্চারীকে আর কোনো প্রশ্নই করতে পারলো না। কেবলমাত্র বললো, 'উনত্রিশ বছর আগে তোমার জন্মদিনে যে উপহার দিয়েছিলাম সেটিকে বিক্রি করে দেওয়া কি খুবই জরুরী ছিল?'

সঞ্চারী উত্তর দিল,'হ্যাঁ ছিল। শুনে যাও, তুমি আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রাখলেও আমারও একদিন বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ট্যাকসি ড্রাইভার। কোনরকমে দু-জনের সংসার চলছিল, দুজন থেকে তিনজন হলো। 'কোলে এল আমার সন্তান, আমার ছেলে। ওর যখন তিন বছর বয়স, তখন একদিন অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় ওর বাবা। অনেক কষ্টে দরজির দোকানের কাপড় সেলাই করে সংসার চালাতে শুরু করলাম। ছেলের পড়াশোনাও চললো সেই সঙ্গে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফী জোগাড় করবার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ালাম তখন চারিদিকে। সামান্য তেরো টাকার জন্য ওর পরীক্ষায় বসা সম্ভব হবে না। ওই টাকাটাই কম পড়েছিল। হাতের কাছে বিক্রি করার মতো আর কিছুই ছিল না। তোমার দেওয়া সঞ্চয়িতাটাই বিক্রি করে দিলাম। ও পরীক্ষা দিল। কিন্তু আমারই মতো আমার ছেলেও পাশ করতে পারলো না। আমি ফেল করাতে তুমি একদিন লজ্জায় পড়েছিলে। তুমি রেহাই পেয়েছিলে আমরা ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসাতে। আর আমার ছেলে তার লজ্জা ঢাকতে নিজেই একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আজ সাত বছর হয়ে গেল, তার খোঁজ আর আমি পাইনি।'

পিয়াল ওর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে 'সঞ্চয়িতা'খানা সঞ্চারীর হাতে তুলে দিল। তারপর অস্ফুটস্বরে বললো, 'যাই'।

সঞ্চারীর চোখ তখন পিয়ালের চোখে। বোধহয় কিছু খুঁজছিলো।

আমাদের ছোট নদী

উৎপলেন্দু মন্ডল

আমাদের ছোট নদী, প্রকৃত অর্থে ছোট নদী ছিল না। শুধু দেখতাম ভাটার সময় লঞ্চ আটকে যেত। নদী পেরলেই স্কুল। শ্রীগৌরাঙ্গ হাই স্কুল, আমি ঐ স্কুলেই পড়তাম। অফ পিরিয়ডে আমরা নদীর বাঁধে গিয়ে দাঁড়াতাম, আমরা যারা প্রেমে পড়ছিলাম লোকেশান হিসাবে আমাদের ছোট নদীকে বেছে নিয়েছিলাম। পরে পন্ডিত স্যার বোঝাতেন নদী আমাদের জীবনের মতো।

জীবন যে কী সেটাই বুঝতাম না! বুঝতাম যে বছর নোনা জলে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে ধানক্ষেত সাদা হয়ে যেত -- আমাদের দলিজঘরে গায়ের লোকেরা ভিড় করত। তখন বুঝতাম নদী আর জীবনের সামীপ্য। আরও বুঝলাম যেবার বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধ হয়। আমাদের সুবলস্যারের ভাই পঙ্কজ সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে গুলিগোলার ভয়ে স্কুলে চলে এসেছিল। ওদের পদবী মল্লিক। রেডিওতে তখন প্রতি সপ্তায় পঙ্কজ মল্লিক গান শোনতেন। আমরা ওকে পঙ্কজ মল্লিক ব'লে খেপাতাম। আমাদের স্কুল বন্ধ। স্কুলের প্রত্যেক ঘরে শরণার্থী।

আমরা টিফিন পিরিয়ডে নদীর পাড়ে বসে আড্ডা মারতাম। দূরে পেতমের খেয়া, পঙ্কজ খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারত। বাঁশির সুরে আমরা যেন কেমন হয়ে যেতাম। তখনই আমরা পঙ্কজকে গুরু মেনে নিয়েছিলাম। এইভাবে চলত! কুমোর পাড়ার দিকে তাকালে দেখতে পেতাম--মমতা, নীলিমা এরা আসছে। মুখে কিশোরীর হাসি। টিফিন পিরিয়ডে ওবা বাড়ি চলে যায়। মমতা ভাল গান করে। পঁচিশে বৈশাখে দেখতাম--কী সুন্দর বেণী দুলিয়ে গান গাইত -- 'কার পদ পরশন আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা....'

বুঝতাম না কার জন্য এই-ই সব....। গলার কাছে আটকে যেত অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ। পড়াশুনোর চাপ বাড়ছিল। সামনে পরীক্ষা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল, এখানে জরুরী অবস্থা। নজরুল প্রয়াত। পঙ্কজদের সীমান্তবর্তী গ্রাম আবার শান্ত। পঙ্কজ ফিরে যাব যাব করছে-- তবু বোধহয় উচ্চ মাধ্যমিকটা দিয়ে যাবে।

ফাইনালের আগে আমাদের কোচিং ক্লাস হ'ত দোতালায়। দূরের নদী। আমাদের গ্রাম। হাটখোলাতে সিংহবাহিনীর মন্দির সব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তাম। বেরিয়ে পড়তে হবে। বৃহৎ পৃথিবী যেন আমাদের ডাকছে। এই গ্রাম, নদী, ছেড়ে যেতে হবে। নদী প্রত্যেক বছরই ভাসচ্ছে। রাজনৈতিক সচেতনতা এত বাড়ছে, কাজের মুনীষও পাওয়া যায় না। বেশী পয়সায় অন্যত্র পাড়ি দিচ্ছে সবাই। চাকরি একটা পেতেই হবে। এ পোড়া দেশে আর নয়।

কোচিং ক্লাসের পর আমরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরি। পঙ্কজ বলে পরীক্ষা হয়ে গেলে চল আমাদের গ্রামে যাই। দেখবি কাঁটাতারের ওপাশে বাংলাদেশ। মমতা ওর কিশোরীর চোখে

অবাক বিস্ময়ে পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে বলত, সত্যি?

না, পঙ্কজের গ্রামে আমাদের যাওয়া হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিকের পর সেই অলস সময়কালটা আমার অসুখে কেটেছে। তারপর কলকাতা পাড়ি দিলাম। মেসবাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে শুধু কলকাতা যাবার পাসপোর্ট খোঁজা। কারুর সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। পঙ্কজ ফিরে গেছে ওর সীমান্তবর্তী গ্রামে। মমতা, নীলিমা এরাও স্থানীয় কলেজে ভর্তি হয়েছে। হয়তো বিয়ের পিঁড়ির জন্য অপেক্ষা, হয়তো পঙ্কজকেই। স্যারের ভাই বলে--অতিরিক্ত কিছু সাফল্য। স্যার তো ওদের পাড়ায় থাকে। শুনেছি বসিরহাটের দিকে কোন কলেজে পঙ্কজ ভর্তি হয়েছে। ওদের বাড়ীতে সবাই কাজ করে। আমাদের মতো জমির উপর নির্ভরশীল নয়।

চাকরি আমাকে পেতেই হবে। পেলামও। বি.এড. রেজাল্ট বেরুনোর একমাসের মধ্যে আমি প্রিয়গোপাল পাঠশালায় জীবন বিজ্ঞান স্যার। জায়গা খারাপ নয় -- সামনে কানা দামোদর। এখানকার জমিগুলোও বেশ ভাল। গঙ্গার জল সরাসরি জমিতে। শীতকাল যেন ওদের কাছে বর্ষাকাল। গোটা মাঠ সবুজ। দেখলে মনে হয় সবুজের বিশ্বায়ন। ভাবছি চাকরি এখানেই যখন, এখানেই তো থাকতে হবে। অন্য জায়গায় চাকরি পাওয়ার ক্ষমতাও নেই। তাহলে কিছু জমিজমা কিনে বসতবাড়ি তৈরী করে এখানেই শিকড় চাড়িয়ে দিই। এখানে নদীর বাঁধ ভাঙার প্রশ্ন নেই। এখানে জল মিঠে, মাটিও। আর মানুষগুলো কী সুন্দর ডায়লেক্টে কথা বলে। বেশ সুরেলা।

স্কুলে থেকে ছুটি নিয়ে আবার দেশের বাড়িতে। আপাতত গন্তব্য--বাসন্তী রেজিস্ট্রী অফিস। কয়েকমাস আগে জমি বেচে দিয়েছি, এখন পার্টিকে রেজিস্ট্রী করে দিতে হবে। রেজিস্টার সাহেবকে দেখে অবাক। শ্যামদা। আমরা একসময় একই মেসে থাকতাম। আমার থেকে সিনিয়ার। সই স্বাক্ষর শেষ। শ্যামদা বলল, চল কোয়ার্টার থেকে ঘুরে আসি।

গাঙ্‌ভেড়ী দিয়ে আসছি। শ্যামদা আমার আগে আগে। বাতাসে বহুদিন পর বুনো গন্ধ। শ্যামদা আমার দুঃসময়ের বন্ধু। কলকাতায় টিউশ্যানি জুটিয়ে দিয়েছিল শ্যামদাই।

হোগল নদীর বাঁধের পাশেই পেল্লায় কোয়ার্টার। গেটের মুখেই বেলফুলের গন্ধ। মেলাতে চেষ্টা করছিলাম -- মেসের সেই ঘুপচিঘর, আমাদের আলোছায়ার গ্লানিময় মুহূর্তগুলি।

দালাল উঠতেই, শ্যামদার গমগমে গলা, দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি--আমাদের মেসের বন্ধু।

আমি অবাক হয়ে দেখি -- মমতা!

কানের কাছে বেজে যাচ্ছিল -- কার পদ পরশন-আশা, তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা.....।

একটা ঘটনার জন্য

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

-- এ্যাতো রাতে আবার কে এলো, মা?

ডোরবেলটা থেমে গেছে একবার বেজেই, যদিও কারো ওঠার কোন তাগিদ নেই। শীতের জাড়ে ঝিমোচ্ছে গোটা শহর। বহুদূরে রামলীলা হচ্ছিল কোথাও। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেমে গেছে তাও। ডোরবেলও আর বাজে না তক্ষুণি।

দুজনেই অনেকক্ষণ নিবিষ্ট উলবোনায়। কাজটা মূলত তৃণা-র। ও-ই সমস্ত অর্ডার আনে দোকান ঘুরে। রাতে হাসপাতাল থেকে ফিরে হৈমন্তী সাহায্য করেন একটু। তাছাড়া সামনে ওয়ার্ক এডুকেশন পরীক্ষা। প্রায় প্রতি মেয়ে স্কুলে অন্তত একটা ক্লাসের সিলেবাসে উলবোনা আছেই।

আজ হৈমন্তীর খাটুনি গেছে বড়ো। সদর হাসপাতালে নতুন মেট্রনটা নার্সদের দৌড় করায় খুব। হৈমন্তীর ষাট ছুঁই-ছুঁই শরীরে ধকলটা একটু বেশি-ই। উল বুনতে-বুনতে হৈমন্তী মেয়েকে দেখেন। ওর ত্রিশোর্ধ শরীর দিন-দিন দরকচা মেরে যাচ্ছে। চোখ-মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। হৈমন্তীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই একমাত্র সন্তানকে নিয়ে কী অসম্ভব স্বপ্ন ছিল ওঁর। তখন সুধাময় বাড়িতে ছিল। সে এক দিন গেছে। আজ সব অলীক।

আবার বাজল ডোরবেল। এবার অনেকক্ষণ একটানা। দুজনেই সচকিত, নিশ্চুপ। পরপর তিনবার বাজল একই ভাবে। তৃণা অবশেষে — 'মা, দ্যাখো না কে এল.....'

-- এ্যাতো রাতে কে আসবে বলতো?

-- অনেকেই আসতে পারে।

-- অনেকে বলতে ?

-- আত্মীয়-স্বজন কেউ।

-- মরে গেলেও খবর নেয় না যারা, তারা খেজুরে করতে আসবে এই দুপুর-রাতে?

-- এভাবে কেন বলছো মা? বিপদে পড়েও তো আসতে পারে কেউ.....

তৃণা উঠে পড়ে। সিঁড়ির দিকে এগোয়। হৈমন্তী চিৎকার করে ওঠেন, 'গত সপ্তাহের ব্যাপারটা মনে নেই? ডাকাতি করতে এসে সামন্তদের মেয়েটাকেও ওরা...'

কথাটা শুনে তৃণা-র দৃষ্টি বদলে যায়। মুখ-চোখ হঠাৎ আশ্চর্য কঠিন। কী যেন ভাবছে সে।

-- এ্যাতো তাড়াতাড়ি সব ভুলে যাস কি করে?

তৃণা জবাব দেয় না। ক্রমশ ওর ঠোঁটের কোণে হাসিটা প্রসারিত হয়। ওর চুপ থাকাটা অস্বস্তি জাগায় হৈমন্তীর ভেতর। -'আজও মেয়েটাকে খুঁজে পায়নি, জানিস?'

--'মেয়েটার তবু একটা গতি হয়েছে।' -তৃণা-র কথাটা যেন কেটে বসে হৈমন্তীর বুকে। এমন সময় আরেকবার ডোরবেলের ঝঙ্কার। হা-হা করতে থাকা প্রায়-শূন্য ঘরগুলোতে ঝড়

তোলে সে-শব্দ। এ-বাড়ির নিকটতম প্রতিবেশীটিও থাকেন অন্তত [illegible]
কাউকে ডেকে সাহস পাবার সুযোগই নেই হৈমন্তীর। জানালার কাছে [illegible]
কে? সাড়া না দিলে দরজা খুলব না'

উত্তর না আসায় একই কথা আরো দু-তিনবার। তৃণা [illegible]
স্থির। হৈমন্তী ছটফট করেন- 'আমায় ব্যঙ্গ করছিস মনে হচ্ছে।'

-- ব্যঙ্গ করলাম কোথায়?

-- তোর হাসিটা ব্যঙ্গের। আমার যন্ত্রণা বুঝলে হাসতিস [illegible]

-- তুমি খুব ভীতু।

-- তোর কথা ভেবে ভীতু। তোর বয়সী মেয়েকে [illegible]
হয়ে উপায় আছে?

-- আমার জন্য ভেবে তোমায় ঘুম নষ্ট করতে হবে না

আবার তীব্র শব্দের ঝড়। বেল টেপার ধরনে কেমন [illegible]
গতিতে সিঁড়ির দিকে ছুটল তৃণা। হৈমন্তীও ছোটেন। কাঁধ খামচে [illegible]
কিন্তু তৃণা বেপরোয়া। ওর ওপর কিছু ভর করেছে যেন। 'বিশ্বাস [illegible]
লাগছে। শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছো তুমি। দুনিয়াটা এমন জঙ্গলের [illegible]

-- না তৃণা, শব্দটা শুনছিস? মনে হচ্ছে দরজার ওধারে [illegible]
দাপাচ্ছে।

-- প্লীজ্ মা...

নিশুতি রাতে প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির মাঝখানে এরপর কিছুক্ষণ [illegible]
তৃণা-র তেজ ক্রমশ হৈমন্তীকে নিঃশেষ করে দেয়। অবসাদে [illegible]
তৃণা ততক্ষণে আগল খুলে ফেলেছে। ওর খেয়ালই ছিল না, [illegible]
কেটে গেছে অনেকগুলো মুহূর্ত। শেষ পর্যন্ত ছিটকিনি খুলে [illegible]
আলোয় মাঠ ভাসছে। অপরিসীম শূন্যতার ছবিটা ওর সহ্য হল [illegible]
ফেরালো মায়ের দিকে। হৈমন্তী টের পান, তৃণা কিছু বলছে অস্ফুটে

-- আপন মনে কী বলছিস যা-তা?

-- ভাবছিলাম, কিছু একটা ঘটবে। অন্তত একটা [illegible]

-- ঘটলে বর্তে যেতিস, বল?

তৃণা করুণ হাসে - 'মা, শব্দটা আমরা দুজনেই শুনেছি, [illegible]

ফাটল

সুতপা চক্রবর্তী

ঘড়ি দেখলাম। আড়াইটে বেজে গেছে। বসেছি প্রায় দুঘন্টা হয়ে গেল। কিন্তু এতক্ষনেও একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প খাড়া করতে পারলাম না।

অথচ লিখে ফেলতেই হবে। কারণ সময় তো আর মোটে দুদিন। অন্ততঃ দু'সপ্তাহ আগে সম্পাদক মহাশয় বলছেন। আর এই রবিবারেও যদি লেখাটা না দেওযা যায় তবেই হয়েছে।

আর পকেটের অবস্থাও তো বেশ খারাপ। বাড়ী বাড়ী ঘুরে সারামাস পড়িয়ে যে কটা টাকা পাই তা কম্পিউটার শিখতেই চলে যায়। তার ওপর আছে পিউ-এর নানারকম বায়না।

পিউ আমার স্টেডি গার্লফ্রেন্ড। কলেজ থেকে পিছু ধরেছে। কলেজ ছেড়েছি দুবছর কিন্তু পিউ ছাড়েনি আমায়।

কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা লেখা বেরোনোব পর আমার মনে কেমন যেন দুঃসাহস দেখা দেয়। সেই দুঃসাহসে ভর করেই এখানে ওখানে দু-একটা লেখা পাঠাই। কোনটা ছাপা হয় কোনটা হয় না। ছাপা হলে পাঁচ সাতশো টাকা আসে পকেটে কখনো সখনো।

তাই কদিন ধরে পড়েছি সমিতকে নিয়ে। সমিত একটা কলেজে পড়া ছেলে। তাকে আমার মিষ্টি প্রেমের গল্পের নায়ক বানাতে হবে। এবং শুধু তাই নয় প্রেমে মিলনও অবশ্যম্ভাবী। সঙ্গে একটু দেহের আকৃতি মেলাতে পারলে তো আরো ভাল।

পূজোর সময় হলে তা কোন কথাই নেই, দুঘন্টায় এরকম গল্প লিখে ফেলা যেত। কিংবা অন্য অনেক সময়ই এ গল্প লেখা তো জলভাত ছিল। কিন্তু সমিত ছেলেটা এত বেয়ারা যে ও কিছুতেই মিলনের প্রেমে হাজির হবে না। ঠিক যেন ঐ বেয়ারা বটগাছটার মত। বটগাছটা কবে যে কখন জন্ম নিয়েছিল আমাদের বাড়ীর পাশের ঐ ছোট্ট প্যাসেজটায় তা আমার কেউ কখনো খেয়ালই করিনি।

কিন্তু বটগাছটা জন্ম নিয়েছে। একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে আমাদের অজান্তে। ফাটল ধরিয়েছে আমাদের পাঁচিলে। কতবার ওটার ডাল ভেঙে পড়েছে । গোড়ায় পায়খানা পরিস্কার করার অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছি। তবু ওটা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই মাথা নত করবে না আমার জেদের কাছে।

যেমন এখন সমিত জেদ ধরেছে কদিন ধরে। এর মধ্যে সমিতের নাম বদলেছি বিজন, টিটান ইত্যাদি বেশ কয়েকবার দেহের আকৃতিও বদলেছি পেন দিয়ে।

তবু যেন কিছুতেই ও হার মানছে না। কতবার কত রকমে পেন চালিয়েছি পাতা নষ্ট করেছি। তবু সমিত যেন অনড়। ও প্রেম করবে না কিছুতেই।

যত নরম মন নিয়েই লেখা শুরু করি না কেন তবু গল্পের শেষে গিয়ে দেখি সমিত দাঁড়িয়ে আছে একা। এর চারপাশে কেউ নেই, কিছু নেই।

নাঃ লেখাটা দেখছি আজও হবে না। উঠে পড়লাম।

দুদিন বাদে আবার লিখলাম। হোল না। তার পরদিন আবার। অবশেষে ঐ ব্যর্থ প্রেমিক সমিতকে নিয়েই হাঁটা লাগালাম কাগজের অফিসে।

ভদ্রলোক আসুন আসুন করে ডাকলেন। বসালেন। ঠান্ডা সরবত খাওয়ালেন। তারপর লেখাটা নিয়ে টেবিলের একপাশে ফেলে রাখলেন।

তারপর আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম ঐ কাগজের ঠান্ডা ঘর থেকে। কোনদিন ঐ কাগজের পাতায় আমার ঐ ভীষণ একা সমিতকে দেখিনি।

শুধু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীর পিছনের প্যাসেজ বটগাছটা দেখি। বটগাছটার শিকড় আমাদের পাঁচিলের অনেক গভীরে ঢুকে গেছে হয়ত বা কোনোদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। আমাদের বাড়ীর বটগাছটাকে আমার বড় কাছের মনে হয়।

উচাটন

জ্যোৎস্না কর্মকার

এই নিয়ে তিন-চার বার ঘর পালানো। এবার একথালা তেলাপিয়া মাছ ভাজতে বসে উধাও—আক্রান্ত নীলিমা আচার্য। কয়েক বছর শীত পড়লেই ওর এই পালাই বাতিক। বড় পালানো এই নিয়ে দু'বার। এমনই হঠাৎ করে সব কিছু থেকে নিজেকে লোপ করে হাওয়া। নেই তো কোথাও নেই। এবারের অনেক কষ্টে নীলিমাকে খুঁজে পাওয়া। বাড়িতে বোনটা না থাকলে দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে কি বেহাল অবস্থা ভুবন আমাকে বোঝাচ্ছিল।

ভবঘুরে মহিলা আবাসের নির্বাহিকা হয়ে নতুন এসেছি। রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সই সাবুদ করাতে করাতে সোশ্যাল ওয়ার্কারও নীলিমা আচার্য সম্পর্কে আমায় ওয়াকিবহাল করেছিলেন।

নীলিমার মানসিক ভারসাম্য সামঞ্জসপূর্ণ ছিল না। বছর তিন মানসিক চিকিৎসা। সেবক নামক প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য পরিসেবায় নীলিমা নাকি এখন বাড়ি ফেরার উপযুক্ত। শনাক্তকরণ তো আগেই হয়েছে। কাজগপত্রও তৈরী। পুলিশ দিয়ে গিয়েছিল। স্বামী নিয়ে যাবে। ছাড়ার আবেদনপত্রাদি ফরোয়ার্ড করে পাঠাচ্ছি নিয়ামকের কাছে। সই হয়ে এলেই ভুবন নিয়ে যাবে স্ত্রীকে।

আমার উল্টোদিকে ভুবন ও তার বোন দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। দরজায় এসে দাঁড়ালো নীলিমা। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। তেল চকচকে চুলে বড় খোঁপা। লাল টিপ। চওড়া করে সিঁদুর। সোডায় সেদ্ধ কাচা আকাশ রঙা তাঁতের হোম শাড়ী। আঁচলের একটা খুঁট দুহাতে ধরা। স্বামীর দিকে সপ্রেম নজর। তাকালো আমার দিকেও। তেল ভরা প্রদীপে যেমন ভরা প্রদীপ ভরা আলো তেমনই চোখ ভরা হাসি নীলিমা আচার্যের চোখেও। কোথাও কোন মালিন্য নেই। নেই যুগ-ত্রাস।

-- এদের চেনো?

-- হ্যাঁ। ঘাড় নেড়ে নীলিমার সায়।

-- বাড়ীতে কে কে আছে?

-- দুই ছেলে আর এক মেয়ে। উত্তর দিল ভুবনের বোন!

-- বাড়ী যাবে?

-- হ্যাঁ। মাথা নেড়েই আগ্রহ প্রকাশ।

-- এ যে দেখি কথাই বলে না। তো হ্যা মশাই বউকে আগলাতে পারেন না। যখন তখন বাড়ী ছেড়ে চলে যায় যখন।

ভুবনের প্রত্যুত্তর। স্বচ্ছ নীরব হাসিতেই। জানি না হাসির আড়ালে কি আছে। নীলিমার বছর চল্লিশ বয়স। অটুট শরীর। মসৃণ চামড়া।

— বৌদি কথা কম বলে। বিশ্বাস করুন বাড়ী ছেড়ে এমনিতে রাস্তাতেও বেরোতে চাইতো না। সংসার নিয়েই থাকতো। দাদার তো মুদির দোকান তেমন বেরোন হয় না। সেধে তো কোথাও যেতেই চায়নি কখনও আমরা সাধলেও হেসে এড়িয়ে যেতো।

— আবার পালাবে না তো নীলিমা?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে নীলিমা ননদের হাত ধরে প্রথম কথা কয়ে উঠলো।

— এবার বৃন্দাবন আর বেনারসটা ঘুরে এলাম বুঝলে ঠাকুরঝি।

স্নেহ

প্রণব কুমার পাল

এইমাত্র বিনতা অফিস থেকে ফিরল। প্রতিদিনের মত স্নান করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ি পড়ল। চুল আঁচড়াতে যাবে এমন সময় কলিংবেল বাজল। – বুলি, দেখতো কে এলো আবার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে গুন গুন করে গান গাইতে লাগল।

বুলির আগে টুকাই ছুটে গেল দেখতে কে এসেছে। বাবা, তুমি। গেটের তালা খুলতে খুলতে টুকাই হাসিমুখে বলল, কি মজা। তুমি আজ তাড়াতাড়ি এলে? বুলি আর দাঁড়াল না। সুজয় মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে ঘরে ঢুকল। বিনতার গানের সুর কানে এলো। – টুকাই মা কখন এসেছে? – তুমি আসার কিছুক্ষণ আগে। – আচ্ছা, তুমি পড়। আমি হাতমুখ ধুয়ে তোমার কাছে আসছি। টুকাই বাবার কোল থেকে নেমে পড়ার টেবিলে গেল।

সুজয় বিনতার পাশে এসে দাঁড়াল। – কি ব্যাপার। খুব যে খুশি খুশি দেখছি আজ! - - বা'রে আমি কি গান গাই না। নাকি গাইতাম না। তুমি তো আমার গান শুনেই বিয়ে করেছিলে। – না, তা নয়। এমনিই বলছিলাম। – তা, তুমি যে এত সকাল সকাল? – অফিসের কাজে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম হয়ে গেল। অফিসে ফেরার দরকার ছিল না তাই বাড়িতেই এলাম। একটু চা হবে? – ওই, তোমার এক কথা ঘরে থাকলে। দেরী হবে। – ঠিক আছে বলে, সুজয় টুকাইয়ের কাছে গেল।

টুকাই পড়ছে। বুলি উল বুনছে। বুলি সারাক্ষণ থাকে। টুকাইয়ের সব ভার বুলির ওপর। সুজয় টুকাইয়ের পাশে চেয়ারে বসল। – মামনি, কি পড়ছ? – পদ্যটা মুখস্থ করছি। - - ও ... হঠাৎ টুকাই চেয়ার থেকে উঠে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। কেঁদেও ফেলল। বলল, জানো বাবা, মা-না আমায় একটুও ভালোবাসে না। তোমার আগে মা এসেছে। আমাকে একবারও মা বলল না টুকাই কেমন আছিস। কোনদিনও বলে না। কান্নায় ভেঙে পড়ল টুকাই।

চা নিয়ে বিনতা ঢুকল। মেয়েকে দেখল। কিছু বলল না। – তোমার চা, বলে টেবিলে রেখে চলে গেল। টুকাই মা'র দিকে তাকাল। বুলিও তাকাল। সুজয় দেখল বিলতাকে। কিছু বলল না। টুকাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল। মামনি তুমি পড়। সামনেই তোমার পরীক্ষা। কাঁদে না। টুকাই নিজের চেয়ারে বসল চোখ মুছতে মুছতে।

সুজয় জানে সব, কিছু বলতে পারে না বিনতাকে। বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। একবার রেষ্টুরেন্টে বিল দিতে গিয়ে টাকা কম পড়ে যায়। ওরা দু'বন্ধু অস্বস্তিতে পড়েছিল। যদিও রেষ্টুরেন্টে সবাই চেনে বিনতাকে। সেই সময় সুজয়ও বসেছিল ওদের সামনে। – বলেছিল, কিছু যদি মনে না করেন। মানে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। আমিই দিয়ে দিচ্ছি। পরে না হয় আমাকে দিয়ে দেবেন। – সেই পরিচয়। পরে বিয়েও হয়ে গেল সুজয় ও বিনতার।

এই দশ বছরে টুকাই ওদের একমাত্র সন্তান। সুজয় মেয়ের সব আবদারই মেনে নেয়। টুকাইও বাবাকে পেলে নানান গল্প করে। স্কুলের, বন্ধুদের। বুলির কথাও বলে। ও টুকাইয়ের

থেকে বছর পাঁচেকের বড়, নিজের দিদির মত। যত কথা বুলির সঙ্গে।

বিনতা শুয়ে আছে। সুজয় খাটে হেলান দিয়ে সেগারেট ধরাল। ধোঁয়াটা ছেড়ে বলল। বিনু টুকাই খুব কাঁদছিল আজ। বলছিল – তুমি নাকি ওকে একটুও ভালবাসো না। কি যে কর তুমি। বিনতা কথাগুলো শুনল। বোঝা গেল না পাশে মুখটা থাকার জন্য। হঠাৎ বিনতা পাশের ঘরে ছুটে গেল। ওর ছুটে যাওয়া দেখে সুজয় থতমত খেয়ে গেল। ব্যাপার কি দেখতে গিয়ে দেখল। বিনতা টুকাইকে বুকে নিয়ে এ ঘরে এলো। শুয়ে পড়ল কোন কথা না বলে। টুকাই মার গলা জড়িয়ে আছে ঘুমের ঘোরে।

টুকাই বুঝতেই পারল না ও শুয়ে আছে মার কোলে।

রাখী বন্ধন

অনন্ত ভট্টাচার্য

বুম্...............বুম্.............বুম্.............

বিস্ফোরনের আওয়াজের মধ্যেই ঘুম ভাঙে শোরিফার। শব্দটা নতুন নয়। জম্মুর এ জায়গাটাতে প্রতিনিয়তই এ শব্দটা চলছে। শব্দটাই অর্থহীন এদের কাছে। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর পেরিয়েও এর শেষ হ'লনা! একটা বাচ্চা এই শব্দের মধ্যেই জন্মাল—বড় হল--গৃহস্থ হল--বুড়ো হল--শব্দের মধ্যেই --শেষ হয়ে গেল! সাত -পাঁচ ভাবছিল সেরিফা.....।

ঠক্.......ঠক্........ঠক্..........

বন্ধ দরজায় শব্দ হয়। খোলা না হলে ভাঙবে।

খুলল সেরিফা। হুড়্মুড়্ ক'রে ঢুকে পড়ে চারজন। মুখে কালো কাপড় বাঁধা। হাতে স্টেনগান। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে তারা। নিঃশব্দে ব্যস্ততায় চারিদিকে খোঁজে কিছু। পায়না। বসে পড়ে সবাই। ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি কথা কয়। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে সেরিফা।

-- 'এই হাঁ ক'রে কি দেখছিস্? এটা রাখী--আজ পরতে হয়। তেষ্টায় পানি দিলি না? তুই তো বহিন।'

ওরা কিছুক্ষণ থেকে বেরিয়ে যায়। হাতের রাখীটার দিকে তাকায় সে। আজ রাখী পূর্ণিমা।

-- 'খোল্ দরজা খোল্'—হুংকারে চিন্তা টুকরো হয়ে খান্ খান্ হয়। জলদি খুলে দেয়। তিন-চারজন জওয়ান ঢুকে পড়ে।

-- 'এই, একটু আগে কারা এসেছিল র‍্যা?'

--'ওরা কারা জানিনা, তোমরাও যেমন ওরাও তেমনি।'

'ঘরে আছে নাকি?'

--'না।'

চলে যায় ওরা। যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে আসে একজন।

– 'তোর হাতে এটা কি রে?'

—'রাখী।'

– 'কে দিয়েছে?'

--'ভাই।'

-- 'বেইমানি! ছিল না কেউ?' স্টেনগান গর্জে ওঠে। লক্ষ্য সেরিফার বুক। ছিটকে আসে লাল টাট্‌কা রক্ত। রক্ত গড়িয়ে রাখীটা আরও টক্‌টকে লাল রঙীন হয়।

ঘোড়া

সুরঞ্জন প্রামাণিক

আমার একটি ঘোড়া আছে -- উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ঘোড়া মানে পুতুল ঘোড়া। চামড়ার তৈরী। ওটা আমার শোবার ঘরে! যেদিকে আমি মাথা রেখে শুই, তার বিপরীতে দেয়াল লাগোয়া একটি উঁচু টুলের ওপব -- পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে-- যেন ছুটতে ছুটতে দীর্ঘ গভীর সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে কিম্বা খাদ পেরিয়ে যাবার আগমুহূর্ত -- এক এক দিন যখন নির্ঘুম মধ্যরাত গড়িয়ে যায় তখন হঠাৎই ঘোড়াটিকে দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

একটা গোপন অসুখে ভুগছি আমি। এই যে আমি বসে আছি -- দেখে কী মনে হচ্ছে -- খুবই সুস্থ সবল, তাই তো? আসলে কিন্তু স্থবিরতা আমাকে গিলে খেয়েছে....

কিম্বা, এই যে হাঁটছি -- খুবই প্রত্যয়সিদ্ধ পদক্ষেপ, তাই না? আসলে পোলিও ক্রাটে হাঁটছি আমি -- একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সমস্ত শরীরে সর্পিল তরঙ্গ উঠছে ..

আমি যে এরকম এক রোগগ্রস্ত মানুষ -- এটা সেই ঘোড়াই আমাকে জানিয়েছে --

আর এটা জানার পর আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে না -- আমি সারপ্লাস; আমার মেধা, আমার তেজ-ক্ষিতি অপ, সব সবই উদ্বৃত্ত--আমার শোবার ঘর জুড়ে অন্ধকার -- একদিন ওই অন্ধকারে আমি আমার বিচার সভা বসাই -- আমার মৃত্যুদন্ড হয়....

আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল।

একজন জানতে চায়, তোমার অন্তিম বাসনা?

আমি বলি, ছুটতে চাই।

না-মঞ্জুর।

আমি বলি, দন্ডিতের শেষ ইচ্ছা পূরণ করাই তো মানবিক কিম্বা ঐশ্বরিক।

আমাকে জানানো হল ইচ্ছের মধ্যে যদি ধান্দা কিম্বা চালাকি থাকে সেটা না-মানাই মানবিক। এবং ঈশ্বরের নির্দেশও সেরকম। এটা ঠিক চালাকি ছিল-- একবার যদি ছুটতে পারি আমার ধারণা, মৃত্যুকে অতিক্রম করে যেতে পারব, আমি রোগমুক্ত হব -- সেদিন ঘোড়ার পরামর্শে আমি সন্ধি করেছিলাম।

সেই থেকে বেঁচেও মরে আছি। কিন্তু আশ্চর্য! অসহ্য হয়ে উঠেছে এই মরে থাকা। কাল ঘোড়াকে চিৎকার করে বলেছি, কেন বলেছিলে, সন্ধি করো? ঘোড়া কোন উত্তর করেনি।

এখন এই মধ্যরাতে ঘোড়া বলল, আজ থেকে তুমি আর আমি বন্ধু।

-- কিন্তু আমি তো তোমার মনিব।

-- ছিলে। আজ থেকে নয়। কারণ আমরা দুজনেই বন্দি। হাওয়া বোঝ রণবীর -- মানে মরুৎ?

ওই কথায় আমি টের পেলাম নিস্তরঙ্গ হাওয়ার মধ্যে ডুবে আছি স্থির।

-- আকাশের দিকে চাও--ব্যোম!

তাকাতেই ডানার স্বপ্ন জাগল।

-- বুঝলে রণবীর, মরুৎ আর ব্যোমে তৈরী আমি--আমার রক্তে গতির নেশা, আকাশ ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা...এসো! সওয়ার হও!

ঘর্মাক্ত জেগে উঠলাম আমি। স্পষ্ট টের পাচ্ছি, প্রতিটি রোমকূপ থেকে উঠে আসছে হাজার হাজার বছর আগেকার অশ্বখুরের শব্দ।

নিমিত্ত মাত্র

পঞ্চানন কুন্ডু

সান্যালবাবুর মেয়েরা রা রা করে বাড়ির বাইরে বার করে দিল বিড়ালটাকে। ও বাচ্চা দেবে। ব্যাথা উঠেছে, তাই বাড়ি বাড়ি তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। সকালবেলায় পাশের সান্যাল বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকতেই আমি চায়ের কাপ ফেলে রেখে ফুলঝাড়ু নিয়ে তাড়া করলাম। বিড়ালটা শোয়ার ঘরে ঢুকে গেল। আমি ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করছি বুঝে শোয়ার ঘর থেকে পালাবার মুখে দিলাম কষে এক ফুল-ঝাড়ুর বাড়ি।

আমার বৌ ইরা ব্যাপারটা দেখে শিউরে উঠল। আঃ হাঃ কী করলে! জান ও মা-যষ্ঠির বাহন? যার কৃরপায় আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী সুস্থ-শরীরে শ্বশুরের ঘর করছে। শুনে আমি ঝাঝালাম, রাখ তোমার মা-ষষ্ঠিব না বাবা ষষ্ঠি। ওর এত ঘন ঘন পেট বাধাবার কি দরকার? এইত কয়েক মাস আগে ওট এক বিয়েন বিয়িয়ে ছিল আমার খাটের তলে। মনে নেই, সেবার মদ্দা-বাচ্চা দুটোকে হুলো এসে মেরে রেখে গেল -- পচে সে কী গন্ধ!' 'আমি জানি সব জানি। তবু বলি নিজেদের যখন দুই দুটো বাচ্চা আছে তখন মা-ষষ্ঠিকে চটান কি ঠিক?

ঝাঁটা খেয়ে বিড়ালটা পাঁচিল টপকে পালিয়েছিল। দুপুরে খেয়ে বাইরে ঘরে খাটে বসে মৌজ করে সিগারেট টানছি। হঠাৎ দেখি ঝাঁটা খাওয়া বিড়ালটা পেছনের পা'টা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে আমার ঘরে ঢুকল। জোর তাড়া দিলাম 'পালা'। ও আমার তাড়া গায়ে মাখল না - সটান বাইরের ঘরের এ্যাটাচ্ড অব্যবহৃত ল্যাট্রিনটার দরজা ঠেলে সেখানে ঢুকে পড়ল। বিড়ালটার অডাসিটি দেখে আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়! কী করা উচিৎ ঠাওরাতে না পেরে পাখার নিচে শুয়ে শুয়ে ভাবছি। এমন সময় ল্যাট্রিন থেকে চিঁ চিঁ শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম কম্ম হয়েছে। সেফ্ ডেলিভারি হয়ে গেছে। তখন চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। ভাবলাম, ইরাকে কিছু জানতে দেব না। আজ হয়েছে থাক। কাল সকালে ইরা যখন চান করতে বাথরুমে ঢুকবে তখন ধাড়ি বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চাগুলোকে টপাটপ পলিব্যাগে তুলে নিয়ে দুই-সতীনের পুকুরে ছুড়ে ফেল্লে ল্যাঠা পরিষ্কার।

পরের দিন সকাল সাতটা নাগাদ ইরা বাথরুম ঢুকল। আমি বিড়ালটাকে তাড়াবার জন্য একটা হাত পাখা এবং বাচ্চাগুলোকে তুলে নেওয়ার জন্য একটা বড় পলি ব্যাগ নিলাম। সন্তর্পণে ল্যাট্রিনের দরজা একটু ফাঁক করে দেখি সদা-সতর্ক মা তার বাচ্চাব গা চাটা ভুলে তীক্ষ্ণ অথচ করুণ নজর আমার চোখে ফেল্ল। আমি পাখা দিয়ে মারতে যাব এমন সময় খিদে-তৃষ্ণায় অবসন্ন মা তার আহত-পা নিয়ে বল্ল, ম্যাঁও। আমি দেখলাম বিরস ফিকে লাল জিব। শুনলাম ম্যাঁও নয়, করুণ মিনতি ভরা 'নো'। আর মারা হল না। পাখা হাতে পিছিয়ে এলাম দোর ভেজিয়ে দিয়ে।

সকালে বাজারে গিয়ে পাঁচশ ভেটকি মাছ ও অন্য সব জিনিসের সাথে হাফ্‌লিটার দুধ নিয়ে বাড়ি এলাম।

ইরা মাছ-দুধ দেখে বল্লে, এত মাছ-দুধ, ব্যাপার কী। বল্লাম, দুপুরে এক ভদ্রমহিলা এখানে এখানে -- রাতেও থাকবেন। বিরক্ত ইরা বলল, তোমার মেয়ে-প্রীতিটা বুড়ো কালেও গেল না। তা ভেটকির ঝোল হবে না ঝাল হবে? বল্লাম, অর্দ্ধেক ঝোল, অর্দ্ধেক ভাজা। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে ইরা বল্লে, তোমার ভদ্রমহিলা তো এলেন না। 'আসবেন আসবেন, বলেছেন বেশি দেরি দেখলে আমরা যেন খেয়ে নি।' 'তাহলে তোমাকে দি।' বল্লাম, 'দুজনের ভাত বেড়ে নাও।'

খাওয়ার পরে কাজ সেরে ইরা তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার মিনিট দশেক বাদে আমি একটা বাটিতে বড় বড় দুখানা ভাজা ভেটকি ও অন্য বাটিতে দুধের অর্ধেকটা নিয়ে বিড়ালটার মুখের কাছে রাখলাম। আগে মাছগুলো খেল। তার পর চক্‌চক্ করে দুধ খাচ্ছে। এমন সময় ইরা আচমকা আমার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, প্রসূতিকে অন্নজল করছ?

বল্লাম আমি করার কে?

ইরা, তবে কে করছে?

"পরম পুরুষ করছে -- আমি নিমিত্ত মাত্র!"

বেলাভূমি

দীপশিখা পোদ্দার

(১)

পলাশ গাছটা কাঁপছিল তিরতির। নন্দন চত্বর জুড়ে মানুষের ঢেউ। ভেসে যাচ্ছে এর চোখ, ওর হাসি, কপালের ডানদিকে তিল ভাসতে ভাসতে গতবার এমন করেই স্রোত ডেকে এনেছিল। তারপর সারাটা বছর উঃ! জল শুধু জল...শমীক জানত ওর কাকলি নামের এক গাছ আছে। আশ্রয়ের উপযুক্ত ঘর তাও আছে। দুটো কচি চারা আছে উঠোনের কোণে। তবু নন্দন চত্বর থেকে দীপাবলি নামে ওই নদী-অতটা ভাসিয়ে নিল?

(২)

একটা বছরযেন অনন্ত, অসীম। এ্যাতটা অসীম কোনদিন পৃথিবীতে ছুঁয়েছিল একটা বছর? শমীকের চুল ওড়ে। হাওয়া দেয় সেই দৃঢ় অনন্তের থেকে। সন্ধেটা টুকরো হচ্ছে। খন্ড খন্ড সন্ধের ভিতর শমীক কিছুতেই নিজেকে ঢোকাতে পারছে না। না জাগরণ, না স্বপ্ন, না কোন ইচ্ছের মোড়ক, তার কোন কিছুই সন্ধেটা গ্রহণ করছে না।

(৩)

একটু আগেই দীপাবলি নামে ওই নদীটাকে বয়ে যেতে দেখেছে শমীক। যাকে ঘিরে বয়ে গেল, শমীক জেনেছে তার বেশি কিছু নেই ওর চেয়ে। শুধু সমাজ নামের এক বেলাভূমি ছাড়া।

গাড়ি

অসিতকৃষ্ণ দে

আধুনিকতার ছোঁয়াচবিহীন অজ পল্লীগ্রাম। অনেকের কাছেই নাম ছিল অজানা। অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা দুজন কৃষক খুন হওয়ায় হঠাৎ দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনামে। বিরুদ্ধে দুই বিবাদমান রাজনৈতিক দলের দাবি -- মৃতরা তাদের লোক। ফলে সংবাদপত্রের কলমে চলেছে পরস্পর চাপান উতর। এদিকে গ্রামের শান্ত পরিবেশে উত্তপ্ত আবহাওয়ার পরিমন্ডল।

কেনারাম মন্ডল এই গ্রামে বেশ কিছু জমি জায়গার মালিক, ব্যবসাতেও ইদানীং বেশ টাকা পয়সা করেছে। ব্যবসার সূত্রেই কলকাতায় তার যাতায়াত এবং একটি রাজনৈতিক দলের লোকেদের সঙ্গেও বেশ দহরম-মহরম। অনেকদিন থেকেই তার মনে গ্রামের নেতা হওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। কিন্তু সেরকম সুযোগ না পাওয়ায়......। এখন এরকম অপ্রত্যাশিত সুযোগ যে একেবারে তার দরজায় এসে উপস্থিত হবে সে ভাবতে পারেনি। কলকাতায় ঘটনাটুকু যোগাযোগ করে গ্রামে প্রতিবাদ সভা করার সব আয়োজন পাকা করে, গ্রামের কিছু মানুষকে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে নিজের চেলা ও বানিয়ে নিয়েছে। মহকুমা শহর থেকে মাইক ভাড়া নিয়ে এসে সাইকেল রিক্সায় তার প্রচারও শুরু হয়ে গেছে।

এই প্রথম কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই গ্রামে আসছেন। বিশেষ করে বীণা রায়ের মত জাঁদরেল মন্ত্রী। সেইসঙ্গে আসছেন মেজ-সেজ প্রায় হাফ ডজন নানা মাপের নেতা। এই নিয়ে গ্রামের চারিদিকে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। মন্ত্রী এবং নেতারা পিচ্ রাস্তা অবধি গাড়িতে এসে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় পায়ে সভাস্থলে হাজির হবেন। কেনারামের এই পরিকল্পনা মনে ধরে নেতাদের। সেইমত আয়োজন হয়েছে। গ্রামের মানুষের সহানুভূতি পাওয়া এতে সহজ হবে।

নিজের একখন্ড বড় জমিতেই সভার আয়োজন করেছে কোরাম। খরচের খামতি নেই বিকালে সভা। দুপুর থেকেই সপরিবারে মানুষ আসতে শুরু করেছে। কয়েকজনকে সঙ্গে নিযে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনার জন্য পিচ্ রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকে সে।

মন্ত্রী, সেইসঙ্গে প্রায় হাফ-ডজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থলে এসে চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম হয় কেনারামের। কিছুক্ষণ আগেও ভরা জনসমুদ্র দেখে গিয়েছে, আর এখন মাঠে আর্ধেকের বেশি লোক উধাও। সর্বনাশ। গেল তোথায় সব? তবে কী বিপক্ষ দলের লোকেদের কারসাজি? প্রথমে এরা রা কাটেনি, মজা দেখছিল। শেযে ....। একজন হাফ নেতা এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করে- কী হল মশাই, মন্ত্রীকে এত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে এলুম আর এই কটা মাত্রলোক? লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় কেনারামের।

সামনে একজন চেলাকে পেয়ে খোঁচিয়ে ওঠে- হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? লোগুলো গেল কোথায় দেক, টেনে নিয়ে এস।

মিনিট কয়েকের মধ্যে ফিরে আসে সেই চেলা। হাঁফাতে হাঁফাতে হলে- কেউ যায় নি, আছে। সবাই ভিড় করেছে গিয়ে পিচ্ রাস্তায়। বলছে মন্ত্রী হন, মানুষ তো বটে! সে তো রোজই দেখছি। এমন সুন্দর হরেক গাড়ির মেলা কী আর দেখতে পাব? এক্ষুনি তো চলে যাবে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় বটে।

কেনারাম হতভম্ব হয়ে চেলার মুখপানে তাকিয়ে থাকে। মন্ত্রী এবং নেতাদের নানান মডেলের সুন্দর সুন্দর গাড়ি যে তাঁর এতবড় সর্বনাশ ঘটাবে, তাঁর কল্পনায় ও আসেনি।

বাঁচা

মঞ্জুলা ভট্টাচার্য্য

মেয়েটির বয়স বাইশ। পুকুর ঘাটের শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায় মেয়েটি। সাঁঝের বেলা। পশ্চিমের আকাশে সূর্য তখন ডুবু ডুবু। মেয়েটির পরনে বেনারসী, কপালে চন্দন। বিয়ের সাজ। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বাবা বৃদ্ধ এবং গরীব। কন্যার দায় নামাতে অর্থিক সামর্থ্য নেই। বিনা খরচায় এক পাত্র ঠিক করেছে। পাত্র দোজবর। তিনটি সন্তানের বাপ। বড়টির বয়স সতের। মেয়েটি পুকুরে ডুবে মরতে এসেছে। শেষ ধাপ থেকে কে পা জলে নামাতেই পিছন থেকে কাঁধে একটা হাত। মেয়েটি থমকে দাঁড়ায়, চকিতে পিছন ফিরে দেখে পাড়ার রাজু মস্তান।

-- তুমি এসময়ে এখানে কি মতলবে?

-- তোকে বাঁচাতে।

-- মরবি যখন এখানে কেন? আয় আমার সঙ্গে।

মেয়েটি যন্ত্র চালিতের মতো রাজুকে অনুসরণ করে। রেল স্টেশন। রেলগাড়ী। হাওয়া ব্রীজ, তারপর কোলকাতা। কোলকাতায় ট্রামে বসে অগুনতি ভীড়, লোকের মাথা , রাস্তার পর রাস্তা। একটা গলি। গলির দুপাশে দোকান। একটা বাড়ির সদর দরজা। সদর দরজা পেরিয়ে একটা ওঠোন। উঠোনের তিনদিকে সারি সারি ঘর। সুন্দরী মেয়ে-মানুষের ভীড়। বেল, জুঁই ফুলের গন্ধ। গান। ঘুঙুরের আওয়াজ। তবলার শব্দ। মাঝে মাঝে নারী কণ্ঠের হাসি। মেয়েটি ভীরু চোখে রাজুর দিকে তাকায়। একটা দরজায় কড়া নাড়া দেয় রাজু। এক পৃথুলা মহিলা দরজা খুলে দাঁড়ায়। পান খাওয়া মুখে একগাল হেসে-- ' আরে রাজু যে কি খবর? দরজার পাশে জড়সড় মেয়েটিকে দেখিয়ে এটি কে?

-- নিয়ে এলাম তোমার এখানে থাকবে বলে।

-- এসো, এসো - দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় মহিলাটি। রাজু মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে

-- পুকুরে ডুবে মরার চেয়ে এ ঢের ভাল। এখানে মরেও বেঁচে থাকবি।

নিরুদ্দেশ

কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস

রিনির ব্যবহার ও সৌন্দর্য সমানুপাতিক। কেউ আজ পর্যন্ত তার খুঁত ধরতে পারেনি। রিনির স্বামী ব্যাঙ্ক অফিসার। একটি মাত্র সন্তান হোস্টেলে থাকে। যে সে হোস্টেল নয়, নরেন্দ্রপুর। এখন বুবু এইটে পড়ে। সেই রিনি একদিন দুম করে বাড়ি ছেড়ে উধাও। সবাই তাজ্জব। স্বামী শ্যামল ভেঙে পড়ে। অনেক পর খবর পায়, রিনি একজনের সাথে দিল্লিতে। সুখে সংসার করছে। অনেক বছর পর রিনির চিঠি আসে, 'আমি ভালো আছি। তুমি ভালো থেকো। বুবুকে দেখো।'

শ্যামল এখন রিটায়ার্ড। বুবু এখন বিবাহিত। বুবুর স্ত্রী যেদিন সন্তান প্রসব করে, সেদিন খুব ধুমধাম। সেই সন্তানের নাম হীরা। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। হীরার বয়স যখন তিন, তখন বুবুর স্ত্রী আচমকা কর্পূর। দুঃখে শোকে লজ্জায় বুবুর হার্ট অ্যাটাক ও ছবি হওয়া। হীরা পাঁচে পড়লে বুবুর স্ত্রীর চিঠি আসে, ভূপাল থেকে, 'আমি ভালো আছি। হীরাকে মানুষ করো।'

হীরা এখন যুবতী ও সুন্দরী। পড়াশোনায় চৌকস। শ্যামল তখন বয়সের ভারে কাবু। সেই হীরাও একদিন নিরুদ্দেশ। শ্যামলের অন্তিম সময়ে চিঠি আসে হীরার, 'দাদু, তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি। সামনের মাসে আমার সন্তান হবে। ভাবছি, ছেলে না মেয়ে? আচ্ছা দাদু কোনটা হলে ভালো হয়?'

মন

কুমারর অজিত দত্ত

...আয়নায় অপর্ণাকে দেখা যাচ্ছে। এ-ঘরে বসে লক্ষ্য করছে অলোক। মাঝের দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে অপর্ণাকে প্রতিবিম্ব এসে পড়ছে এ-ঘরের আয়নায়। অফিসের সারাদিনের ঘর্মাক্ত শাড়ি পাল্টাচ্ছে অপর্ণা। অনেকদিন পরে বাসে দেখা অপর্ণার সঙ্গে। সেই তাকে জোর করে নিয়ে এসেছে, এক কাপ চা খেয়ে যেতে হবে বলে। যে অপর্ণা তাকে দু-চোখের বিষ বলে ভাবত সে অপর্ণার আজ এত পরিবর্তন! অলোক কিন্তু অপর্ণার প্রতি চিরকালই সম্ভ্রম, ওকে পেলে সুখে রাখবে বলে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু রূপসী ও ধনীর দুলালী বলে অহংকার ছিল অপর্ণার। অলোক স্বীকার করে অপর্ণার পাশে ও কিছুই না। তবু একটা আসক্তি, একটা স্বপ্ন ছিল অপর্ণাকে ঘিরে। ...হঠাৎ অলোক লক্ষ্য করে অপর্ণা শাড়ি খুলে ফেলেছে, এখন শুধু গায়ে ব্লাউজ আর পেটিকোট। উত্তেজিত হয়ে ওঠে অলোক, ভেতরে ভেতরে একটা পাপবোধও কুরে কুরে খায় তাকে, ছিঃ এ কি করছে সে... অলোকের শরীর দিয়ে ঘাম বেরোতে শুরু করে। এবার অপর্ণা আস্তে আস্তে ব্রা-টা খুলে ফেলে, আঁতকে ওঠে অলোক, চোখদুটো বুজে ফেলে... ভগবান এতোই নিষ্ঠুর....

--- কি হলো তুমি ক্লান্ত, ফ্যানটা চালিয়ে দেব?

অলোক চোখ খুলে তাকায় অপর্ণার দিকে। আগুন রঙের শাড়ি পড়েছে একটা, এ্যাতো সুন্দর অপর্ণাকে কোনদিন দেখেনি সে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অলোক, তারপর বলে,

--- আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই অপর্ণা

--- এখন আর সম্ভব নয় অলোক

--- সে আমি জানি অপর্ণা। কিন্তু আমি তো তোমার মনটাকে চাই, তোমার মনটাকে তো ক্যানসারে খায় নি ...

অপর্ণা কেঁদে ফেলে।

ওভার টাইম

স্বপনকুমার মান্না

অবশেষে বীথিকা একটা কাজের সন্ধান পেল। তার আশা সংসার তরীটাকে কূলে ঠেকাবে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তার কাজের মাপ। বিকাশ ঘোষের শখের ফুল বাগানে জল দেওয়া, আগাছা উৎপাটন, খোল-সার দেওয়া ....।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ বীথিকার মনে কোন খেদ নেই। বর্তমান বাজারে কাজটাকে সে ভগবানের আশীর্বাদ ভাবে। তার সহপাঠী অনেক মেয়েরাই এই কাজটা পাওয়ার ব্যাপারে বিকাশবাবুর কাছে যোগাযোগ করেছিল। বীথিকার বরাত ভাল! মাস মাইনের দু'হাজার টাকায় মনে প্রাণে জোয়ার এসেছে। যেমন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বাগানের গাছগুলোর। ফুলের সৌরভে বাগান আমোদিত। এখন পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে বীথিকার থেকে সুগন্ধ অনুভব করা যায়। কান খাড়া করে রাখলেও বীথিকার রুগ্ন সংসারে কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা -- মাত্র দু'হাজার টাকায় এতকিছু সম্ভব! প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে বীথিকা উত্তর দিয়েছে -- ওভার টাইম। 'যখন খেতে না পেয়ে তার সংসারটা, তার শীররটা শুকনো হয়ে যাচ্ছিল, তখন কেউ'তো খোঁজ রাখেনি'।

বাগানের দশটা পাঁচটা ডিউটির পর বীথিকার বিকাশ ঘোষের ব্যক্তিগত কাজ করতে হয়। ঘর-দোর সাফ করা, চা করে দেওয়া, হাত-পায়ের আঙ্গুল টেনে দেওয়া.... বীথিকাকে নিয়ে প্রতিবেশীদের আর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বীথিকার এখন নিজেকে নিয়েই মাথাব্যথা। আয়নার সামনে সে তার শরীরটাকে অন্য রূপে দেখেছে! তাই মন খুলে সে এখন কথা বলতে পারে না। কারো সামনে সাহস করে দাঁড়াতে' ও ভয় পায়। পাছে প্রতিবেশীরা কিছু বলে! এক সপ্তাহে বীথিকা নিজেকে আত্মগোপন করে রাখল বাড়ির মধ্যে। কিন্তু তার পেটের ভেতর? পৃথিবীর আলো বাতাস পাওয়ার জন্য যে মুক্তির দিন গুনছে, তাকে কিভাবে ঢাকবে? -- 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা অসম্ভব! বার হাত শাড়ি নিতান্তই তুচ্ছ'!

সব কিছু ভেবে খুব ভোরে বীথিকা বেরিয়ে পড়ল বিকাশ ঘোষের বাড়ির উদ্দেশ্যে। সে ভূত দেখার মত চমকে উঠল! বাড়ির সদর গেটে তালা ঝুলছে। মুহুর্তেই বীথিকার চোখে মুখে ধোঁয়া! চোখ ফেটে জল আসে। 'কত ভালবাসার কথা, বাঁচার কথা, রঙিন স্বপ্ন দেখিয়েছিল এই বিকাশ ঘোষ'। বীথিকা নিজেকে জড় পদার্থে পরিণত করার জন্যে সামনে 'পা' বাড়ায়।

পরক্ষনেই প্রতিবেশীদের কানাঘুষো -- ওভার টাইম! মাগি ওভার টাইমের কথা শোনাচ্ছে। ওই ওভারটাইমের ফল একদিন ওকে হাতে হাতে পেতেই হবে। শুধু বীথিকা জানে না -- এটা ওভারটাইম ফল না ভালবাসার ফল?

অচেনা স্বর

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

গেটের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল শান্তা। স্কুল গেট থেকে সোজা এগিয়ে এসেছে রাস্তা। দুপাশে খেজুর গাছ, নারকেল গাছের মধ্যে সরু সিঁথির মত রাস্তাটা গাড়ি বারান্দায়' এসে থেমেছে। গেটের ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে মৌসুমী। ফাইভ–সির মৌসুমী হালদাব।

আপাতত কমনরুমে আশ্রয় নেওয়া যাক। তবে এ আড়াল বেশিক্ষণের নয়। এক্ষুণি ডাক আসবে-শান্তাদি আপনাকে একটি মেয়ে খুঁজছে। দাঁড়িয়ে আছে।

যেকোন একটা ক্লাসে চলে গেলেই হয়। সে রাস্তাও বন্ধ। এই সময়টায় শান্তার ক্লাস নেই। কদিন ধরে স্কুলে এলেই এই দোলাচলের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মৌসুমীর সামনে গেলেই শুনতে হবে, দিদিমণি, আমার রেজাল্টটা যদি.....। শুধু পাস না ফেল...। এট্টু যদি.....।

তোকে বারবার বলেছি না, মাইনে না দিলে রেজাল্ট পাওয়া যাবে না।

বাবা সোমবার আসবে বলেছে...। আজ যদি.....।

সোমবারই রেজাল্ট নিবি। শুকনো মুখটা দেখে সামান্য একটু হাসে শান্তা। আবার বলে, কি করব বল, স্কুলের নিয়ম তো আমায় মানতেই হবে।

আসলে সমস্যা তো অন্য জায়গায়। গতবছর, এবছর, পরপর দুবছর ফেল কবল মেয়েটা। দুবছরের মেয়েদের জন্য বরাদ্দ টি.সি.টা তো ধরতেই হবে। খামে ভরা রেজাল্টের সঙ্গে ওটিও তো অপেক্ষা করে আছে।

আর পারে না শান্তা। মিটিং-এও চেঁচিয়েছিল ওরা। এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল যদি নিয়মটা একটু পাল্টাত। গরীব এলাকা। তিন বছর ফেলে টি.সি. হলেই ঠিক হতো।

না না। সে কি করে হয়? স্কুলের কোন স্ট্যান্ডার্ড থাকে না। অন্যপক্ষেও কম টিচার ছিল না।

মৌসুমীর কেসটা আরো সাংঘাতিক। মাইনে দেয়নি। তাই রেজাল্ট পাবে না। আর মাইনে দিলেই রেজাল্টের সঙ্গে পাবে টি.সি.। এ যেন শাঁখের করাত।

গম্ভীর শান্তা কমনরুমে খাতার বান্ডিল খোলে। এখন বেরোলেই বিপদ। দরজার পাশেই ঐ বিপন্ন মুখের উঁকিঝুঁকি। দেখেও না দেখার ভান করে।

এবারেই হাফইয়ার্লির পরে ওর মাকে ডেকেছিল শান্তা। দিনের পর দিন কামাই এবারে ফেল করলে স্কুলে তো টি.সি. দেবে।

কতটা বুঝেছিল কে জানে? ঘাম ঘাম মুখে ঘাড় নেড়েছিল মহিলা ঃ জানি দিদিমনি কিন্তু কি করি বলুন, ঐ গুমটির দোকানে ওর বাপ বসে। আমি কেটারিং-এ যাই। নাহলে খাব কি? ভাইবোনগুলোকে ওই যা একটু দেখে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে......।

স্কুলে এলে পেটান শুনেছি। তাহলে ভর্ত্তি করলেন কেন?

মহিলা মাথা নিচু করে বলেছিলেন, এবার নিশ্চয়ই পাঠাবো। একটু দেখবেন দিদিমনি

কে যেন ডাকছে। চোখ তুলে দেখে শান্তা। মরিয়া মেয়েটা শেষ অবধি কমনরুমেই ঢুকে পড়েছে। দিদিমণি বলছিলাম কি......।

যা, বাইরে যা, যাচ্ছি।

খাতাগুলো গুটিয়ে বেরিয়ে আসে শান্তা। বড়দি আজ আসেননি। একটু এলোমেলো ভাব চারদিকে। মৌসুমী দূরে দাঁড়িয়ে নখ কাটছে।

টাকা এনেছিস?

না দিদিমণি। আজ বাবা মা কেউ নেই। দুজনেই কেটারিং-এর কাজে মুর্শিদাবাদ গেছে। ভাইবোনেদের ঘরে শেকল তুলে রেখে দৌড়ে দৌড়ে এসেছি। এখুনি চলে যাব। রেজাল্ট-টা যদি বলেন. ...। পাশ তো?

ওর মাথায় হাত রেখে গেটের দিকে হাঁটে শান্তা। চারুশীলা বিদ্যানিকেতনে এক্ষুনি টিফিনের ঘন্টা পড়বে। মৌসুমীর মুখ যেন হাসিহাসি। ও কি ভাবছে ও পাশ করেছে! নাকি আজ ভাত জুটেছে ঠিকঠাক। তাই হাসছে মেয়েটা।

গেটের বাইরে এসে মাথা থেকে হাতটা নামিয়ে নেয় শান্তা ঃ যা বাড়ি যা। তুই এবারেও.....। গলাটা আটকে যায় কেমন। কথাটা শেষ হয় না। মেয়েটার মুখে রোদ্দুর ভাসছে। বোকাবোকা চোখদুটো নিভে যাচ্ছে হঠাৎ।

শান্তার নিজের গলা নিজের কাছেই অচেনা লাগে। সেই না চেনা স্বরটা বলছে, মৌসুমি শোন, মাকে বলিস, মাইনে আর দিতে হবে না।

সত্যিই
নির্মলেন্দু গৌতম

পার্থর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল নন্দিনী।

চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে হাত ঘড়ির ওপর চোখ রাখল। এখনও ট্রেনের অনেকটা দেরী আছে।

ইচ্ছে করেই হোটেল থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছে পার্থ আর নন্দিনী। আসলে, জিনিসত্র সব গুছোনো হয়ে গেলে আর বেরিয়ে পড়বার জন্য ঘড়িতে চোখ রেখে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করে না।

বিয়ের পর এই প্রথম সাত দিনের জন্য পার্থর সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল নন্দিনী। সাত সাতটা দিনের প্রত্যেকটা দিনই বুঝি প্রথম পাবার মতো করে নন্দিনী পেয়েছিল বেড়াতে আসা পার্থকে।

সেই সুখটুকু বুঝি নন্দিনীর শরীর-মত ভরে খেলা করছে। ফিরে যেতে সেজন্যেই বুঝি দারুণ কষ্ট হচ্ছে নন্দিনীর।

'কোথাও বসবে।' পার্থ হঠাৎ নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল।

নন্দিনী বলল, 'বসব।'

প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে এসে বসল দু'জন।

পার্থ বলল, 'অনেকটা আগেই কিন্তু এসে পড়েছি।'

নন্দিনী বলল, 'সত্যিই'।

একটু সময় নিঃশব্দ থেকে বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে পার্থ বলল, 'সাত সাতটা দিন কিভাবে ফুরিয়ে গেল না!'

পার্থর চোখে চোখ রাখল নন্দিনী। কি যেন ভাবল। তারপর অধৈর্যভাবে পার্থর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, 'না সাত সাতটা দিন ফুরোল না।'

চমকে নন্দিনীর দিকে তাকাল পার্থ।

অধৈর্যভাবেই হাসল নন্দিলী। বলল, 'সত্যিই সাত সাতটা দিন ফুরোল না। সাত সাতটা দিন মনের ভেতর স্বপ্ন হয়ে রয়ে গেল। একবার ভাবতে চেষ্টা কর।'

নন্দিনীর চোখে চোখ রাখল পার্থ। কিছু বুঝি দেখল নন্দিনীর চোখের তারায়। বড় করে একটা শ্বাস নিল। তারপর নন্দিনীর দিকে একটুখানি ঝুঁকে পড়ে বলল, 'সত্যিই।'

মনে মনে উধাও হয়ে গেল নন্দিনী।

ভুলুবাবু

অপূর্ব চক্রবর্তী

নাম তার ননীমাধব। অথচ লোকে তাকে ভুলুবাবু বলে জানে। কারণ ওই যে ভীষণ আলভোলা মন তার। একবার বাজারে গিয়ে একটা
, ইলিশমাছ কিনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে বেশ ফাঁপড়ে পড়লেন তিনি। ছেলেমেয়ে দুজনের ক্লাসে ওঠার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে আর এখন ঘরে ঢুকল ইলিশমাছ। রক্তচক্ষু করে তার স্ত্রী চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কাছাকাছি বাড়ির লোকেরা জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে, কেউ কেউ আবার খবর দেখার জন্য আগু হয়ে এল। কারণ তারা জানত এই আলভোলা লোকটা নিশ্চিত কিছু একটা ভুল করে বসেছে।

বিরক্ত হল ভুলুবাবু। এদের সব ব্যাপারে একটা আলাদা কৌতূহল। নাঃ ভুলুবাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরে কিংবা ব্যাপারটা নিয়ে আর সাতকাহন হতে না দিয়ে অমনি ছুটলেন বাজারের দিকে। উদ্দেশ্য ওই মাছটা পাল্টে অন্য কোনো জ্যান্ত মাছ কিছু একটা নিয়ে আসা।

কিন্তু কি হল ? ওই যে ভুলুবাবু বাড়ি থেকে বাজার যেতে হাঁটা পথ পাঁচ মিনিট লাগে। ওখানেই গন্ডগোলটা হয়ে গেল। রাস্তায় যেতে হরেকরকম লোকজনের সঙ্গে দেখা। হরেকরকম কথার বিনিময়। বেমালুম ব্যাপারটা ভুলে গেলন। এবং তার চেয়ে আরও বড় একটা ইলিশমাছ নিয়ে এসে হাজির ওই ছোট ইলিশমাছটা পাল্টে। সুতরাং পরের ব্যাপারটা তো জানাই।

একবার অফিসিয়াল ব্যাপারে ভুলুবাবুকে দিল্লী যেতে হয়েছিল। রিজার্ভেশন চার্ট টাঙিয়ে দিয়েছে অথচ ভুলুবাবু তার টিকিটের নাম্বার কিছুতেই মেলাতে পারছেন না।

ট্রেন যখন স্টেশনে ইন করল অর্থাৎ কারসেড থেকে এল তখন ভুলুবাবুর মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। টি.টিকে কাছে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, ইউ আর এ মার্ডারার! কথাটা শুনে টি.টি ভদ্রলোক প্রথমে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন তারপর রাগও হল তাঁর। পরক্ষণেই ভাবলেন ভদ্রলোক বোধ হয় কোনো সমস্যায় পড়েছেন তাই চেঁচিয়ে এসব কথা বলছেন। রাগলে অনেকে নিজেকে খিচুড়ি করে ফেলে। যাইহোক ভুলুবাবু কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে এক ঝলক তার রিজাভের্শন করা টিকিটের ওপর চোখ রাখলেন। টিকিটটা দেখেই টি.টি ভদ্রলোক হাসিতে দুলে উঠলেন, ধুরমশাই আপনি চেঁচাচ্ছেন! এ যে দেখছি স্টেশন মিস্ করে ফেলেছেন। অনেকে ট্রেন মিস্ করে আর আপনি স্টেশন মিস্। তাজ্জব কি বাত ! আবার অট্টহাসি হাসতে লাগলেন।

পরে ভুলুবাবু নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন তার দিল্লীগামী ট্রেনটা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ছাড়ার কথা আর উনি হাওড়া স্টেশনে বসে।

হাজিরা

পাপড়ি ভট্টাচার্য

সারাদিন টো টো করে স্টেশন চত্বর ঘুরে এসে ঋক জানাল, মা ওকে পাওয়া গেল না। যা হোক করে তোমরা চালিয়ে নাও আজকের দিনটা। দেখি ওর দেশের বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে।

— তুই কি এখন ওখানে যাবি নাকি?

— না না ফোন করব ওদের পাশে ত্রিদিব বাবুর বাড়ীতে। সেই অসুখের সময় নম্বরটা দিয়েছিল না?

— কি হবে বলতো, বিয়ের দুদিন আগে নতুন লোকই বা পাবো কোথায়। উঃ কি জ্বালায় না। ঠিক কাজের সময় উধাও? তবে কোন বিপদ আপদ হয়নি তো। ঠাকুরটা যেমনি ভাল মানুষ তেমনি ভাল রাঁধে। কথার কি কোনো দাম নেই। অচেনা লোকও তো নয় যে এমনি করে ডোবাবে।

ঋক কয়েক ঘন্টা বাদে ফের ঘোষণা করল। ট্রেন ঠিকমত চলছে। হরিচরণ বাড়ি থেকে সাত সকালেই বেরিয়েছে তার নিজস্ব হাতা খুন্তী নিয়ে। ছ'টার মধ্যে যার হাজির হবার কথা, গেল কোথায়?

রান্না সংক্ষিপ্ত করা হ'ল। মুখ ভার করে আত্মীয়জনেরা রান্নায় হাত লাগাল।

ঠিক দুপুরবেলা দেখা গেল রান্নার ঠাকুর বিধ্বস্ত অবস্থায় আসছে।

সকলের কৌতুহলী প্রশ্ন। এত দেরী হ'ল যে। এক গেলাস জল দাও বলছি সব। ঠান্ডা জলের ধারা গলার ভেতর দিয়ে বুকে নেমে যেতেই আরাম হ'ল হরিচরণের। বললো চোখ বড় বড় করে গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে। ' আমায় আটক করে রেখেছিল।'

— কে? কে তোমায় আটকালো?

— আর বুলব কি রেলগাড়ীর কালো কোট সাত সকালে সময় মত হাজিবা দেবে জানলে টিকিট না কেটে কি আসতুম?

জেনে নেবার জন্য
দীপালি চৌধুরী

'হ্যালো', হ্যালো, — আমি নমিতা রায় বলছি — ওদিক থেকে প্রিন্সিপাল হিমাংশু সেনের ভরাট কণ্ঠ শোনা যায়।

বাবা রিটায়ার হতে চলেছেন। তাই সদ্য বি.এ. পাশ করা নমিতাকে বিয়ে দিয়ে কর্তব্য শেষ করে নিতে চান। কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসলো বিয়ে করবে না। বাবা-মা অনেক বুঝালেন, কিন্তু মেয়ে অনড়।

শেষ পর্য্যন্ত বড় মেয়ে-জামাইকে খবর পাঠালেন। ওরা এসেও অনেক বুঝালেন, কিন্তু নমিতার এককথা -- বিয়ে করব না।

জামাইবাবু ঠাট্টা করে বললেন, — মনোনীত কেউ থাকলে বলে ফেল, আমরা সেখানে ব্যবস্থা করবো।

নমিতা মনে মনে হাসে। যার সাথে ভালবাসার দুটি কথাও হয়নি, সে নমিতাকে ভালবাসে কিনা তা ও জানে না, তার সাথে বিয়ে! নমিতা শুধু এইটুকু জানে, সে নমিতার হৃদয়ে একস্থায়ী আসন পেতে বসে আছে। নমিতা কিছুতেই তাকে সরাতে পারছে না। সে বর্তমানে কোথায় আছে তাও নমিতা জানে না।

একদিন ক্লাসে এসে দেখলো ছিমছাম হিমাংশু স্যারের বদলে আর্মি ম্যানের মতো ইয়া গোঁফওয়ালা এক স্যার চেয়ারে বসে আছেন। শুভ্রা পাশ থেকে কানে কানে বললো হিমাংশু স্যার প্রমোশন পেয়ে চলে গেছেন। উনি আমাদের নতুন স্যার।

নমিতা বুঝলো তার বুকের ভেতর থেকে হৃদপিন্ডটা যেন কে উপড়ে তুলে ফেলেছে। বুকের ভেতর যন্ত্রনায় টন্ টন্ করতে লাগলো।

এরপর অনেক কাল কেটে গেছে, নমিতা এখন প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি, বুকের যন্ত্রনায় পড়েছে সময়ের প্রলেপ।

আজ পাঠ্য জীবনের বন্ধু সুমি এসেছিল নমিতার অফিসে। দুজনে অনেক গল্প হলো, অতীতের সে সব দিনের কথাও আলোচনা হলো। কথা প্রসঙ্গে সুমি বলল, আমাদের হিমাংশু স্যারের কথা তোর মনে আছে তো, কদিন হলো উনি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছেন।

সুমি চলে যাবার পর নমিতা সুমিদের কলেজের নম্বরে ডায়াল করলো। হয়তো না জানা কথা জেনে নেবার জন্য। — হ্যালো, হ্যালো, আমি নমিতা রায় বলছি.....

সমস্যা সমাধান
সিরাজুল ইসলাম

ওসমানপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী মুনমুন ও তানিয়া। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই তারা তিন বছরের বড়-ছোট। যেন সমবয়সী। অথচ তারা পিঠাপিঠি বোন। মুনমুন বড়; তানিয়ে ছোট। বড়টা চাপা; ছোট দাপুটে। বড়টা মার্জিত; ছোটোটা মুখরা। তবে মুনমুন পড়াশুনায় সাধারণ মেধার আর তানিয়া রীতিমত বাড়িয়ে নেবার মত। তারা দু'জনেই একাদশ শ্রেণীতে পড়ে — যদিও বড়টার এত দিনে কলেজে পড়ার কথা। দু'বার বড় রকমের অসুস্থতার কারণে মুনমুন পরীক্ষায় বসতে পারে নি। তাই তারা একই ক্লাসে পড়ে। আর বলার কথা তানিয়া প্রতিবারই ক্লাসে প্রথম হয়। সকলের চোখ তাই তানিয়ার দিকে।

মুনমুন ও তানিয়ার বাবা অরবিন্দ ঘোষাল এই স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক। প্রথাগতভাবে, নতুন শিক্ষক-শিক্ষিণকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতের বেশ মূল্য আছে। সেই মত জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক নিয়োগের বেলায় তিনি বেশ নড়েচড়ে বসলেন। ক্যান্ডিডেটকে ব্রাহ্মণ হতে হবে এবং তার এক মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। তবে, সে কোন্ মেয়েকে বিয়ে করবে — সে ব্যাপারে ক্যান্ডিডেটের স্বাধীনতা থাকবে। তবুও অরবিন্দবাবুর প্রত্যাশা সে যদি বড়টা-কে পছন্দ করে তবে তিনি বেশী খুশি হবেন। কারণ তার বয়স হচ্ছে। আগে ছোটটার বিয়ে হলে পরে বড়টার বিয়ে দিতে তাকে বেগ পেতে হবে। পাঁচজন পাঁচকথা বলতে পারে। সমাজে মন্দলোকের অভাব নেই। অরবিন্দবাবু যখন কন্যাদায় থেকে রক্ষার্থে তার নিজস্ব ছক্ কষছেন, তখন তার হতাশা আরও বেড়ে গেল। কারণ, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে যে কুড়িজন ক্যান্ডিডেটের নাম এলো কেউই ব্রাহ্মণ সন্তান নয়। তার মধ্যে আবার সাতজন মহিলা। নিজের হতাশার কথা শেষ পর্যন্ত তিনি বলে ফেললেন হেডমাষ্টারের কাছে। হাতের মানুষ ও কাছের মানুষ বলে হেডমাষ্টারমশাই অন্য অঙ্ক কষলেন। ইন্টারভিউ নেওয়া হল। তা ডি. আই অফিসে পাঠানো হল। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে রিপোর্ট করা হল। ..... এ লটের কোন ক্যান্ডিডেটই পরিচালন সমিতির বিচারে যোগ্য নয় — অতএব অন্য আরেকটা লট পাঠানো হোক। অরবিন্দবাবুর মনের বরফ কিছুটা কাটলো।

দ্বিতীয় লটে যাদের নাম এলো তাতে সাতজন ব্রাহ্মণ সন্তান। তবে ছ'জন ব্রাহ্মণ কন্যা। আর একজন অব্রাহ্মণের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল এত ভালো যে তাকে ইন্টারভিউ থেকে বিরত করা হল। কারণ ইতিমধ্যে কলেজ সার্ভিস কমিশনে তার ইন্টারভিউ হয়েছে। সেখানেই তার হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত ওসমানপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীবনবিজ্ঞানের নতুন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলেন রমেশচন্দ্র মৈত্র। না-লম্বা, না-বেঁটে। দেখতে সুশ্রী। টিকালো নাক। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। তাদের পারিবারিক অবস্থা তত ভালো নয়। অভাবের সংসার। ইতিমধ্যে কয়েকবার কয়েকটি স্কুলে ইন্টারভিউ দিলেও ভাগ্য খোলেনি। কারণ 'ডোনেশন'। আর কন্যা উদ্ধারের দাবি। অনেক স্কুলে কন্যা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কন্যার

জাত-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র না মেলায় তার শুভক্ষণ আসে নি। জগতে কত রকমের সমস্যা। এতদিনে তার জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। মেয়ে না দেখেই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণকন্যা শুনেই যাবতীয় শর্ত রমেশবাবু মেনে নিলেন।

অবশেষে মেয়ে মাছাইয়ের পর্ব। তানিয়া আহ্লাদে আটখানা। রমেশবাবু নিশ্চয়ই তাকে, শুধুমাত্র তাকেই পছন্দ করবেন। তাই সে একা একা ঘরে সুখ-স্বপ্নের জাল বুনে চলে। তার গতি-প্রকৃতিতে মুনমুন মন-মরা হয়ে যায়। সে ভাবে রমেশবাবু তানিয়াকেই পছন্দ করবেন। কারণ সে চটপটে, বেশী মেধাবী। অরবিন্দবাবু ও তাঁর স্ত্রী চিন্তিত মুনমুন কে নিয়ে। চাপা হলেও মেয়েটা বড় অভিমানী। অরবিন্দবাবু নিজেই ভুল করে বসেছেন। আগে থেকে বলাই উচিত ছিল বড় মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। তিনি ছক্ কষেও চালে ভুল করেছেন। এখন নিজের ভুলের জন্যে চুল ছিঁড়ছেন। মুনমুনকে নিয়েই দুর্ভাবনা। যদি কিছু করে বসে।

...... কিন্তু সকলকে অবাক ক'রে রমেশবাবু মুনমুনকে জীবন-সঙ্গিনী করলেন। সবাই ভাবলেন, ছেলেটা বুদ্ধিমান। অরবিন্দবাবু'র মান রক্ষা করেছে সে। আসলে যেদিন ইন্টারভিউ দিতে রমেশচন্দ্র মৈত্র ওসমানপুর আসেন সেদিন পথে বিনম্র স্বভাবের এই মেয়েটিকে দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন এই মেয়ের মত মেয়ে পেলে জীবনে তাঁর দুঃখ থাকবে না। সেদিন তিনি জানতেন না যে ওটা স্কুলের পরিচালনা সমিতির সম্পাদকের মেয়ে।

সম্প্রীতির মিছিলে

সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

খুশিতে ডগমগ অনূঢ়া শিখা ভট্টাচার্য মিছিলের পুরোভাগে চলেছেন। কণ্ঠে আওয়াজ, "জাতিতে জাতিতে বিভেদ আমরা মানছি না মানবো না। মনুষ্য সৃষ্টি জাতিভেদ ধ্বংস হোক। সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতি ধ্বংস কারীদের কালো হাত ভেঙ্গে গুড়িয়ে দাও।"

শিখা ভট্টাচার্য মানে গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষিকা, বর্তমানে স্থানীয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী। জলন্ত গোধরা কান্ডের ভয়ঙ্কর রূপের বিরুদ্ধে এই মিছিল।

দুই সম্প্রদায়ের নরনারীর মিলিত বিশাল মিছিল এগিয়ে চলেছে। শিখা দেবী বড়ই খুশি। হঠাৎ তেতুঁল তলার মোড়ে শিখা দেবী লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। জ্ঞান হারিয়েছেন। কিছু লোক ধরাধরি করে পাশেই হাসপাতালে য়ি গেলে ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, — "এখনই অন্তত দু'বোতল 'O'-Neg Fresh Blood প্রয়োজন।" সমবেত কারও রক্তের Group মিলল না। এমন সময় এগিয়ে এল ইব্রাহিম এবং তার Group- এর সাথে মিলে গেল শিখা দেবীর Blood Group। বেঁচে গেলেন শিখা দেবী। তিন দিন পরে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

দিন কয়েক পর ইব্রাহিম দেখা করতে এল শিখা দেবীর সাথে। শিখা দেবী বললেন "ঐ উঠোনের সিঁড়িটাতে বস"।

ইব্রাহিম বসে এক গ্লাস জল চাইলে শিখা দেবী ঘটি করে জল এনে বললেন — "হাত জোড় করে আলগোছে জল খা, আমি ঢেলে দিচ্ছি। তোর হাতের ছোঁওয়া লাগলে আবার এই সন্ধ্যায় অসুস্থ শরীরে চান করতে হবে আমাকে"।

ইব্রাহিম দু'চোখের জলের ধারার স্বাদ ওষ্ঠে নিয়ে তৃষ্ণা নিবারন করে বাড়ি ফিরে গেল।

অর্ধেক জীবন

নীলিমা সরকার

ছাড়াছাড়ির মধ্যে দিয়ে মুক্তি খুঁজেছিল চেতন ও চৈতালী – বলেছিল আর দেখা হবে না। আর আসবে না। আর কোন কথা হবে না।--

কিন্তু একটি বন্ধুর বিয়েতে একদিন দুজনকেই আসতে হয়েছিল দুই মেরু থেকে। তাই আসাও হোল, দেখাও হোল কিন্তু কোন কথাই শুধু হোল না।

সারাটা রাত্রি কিভাবে যে কেটে গেল। বহুবার সম্মুখীন, বহুবার হেঁটমাথা। বহুবার মুখ তুলে তাকানো। চোখে চোখে। চোখের কোণে অব্যক্ত কথা। হৃদয়ের গভীর খুঁড়ে কথার পংক্তি চারারা সেজে সেজে গজিয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু প্রত্যেকবারই অপ্রত্যাশিত হৈ হৈ হুল্লোড়ের ব্যর্থতা চেতনায় বিষ ঢেলে দিল। কিছুতেই একসাথে একান্ত হতে পারল না। অব্যক্ত ভোর হতেই আশ্চর্যভাবে চলে যেতে হোল দুজনকেই আবার .....

... দুদিক থেকে দুজনেই মিলনের আকাঙ্খার দাস হয়ে সেই মুক্তিরই উপনিবেশ গড়ে চলেছে - যদি ফিরে আসে .....। তবে মাঝখানে কিসের ফারাক?

ধূসর বসন্তে ....

অনন্যা মুখোপাধ্যায়

হরবোলা ছেলেটি রোজ সকাল ও বিকেল বেলা সাইকেল করে অমলেন্দু বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়ত করে। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে কখনো কোকিলের ডাক, কখনো বা কাকের ডাক, কখনো বা শালিখের কিচির মিচির নকল করে। তার নকল করা সুর, সাইকেলের আওয়াজ, পাশের স্কুলবাড়ীর ঘন্টা এ ক'টা জিনিস মাত্র অমলেন্দুর চেনা। চেনা সেই মেয়েটি যার কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ, মাথার পিছনে একটি বড় মাপের খোঁপা, পরনে নীল শাড়ি-এছাড়া চেনা মেয়েটির সকাল-সন্ধ্যে দুবেলা এই সরু গলিপথে যাতায়াত।

ভোর হতেই অমলেন্দু সামনের বারান্দায় বসে তার ক্যানভাস,রঙের বাক্স, পেন্সিল ও কবিতার খাতাটি সাথে করে। একার সংসারে কোনো ব্যস্ততাই তার নেই। তাই সারাদিন সে শুধু এঁকে যায়। সামনের এপ্রিলে অমলেন্দুর বয়েস হবে পঞ্চান্ন-নিজের পাকা চুলের দায়িত্ব তাই তাকে সর্বদা সচেতন করে তুলির আচড়গুলোকে সূক্ষ্ম করতে। ক্রমশঃ ভারি জিনিষগুলো সে তাই খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এ'কদিন ধরে অমলেন্দু যেন খেই হারিয়েছে। হরবোলা ছেলেটির কোকিলের ডাক সে কান পেতে শোনে। গাছের পাতার হালকা সবুজ রঙ তার ক্যানভাস এসে পরে, আঁকতে আঁকতে এসে পড়ে মেয়ে, যার গায়ে জরান নীল শাড়ি, মাথায় খোঁপা আর সার মুখে পরন্ত সূর্যের হিন্দুল আভা।

রোজ সকাল-সন্ধে মোট পাঁচ মিনিট অমলেন্দু কোনভাবেই নষ্ট হতে দেয় না। কোন কাজও রাখে না। একমাত্র কাজ শুধু সেই মেয়েটির চলে আসা ও চলে যাওয়া দেখা। তার মুখটি অমলেন্দু কোনদিন কাছ থেকে দেখেনি, কিন্তু তার মুখের চাহনি অমলেন্দু দেখেছে। যেদিন অমলেন্দুর বাড়ির সামনের শিবমন্দির দেখে মেয়েটি প্রনাম করেছিল। দেবতাহীন সেই শিবমন্দিরে মেয়েটি কি দেখেছিল অমলেন্দু জানেনা কিন্তু জানে, নিজে কী দেখেছিল। মনে মনে বলেছিল - 'এ যে সখী সমস্ত হৃদয় কোথা জল কোথা কূল দিক হয়ে যায় ভুল, অন্তহীন রহস্য নিলয় এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী এ তবু তোমার .....।' মনে এসে যাওয়া কবিতারও লাইন সম্পূর্ন হতে দেয়না অমলেন্দু। চুয়ান্নটি সিঁড়ি করার অভিজ্ঞতা, অজান্তেই তার হাতটিকে মাথায় ছুঁইয়ে দেয়। নিয়ে বসে পরে নিজের খাতা-কলম-কাগজ-তুলি। নীল শাড়ি পরা মহিলার আঁচলে তখন ফুটিয়ে তোলে মেঘাবৃত অশনি।

নিয়মিত একটানা আনন্দহীন এই জীবনে তবুও ভাঁটা পড়ল অমলেন্দুর। রোজ রোজ যার জন্য অপেক্ষা করা তাকে সে আজ কিছুদিন হল দেখতে পাচ্ছে না। মনের কোন্ কোনে হঠাৎ ব্যাথা অনুভব করল অমলেন্দু। সমস্ত প্রকৃতিই আজ নিমেষের মধ্যে ছন্দহীন হয়ে উঠল। মনের মধ্যেই অনবরত কাব্য গজিয়ে ওঠে 'বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে' ..... তার পর নিজেরই মনে হল এতো মধুরাত নয়, গায়ে হলুদ দেওয়া কোনো বিকেল; আর এই বেদনা কি কোনো বিরহ?

'বিরহ' কথাটি এখানে ঠিক খাটে কিনা সেই দায়ীত্ব সে আর নিতে রাজী হল না। বেশী ভাবাভাবি না করে আবার বসে পড়ল ক্যানবাস-রঙ-তুলি নিয়ে। প্রায় অসম্পূর্ন এই ছবিটি সময়ের ব্যাবধানে নিশ্চয়ই সম্পূর্ন হয়ে যাবে। তাই সে ছবিতে চড়াল রং। আর প্রতিজ্ঞা করল যেদিনই তার নবপ্রিয়ার দেখা হোক না কেন, ছবিটি তাকে উপহার দিতে হবে। অমলেন্দু একমনে এঁকে চলল। বাইরে কোন গাছে এই সময় একটি কোকিল ডেকে উঠল।

দিন দশেক বাদে অবশেষে অমলেন্দুর অপেক্ষার শেষ হল। তার বারান্দা থেকে গলিটা সোজা দেখা যায়। দূর থেকে একটি মেয়ের ক্রমশঃ হেঁটে এদিকে চলে আসা খুব চেনা লাগল তার। আর দেরী নয়। ঘরের ভিতরে চলে গেল সে। আজই সেই সুযোগ, ফটোটা তাকে দেতেই হবে। বড় মাপের সেই ফটোটা হাতে করে অমলেন্দু হাজির হল গেটের সামনে। সেই মেয়েটি ততক্ষণে অমলেন্দুর গেটের সামনে চলে এসেছে। কিন্তু একি। মেয়েটি যে একটি টকটকে লাল রঙের শাড়ি পরেছে, আর তার কপালে লাল রঙের বড় টিপ। অমলেন্দু নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। হাতে ধরা ফটোটির সঙ্গে সে বারেবারে মেলাতে চাইল মেয়েটিকে। আশ্চর্য .. ছবিটিও সম্পূর্ন বদলে গেছে। মেয়েটির মুখের সেই আরক্তিম আভা টি যেন চুরি করেছে তার শাড়িটি। কোথা থেকে কপালে সিঁদুরের রঙের টিপটিও এসে পরেছে তাও অমলেন্দু জানতে পারল না।

অমলেন্দু ছবিটিকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়েটি তখন তার চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে সে শুনতে পারল স্কুলের ঘন্টা। সমস্ত দিন তার অন্যদিনের মতো কেটে গেলেও সেদিন কিন্তু সে আর হলবোলা ছেলেটির কোকিলের ডাক শুনতে পায়নি।

পালানি

মোহন নস্কর

এই নিয়ে পাঁচবার হলো। শ্রীলতা রাগ করে চলে গেল বাপের বাড়ি। প্রথম গিয়েছিল বিয়ের তিন মাস পর। এক সপ্তাহ পর নবেন্দু গিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। দ্বিতীয়বার গিয়েছিল এক বছর পর। ছিল এক মাস। শাশুড়ি যেতে লিখেছিলেন। নবেন্দু গিয়ে মান ভাঙিয়েছিল স্ত্রীর। ফিরে এসেছিল শ্রীলতা। তৃতীয়বার পালিয়েছিল দ্বিতীয়বারের পাঁচমাস পর। চতুর্থ গত বৈশাখে। শাশুড়ির শত অনুরোধেও নবেন্দু যায়নি। তিনমাস বাপের ঘরে থেকে নিজেই ফিরে এসেছিল। অজুহাত দেখালো – তোমার কষ্টের কথা ভেবে চলে এলাম। না হলে আমার কি প্রয়োজন? মা বাপ কি আমাকে খাওয়াতে পরাতে পারতো না? নবেন্দু শুধু হাসলো। সে জানে শ্বশুরের অনেক টাকা। বিরাট ব্যবসা, শ্রীলতা একমাত্র সন্তান। ভরণপোষণের অভাব হবে কেন! তবে শ্রীলতার অজুহাত বিশ্বাস করলো না।

গত কয়েকবছরে শ্রীলতার আগাপাস্তালা চিনে গেছে নবেন্দু। এবারের যাওয়াটাকে মোটেই গুরুত্ব দিল না। অন্যবারের মত গেছে আবর সময় হলে নিজেই ফিরে আসবে। রঘু পুরানো কাজের লোক। বাজার করা থেকে ঘরমোছা, কাপড়কাচা থেকে রান্না সব কাজই করে। নবেন্দুর অসুবিধা হয় না। বিগত দিনে ফোন করে স্ত্রীর মান ভাঙাতে চেষ্টা করেছে। এবার একেবারে নীরব। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় দেখতে চায়।

ঘটনা খুবই সামান্য। শ্রীলতা নবেন্দুকে বলেছিল – আজ একটু আগে ফিরবে।

-- কেন?

-- শমিতার প্রথম সন্তান হয়েছে একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

শমিতা শ্রীলতাব মাসতুতো বোন। নবেন্দু হ্যাঁ বলেছিল, কিন্তু এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বারে ঢুকেছিল। স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে ছিল না। যখন ফিরলো তখন অনেক রাত। কলিংবেলে হাত দিয়ে মনে পড়লো কোথায় যেন যাবার কথা ছিল! শ্রীলতা দরজা খুলে কটমট করে তাকালো। নবেন্দু গম্ভীর হবার ভান করে বললো – আমি কি করবো! অফিস থেকে বেরুবার সময় বস ডেকে পাঠিয়ে কাজ দিলেন। পুরুষরা স্ত্রীকে ভোলাতে চিরকালই মিথ্যা বলে শ্রীলতার অজানা নয়। সে বুঝলো নবেন্দুর অজুহাত মিথ্যা। ফোঁস করে উঠলো ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতো।

--- তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকা ভাল। ব্যস, কোন কথা নয়। ব্যাগ প্রস্তুত করেই রেখেছিল। ঘরের চাবি বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহনিয়ে নিচে নেমে গেল। নবেন্দু দেখলো ট্যাক্সি ডেকে বাপের বাড়ি চলে গেলে শ্রীলতা।

পাঁচমাস বাপের বাড়িতে আছে শ্রীলতা, নবেন্দুর মনটা মাঝে মাঝে শূণ্যতায় ভরে যায়। অন্য সূত্রে খোঁজখবর নিলেও ফোনে যোগাযোগ করে না। আসলে বার বার একই ঘটনার

পুনরাবৃত্তির জন্য জেদ চেপে গেছে। মেয়ে মানুষ বলে বার বার মান ভাঙাতে হবে। রঘু কাজের লোক। কিন্তু অনেকদিন থাকার ফলে বাড়ির লোকের মতই হয়ে গেছে। পারিবারিক অনেক কথার মাঝে মন্তব্য করে বসে। দাদাবাবু বৌদিদিমনি কখনও কখনও তাকে সাক্ষী মানে। তার মতামত চায়। আবার বেতাল বলে ফেললে ধমকও দেয়। রবিবার ছুটির দিন চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে রঘু বললো – দাদাবাবু অনেকদিন হয়ে গেল, এতদিনে বৌদিদিমনির রাগ নিশ্চয় পড়েছে। গিয়ে নিয়ে আসুন।

ধমকে উঠলো নবেন্দু – তুই চাকর, তোর অত কথার দরকার কী? আমি তাকে যেতেও বলিনি, আসতেও বলবো না। আনতেও যাবো না।

সবিনয়ে রঘু বললো – মেয়েমানুষ অপরাধ করে ফেলেছে....

নবেন্দু রায় বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেললো – তুই হলে কি করতিস?

— আপনাদের মত বড় ঘরে এসব হয় দাদাবাবু। আমাদের মত গরীব ঘরে এমন হয় না। পিটিয়ে লম্বা করে দিলেও আমাদের বউ পালায় না। উল্টে পেটালে বউয়ের সঙ্গে ভাব বেশী হয়।

রঘুর কথা শুনে আশ্চর্য হলো নবেন্দু।

ব্যাকডেটেড
মৌমিতা মন্ডল

অনিকেত বাবু, আপনাকে একবার হেডস্যার দেখা করতে বলেছেন বলেই দৌড় লাগায় হরি। স্কুলে টিফিন পিরিওডে খাতা দেখছিলেন অনিকেত। অগত্যা উঠতে হয়। স্যার, আমায় ডেকেছিলেন— হ্যাঁ বসো। আচ্ছা তুমি নাকি গতকাল একটা ফাইভের ছেলেকে মেরেছো? একটু সময় নেয় অনিকেত, তারপর বলেন — হ্যাঁ মেরেছি। অনেকদিন ধরে পড়া পাচ্ছিলাম না ওর কাছ থেকে। আর বাঁদরামিতে তো সবাব আগে। কিন্তু ছেলেদের গায়ে হাত তোলাটা ঠিক হয়নি। ওর গার্জিয়ান এসেছিলেন। এরকম যেন আর না হয়। তবে স্যার আমি তো সেরকম ভাবে মারিনি যাতে ওর গার্জিয়ানকে ছুটে আসতে হয়। আহা-হা তুমি বুঝছো না। দিনকাল বদলে গেছে। এখন সবাই বড্ড সচেতন। সত্যিই সবাই সচেতন। অনিকেত ভাবে ছেলেবেলায় গ্রামে প্রাইমাবি বা সেকেন্ডারীতে পড়ার সময়ও পড়া না করে আসলে বা ক্লাসে দুষ্টুমি করলে পন্ডিতমশাইদের তেল লাগানো বেত লাঠির ঘা একটাও বাইরে পড়তো না, কি দাপট ছিল তাঁদের। আর সম্মানও। পিটানোর সময় সেই রুদ্রমূর্তি দেখলে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেত। কখনোবা ইঁট হাতে করে রোদ্দুরে নীল ডাউন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। এসব এখন ব্যাকডেটেড। আজকালতো গার্জিয়ান কল্ করা হয়। ভাবতে ভাবতে অনিকেত বেরিয়ে আসেন হেডস্যারের ঘর থেকে।

শিরোনাম

জাহাঙ্গীর আলম শেখ

কারগিল সেনা ছাউনিতে বিস্ফোরন .... কেশপুরে জ্বলছে ঘর ..... গড়বেতায় পুড়ল চার যুবকের দেহ ..... খনিতে জলবন্দী শ্রমিক ...... লাতুরের পর আর এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প গুজরাটে ..... ত্রানসামগ্রীর লুঠতরাজ ....

দৈনিক কাগজের শিরোনাম গুলোই পাক খাচ্ছে মাথায়। রোজ সকালে শুধু শিরোনাম গুলোই পড়ে বিবেক। ভিতরের খবরে তার আগ্রহ নেই। একই খবরের নিত্যনতুন উপস্থাপনা।

জলের ট্যাপ্‌টা খোলাই আছে। জল পড়ছে টপ্ টপ্-টপ্ টপ্। বিবেকের মন অক্ষাংশ -- দ্রাঘিমাংশ পেরিয়ে মেদিনীপুর -- কাশ্মীর - গুজরাট ঘুরে শেষে ফিরে আসে 'আন্‌ব্রেকেব্‌ল' ফাইবার গ্লাসের বালতিতে। হারু মস্তানের দলের একজন ব'লে গেল, 'মাছিটা বড় ঘ্যান ঘ্যান করছে - ও কে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসি'। থম্‌থমে ভাব সারা পাড়াটা জুড়ে। মাঝে মধ্যে অবাধ্য কুকুরগুলো সে নীরবতা ভেঙে দিচ্ছে খান খান করে।

বালতি ভরে গেছে জলে। জল উপছে পড়ছে। অনেক জল -- স্রোত বয়ে যাচ্ছে। 'আন্‌ব্রেকেব্‌ল' বালতি তবু ভাঙছেনা। ড্রেনের ওপার থেকে আসছে আর এক স্রোত - রক্তের। মিশে যাচ্ছে জলের অনু-পরমানুতে। রক্তের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে বিবেক। একটা ছোট ঘরের সামনে থমকে গেছে সেই স্রোত। বাড়িটা সুজাতার - বিবেকের প্রেয়সীর। চাকরির অভাবে চারহাত আর এক হয়ে ওঠেনি।

দরজা'টা হাট ক'রে খোলা। যেন অনেক অবাধ্য ঝড়ের সাথে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মেঝেতে পড়ে আছে সুজাতার দেহ। বন্য জন্তুর অত্যাচারে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আঁচড়ের চিহ্ন চোখে-মুখে ....

বালতি ভরে গেছে কিন্তু ভাঙেনি -- 'আনব্রেকেব্‌ল'। কিন্তু বিবেকের মন ভেঙে চৌচির। মনটা'তো 'আন্‌ব্রেকেব্‌ল' নয়! এই প্রথম বিবেকের মনের সাথে তার ঘরও ভেঙেছে।

কাল কাগজের নতুন শিরোনাম ---- 'ধর্ষনের পর খুন -- সুজাতা।'

ছবি

অমরেশ মুখোপাধ্যায়

খুব যে প্রশস্ত ঘর তা নয়। সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে আর্টের নানান উপকরণ। পশ্চিমদিকে একজনের শোয়ার মত তক্তাপোষ। তার উপরে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো প্রমাণ সাইজের তৈলচিত্র। একটি তরুণীর। এখনো ঘরময় রঙের গন্ধ। ছবির সামনে ইজেলে টাটকা রঙ। সাদা রঙের পাত্রে জাপটে আছে ছ'নম্বরের ফ্ল্যাট তুলিটা। সারা রাত ছবি এঁকে ক্লান্ত বিভাস একটু রাস্তার দিকে গেছে। পূবের আকাশ থেকে শরতের মিঠে রোদ ছবির মেয়েটির মুখে, বুকে এবং কোমরের নীচে খেলা করছে। এমনে সুন্দর মুহূর্তটিকে পরিফিউমের গন্ধে ভরিয়ে দিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে কঙ্কা। ছবিটা তার। কঙ্কারই আবদারে আঁকা। মমতা, প্রেম, কামনা এবং স্পর্শের উষ্ণতা দিয়ে।

ছবিতে চোখ রেখে অবাক হয়ে যায় কঙ্কা। এ'ছবি তারই। সন্দেহ নেই। চোখ দুটো তো তার অবশ্যই। কিন্তু ঠোঁট! গ্রীবা! গ্রীবাটা স্পষ্টভাবে তনিমার কথা মনে করিয়ে দেয়। কঙ্কাতো নিয়মিত ভ্রু প্ল্যাক করে। ছবিতে কঙ্কার ভ্রু ঘন কালো লোমে ঢাকা। পেছন দিকে থেকে আঁকা ছবি। ছবির নারী বাঁদিক ফিরে ঘার বেঁকিয়ে যেন কঙ্কাকে দেখছে আর অস্পষ্ট ইশারাতে কাছে ডাকছে।

কঙ্কা ঘেমে ওঠে। তার ভ্রুযুগল সন্দেহে কুঞ্চিত হয়। এ'ছবি ঠিক তারই তো! জীবন্ত এই নারীতে সে কখনো তনিমা, কখনো বা সুলেখাকে আবিষ্কার করে। আবার কখনো বা নিজের খোলস্ ছাড়ানো নরম সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে।

হঠাৎ চোখে আঠার মত সেঁটে যায় একটা কালো রোমশ ফোঁটা। জরুল। ঠিক কোমরের নীচে ডান দিক ঘেঁসে। এটা কার জন্ম চিহ্ন! সন্দেহ চেপে বসে কণ্ঠদেশে। ব্যথা লাগে। কান গরম হয়ে ওঠে। উত্তরের দেয়ালে লাগানো ছ' ফুট আয়নাটির কাছে সরে যায় কঙ্কা। দ্রুত হাতে খুলে ফেলে সভ্যতার সব আবরণ। ক্যানভাসের কঙ্কা আর জীবন্ত সে একই সাথে আয়নাতে। ডান নিতম্বের ছবি ভেসে ওঠে। সাদা। হাঁসের পালকের মত। এক ফোঁটা কালো নেই।

নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে শক্ত হয় সে। 'না, বিভাস তুমি আমার বিশ্বাসের মর্যদা রাখনি। এ'ছবি আমার নয়। সুলেখা, তনিমা বা রেখা--অন্য কারোর।' এক বুক নদী দুহাতে চেপে ধেরে ছুটে রাস্তায় নামে সে। বিভাস আছে হাসি মেখে। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। ওপর থেকে মা জিজ্ঞাসা করেন 'কে এসেছিলো রে, খোকা?'

সূত্র সন্ধান

অর্চণা বন্দ্যোপাধ্যায়

মা দেখলে বদরিয়া এল না। তুমি বললে গরীবদের আগে খেতে দিতে হয় ওরা আমাদের কত সেবা করে। ওদের যত্ন করবি, ভালবাসবি। তুমি আবার বলছিলে ওদের বস্তি থেকে আরও ছেলেমেয়ে ডেকে আন্। ভাগ্যিস আমার বন্ধুদেরও আসতে বলেছিলাম। মুন্নী মাকে বোঝাচ্ছিল।

দাঁড়া আলোটা জ্বালি। এবেলা তোর বাড়ির কয়েকজন বন্ধু আসবে। এবেলা কি করছ গো। মুন্নী কাছে এসে দাঁড়ায়। অনিন্দিতা ওর চুলটা একটু নেড়ে দেয়। মাইশোর দোসা, গারলিক চিকেন আর ভেজ পোলাও। ও বেলার রান্নগুলোও তো আছে। শুক্তো, সাদা ভাত, মাখন বিরিয়ানী, খেজুরের চাটনী আর পায়েস।

এবারের জন্মদিনে ওরা বেশী ধূমধাম করল না। শুধু কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। গতবারে মুন্নীর আঠারোর জন্মদিন বেশ ধূমধাম করেই পালন করেছিল ওরা। ওদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, মুন্নীর টিউশনের স্যারোর, ছেলে বন্ধুরা। বেশ হৈ চৈ হয়েছিল।

অনিন্দিতার রান্নাই হবি। নেশাও বটে। কন্টিনেন্টাল, ওরিয়েন্টাল বাদশাহী, মোগলাই, সব রান্নাই ও করতে ভালবাসে। আজকাল মুন্নী আবার চাইনিজ খেতে ভালবাসে না। শুধু মোমো খেতে চায়।

ডোরবেলটা বেজে উঠল। নিশ্চয়ই বৌ, অনিন্দিতা বলে উঠল। মুন্নী দরজা খুলে দিল। কি গো বদরিয়া দুপুরে খেতে এল না কেন। বৌ বলল ওকে জিজ্ঞেস কর। আমি তো বললাম আসতে। ও কিছুতেই এল না। তুমি বকো বৌদি। বেশ করে বকে দাও।

অনিন্দিতা বলল, কিরে আসলি না কেন? কত রান্না করলাম। বদরিয়া চুপ করে রইল। মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কথা বলছে না। অনিন্দিতার একটু টানই আছে ছেলেটার উপর। যাই হোক ফাইফরমাশ খাটে। মায়ের সঙ্গে এটা ওটা কাজও করে দেয়। অনিন্দিতাও ওকে এটা ওটা দেয়। একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করে। ওরা গরীবের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। মুন্নীটার মনেও বেশ দয়ামায়া হয়েছে। ওদেরই মেয়ে তো। নিজেদের ভালমন্দ খাবার দাবারের ভাগ দিতেও কোন কার্পন্য নেই।

বৌ-এর বিকেলের কাজ সারা হল। এবার বাড়ি যাবে। ফিরে রাতে আসবে তো। মুন্নী বলল, সামনের বস্তিতেই থাকে। রাতে মাঝে মাঝে আসে। টিভি দেখে। আজকে ও এখানে খেতে আসবে। না; বদরিয়া মাথা নিচু করেই উত্তর দিল। অনিন্দিতা বলল, কেন রে—আসবি না কেন? খেতে বলেছি না। বদরিয়া চুপ করে আছে। অনিন্দিতা আবার বলল, কিরে আসবি না কেন।

এবার বোমাটা ফাটাল ছেলেটা। বদরিয়া বলল, আসব না। তোমাদের বাড়িতে খাব না। তুমি বাজে রান্না কর। মুন্নীর মুখ চুপসে গেছে। বলল, কে ভাল রান্না করে রে? আমার মা। বদরিয়ার সোজা উত্তর। অনিন্দিতা এবার বৌকে বলল, কি রান্না কর গো তুমি। কি খেতে ও ভালবাসে। বদরিয়াই উত্তর দিল। আলুর চোখা আর রুটি।

আমরা বসে আছি

গৌর বৈরাগী

এই বাড়িটার নাম আমাদের বাড়ি। রাংচিতে অর ঢোলকলমির বেড়ার মাঝখানে যে টিনের গেট। তাতে চকখড়ি দিয়ে লেখা 'আমাদের বাড়ি'।

আমাদের বাড়িতে পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল। ওপরে টালির চাল। ছোট ছোট জানলা। ঘরে ক্যালেন্ডারে দুগ্গা ঠাকুরের ছবি। সামনে উঠোন। উঠোনে যে জামরুল গাছ, তার নীচে বসে আছে তারাপদ। সামনে পোষা ছাগল। তার বাঁ হাতে জামরুল তুলে দিচ্ছে। ডান হাতে ব্যান্ডেজ। দুটো থান ইঁট হাতে পড়ে গেল কাল।

রাজমিস্ত্রির লেবারের কাজ। অভ্যাস নেই। কিন্তু উপায়ও তো নেই। হুকুমচাঁদ বন্ধ। চিমনির আগায় বেশ নধর একটা অশ্বত্থ গাছ বেড়ে উঠছে। ক্রমশ বাড়ছে। আর তারাপদ জামরুল গাছের ছায়ায় বসে আছে। তবু ঘাম হচ্ছে বেশ।

ঘাম হচ্ছে নমিতারও। নমিতা বসে আছে। ছোট জানলার ধারে চৌকি। যে চৌকির ওপর ছেঁড়া কাঁথা, মাদুর আর হাওয়া নেই। কাল হাসপাতাল থেকে ছুটি দিল নমিতাকে। পেটে ঘা। ঘা' টা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। একটা থেরাপি আড়াই হাজার। শুধু যন্ত্রণাটা কমিয়ে হাসপাতাল ছুটি করে দিল। বাড়িতে বসিয়ে রাখুন পেসেন্টকে।

নমিতা বসে আছে। জামরুল গাছের পাতা নড়ছে হাওয়ায়। দুটো শালিখ ঝগড়া করছে ডালে। সাইকেলে দুধের ক্যান চাপিয়ে মদন ঘোষ চলে গেল। পথ্যতে এক'পো করে যদি দুধ থাকতে। ভাতের গন্ধ নাকে টানল নমিতা। মেয়েটা ভাত চাপিয়েছে।

রোয়াকের ঘেরায় উনুনে ভাত ফুটছে। একমাস বাদে মা আজ ভাত খাবে। শিপ্রা বসে আছে। পুরনো বাড়িতে হাঁটুতে থুতনি রেখে তাকিয়ে আছে। শিপ্রা মাধমিকে থার্ড ডিভিশন। মা শয্যায়। সে রান্নাঘরে গিয়ে হাঁপ ছেড়েছে। রান্নাটা ভালোই পারে শিপ্রা। কলকাতায় রাঁধুনির কাজের কথাবার্তা হচ্ছে। এখন কি সে কথাই বসে ভাবছে সে। বেড়ালটাও বসে আছে পাশে। সাদার ওপর খয়েরি ছিটে। বেশ রোগা, হয়ত বুড়ি হয়ে গেছে। বসে বসে তাকিয়ে আছে রান্নাঘরের দিকে। ভাতটা কি নামবে এবার।

বি এ পাশ করে বসে আছে বিমলও। রোয়কের একধারে পা ঝুলিয়ে বিমল বসে। এসময় বসে থাকার কথা নয়। মধু ঘোষ ছাড়িয়ে দিল কাল। পরীক্ষার নম্বর কমে গেছে ছেলেমেয়ের। বলল এবার ইস্কুলের মাস্টারের কাছে দোব বলে ভাবছি বিমল। বিমল বলল, আজ্ঞে তাই দেবেন। বারোশো টাকা থেকে দুশো কমে গেল। আটটা থেকে দশটা দু'ঘন্টা সময় বাড়তি হয়ে গেল।

বাকি থাকল আমাদের বাড়ির আমি। আমি বসে আছি ঘরে। চৌকিতে মা। রোয়াকে দাদা আর দিদি বসে আছে। দিদির পাশে বসে আছে বেড়াল। বাবা বসে আছে জামরুল তলায়।

বসে বসে আমি ভাবছি। এবার আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দোব। কিন্তু প্রথম হওয়া মাধ্যমিকে ইতি বৈদ্য তো একজনই হয়। একবারই হয়। আমাদের বসে থাকার কথা কখনও কি ছাপা হবে কাগজে।

রূপেন সংস্থিতা

তপনকুমার দাস

বাপীর সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেছে-তাই না?

বুবানের প্রশ্নে সারা শরীর হিম হয়ে যায় রমলার। দু'হাতের মুদ্রায় ভেঙে পড়া খোপা গুছানো ভুলে অবশ শরীর থেকে ছিটকে আসে পাল্টা প্রশ্ন - তুই এখনো ঘুমোস নি?

উত্তর দেয় না বুবান। নরম নীল আলো ছড়ানো ঘরের বুকে কঠিন দুই গোল চোখে ছেলের মুখে কি যেন খুঁজি বেড়ায় রমলা। এতো খবল রাখে ছেলেটা? সাতদিন হিমাংশুর সঙ্গে আদাকাঁচকলার সম্পর্ক চোখ এড়ায়নি পাঁচ বছরের শিশুর? ছিঃ ছিঃ। অকারণ বাড়াবাড়ি। সন্দেহের বরফ এতটা না জমানেই ভালো হতো। ইয়ং হ্যান্ডসাম্ রিপোর্টার। কাজের সুবাদে লেডি ফটোগ্রাফার নিয়ে দাঙ্গা কভার করতে গেছিলো –

মা, বাপী তোমাকে খুব ভালবাসে – তাই না?

ডেপোমি না করে ঘুমোও। রাত একটা বাজে। সকালে স্কুলে আছে। ছেলেকে ধমকালেও মন হাতড়ে বুঝে নেয় দোষটা আসলে হিমাংশুর। বীথির হাজব্যান্ড সঙ্গে ছিলো-বলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যেতো। তা না-এক হোটেলে ছিলাম, এক ঘরে ছিলাম ইনিয়ে বিনিয়ে আস্ত উপন্যাস বানালে কার না রাগ হয়।

আমি কিন্তু সব দেখেছি।

কী? কী দেখেছিস? ছেলেটা যেন সপাটে বিদ্যুতের চাবুক মারে রমলার পিঠে।

তুমি কাঁদছো আর বাপী তোমাকে আদর করছে। কাজল আর শাহরুখ খানের মতো।

আহ! বুবান; সারাদিন টিভি দেখে দেখে যত্তো সব উল্টো পাল্টা স্বপ্ন দেখা। মুখে টানটান ধমক বজায় রাখলেও শরীরে মনে বরফের মতো জমাট হয়ে যায় রমলা ও ঘরের দরজা তো বন্ধ ছিলো। কপাটে চৌকাঠে ব্যবধান ছিলো কি? এখন যেমন আছে।

স্বপ্ন না, সত্যি বলছি। দেখলাম ....

বুবান! ধমকের সুর সপ্তমে ওঠে রমলার। সেই সুরের তোড়ে উড়িয়ে হারিয়ে দিতে চায় বুবানের দেখে ফেলা সত্যি মিথ্যে যা কিছু। আদর ভালবাসার এই সম্পর্ক আদিম হলেও অন্ধকারের।

তুমি আর বাপী ওটা কি খেলা করছিলে মা?

অসহ্য! পাশ ফিরে চুলের মুঠি চেপে দুমদাম হাত চালিয়ে দেয় বুবানের পিঠে। গলা চড়িয়ে চিৎকার করে রাত ফাটায় বুবান।

কী হলো? রাতদুপুরে ছেলেটাকে অমন গরু পেটান পেটাচ্ছ কেন? ভেজানো দরজার ওপার থেকে জানতে চায় হিমাংশু।

পুজো করবো? অসভ্য ইতর ছেলে। গজগজ করতে করতে ঘরের ছোট নীল আলোটাও নিভিয়ে দেয় রমলা। অন্ধকারে বুবানের প্রশ্ন ভোলার চেষ্টা করে। হিমাংশুর একটু আগের স্ত্রী রমলা বুবানের পাশে মা রমলা হয়ে শুয়ে থাকে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুধু গুমরে গুমরে ছড়িয়ে পড়ে বুবানের টাপসি খাওয়া কান্নার রেশ।

পালক

কালিদাস ভদ্র

ভুবনকাকার নৌকা বাঁধা ঘাটে। বিদ্যাধরীর জোয়ার হচ্ছে। তির তির জলের ওড়িশি ন্ত্যে যেন নৌকাটা নাচছে। নৌকার পাটাতনের উপর মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে রেজাউল। আকাশে চোখ। দূরে গাছগুলো রঙে চুর হয়ে থাকা তুলির মতো অস্ত সূর্যের রঙে চুর।

নিঃশব্দে নৌকায় ওঠে দময়ন্তী। খোঁপায় গোঁজা পাখির পালকটা তুলে রেজাউলের পায়ে, আঙুলের ফাঁকে আলতো বুলিয়ে দেয়। ধড়ফড় করে উঠে বসে রেজাউল। দিন আর রাতের সন্ধিক্ষণে। আলো আঁধারি গোল্লাছুট খেলায় প্রকৃতি যেন তন্ময়। গোধুলি-পায়ে শীতের শিশির নূপুর বাজছে। মুখোমুখি বসে দু'জনে। দময়ন্তীর নিবির চোখে রেজাউলের চোখ। রেজাউলের মনে হল এই প্রথম ওদের শরীর জেগে উঠেছে। বাঙময় শরীর টানছে পরস্পরকে। ঠোঁটে জাগছে মৌমাছির পাখার কাঁপন।

নীরবতা কাটিয়ে রেজাউল দময়ন্তীর মোমের মতো হাতের আঙুল টেনে নিল কাছে। দু আঙুলে তখনও ধরা একটা পালক।

— পালক! কোথায় পেলে?

— নদীর চরে।

— কি পাখির?

— মাছ রাঙার।

— বাঃ ভারি নরম, সুন্দর তাই না!

নামনো গলায় বলল রেজাউল।

— পাখিরা ভারি নরম, তাই পালক এত সুন্দর।

আবেগ জড়ানো গলায় শব্দ আচড় টানল দময়ন্তী।

— মাছরাঙা শিকারী পাখি। পেট ভরলেই উড়ে গিয়ে বসে গাছে। রঙের বৈভব ছড়িয়ে দয়ে দিগন্তে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মিষ্টি সে রঙ। আমরা চেষ্টা করেও সে জীবন পাবো না।

বেহালার তারে ছড়টানা বেহাগ-কথা ফুটল যেন রেজাউলের ঠোঁটে। নৌকোর পাটাতনে সহসা পায়ের শব্দ ফুটল। আলো আঁধারি ছায়া মাখা সুদর্শন যুবক নিরঞ্জনের। নিরঞ্জন গায়েন। ভুবন কাকার নৌকো বায়। মনের আনন্দে গান গায়। লোকসংগীতের সুর তার কণ্ঠে ঝরে ঝর্নার মতো। নিরঞ্জনদের জমি জায়গা নেহাত কম ছিলো না। ইটভাটার মানিকের কাছে অর্থের প্রলোভনে ভাইরা সে সব বেচে দিয়ে কৃষক থেকে শ্রমিক হয়ে গেল রাতারাতি। নিরঞ্জন শুধু ভবঘুরে গায়েন মাঝি। হাঁক দিল নিরঞ্জন

— রেজাউল নাকি?

— হ্যাঁ নিরঞ্জনদা, খবর আছে কিছু?

কাছে এগিয়ে আসতেই দময়ন্তীকে দেখে চমকে উঠল নিরঞ্জন। রেজাউল-দময়ন্তীর

যুগল মূর্তি দেখে বুকের ভেতর ছ্যাঁক ক'রে উঠল। মকবুলের মুখটা ভেসে উঠল নিরঞ্জনের মনের পর্দায়। টানটান উত্তেজনায় গা ঝাড়া দিয়ে নিরঞ্জন বলল,

— রেজাউল ভাই এখনই তুমি এ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাও।

— কেন?

মকবুল মিঞা তোমারে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।

— কি যা তা বলছো তুমি নিরঞ্জনদা? আমারে মারবে কেন....

— কেন? তুমি হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছো, মকবুল মিঞার সহ্য হচ্ছে না। মকবুল মিঞা বলেছে তোমার জন্যে ইসলাম বিপন্ন। তাই ওরা তোমারে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে.....

— দূর, কি যে বল নিরঞ্জনদা এটা পীর গোরাচাঁদের দেশ। এখানে আমরা হিন্দু-মুসলমান কতকাল একসঙ্গে আছি, কোনদিন দাঙ্গা হয়েছে?

— সে হোক না হোক, আজই তুমি এখান থেকে গা ঢাকা দাও। আমি নিজে কানে শুনে এসেছি বটতলায় বসে মিঞা ফন্দি আঁটছে। তুমি জান ব্যাটা মকবুল কী ধরনের মানুষ!

নিরঞ্জনের কথা শেষ হওয়ার আগেই দূর থেকে ছুটে আসা আলোক বিন্দুগুলো মুহূর্তে সহস্র সূর্যের মতো প্রকান্ড হয়ে উঠলো। গনগনে মশালে দেখা গেল মকবুল মিঞার ঝকঝকে দাঁত। হিঃ হিঃ হাসির শব্দে মকবুল বাহিনীর আট দশজন ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকোর 'পরে।

মকবুল চেঁচাচ্ছে,

— শালারে আগুনে পোড়ায় মার।

রেজাউলের গায়ে লেপ্টে থাকা দময়ন্তী হতভম্ব। রেজাউলের মনে হল বাঁধা দেবার সুযোগ নেই, একমাত্র বিদ্যাধারী পরিত্রাতা। দ্রুত দময়ন্তীরর হাতটা শক্ত করে ধরে ঝাঁপ দিল জলে। হিংস্র জন্তুর মতো ফুঁসে উঠল মকবুল মিঞা।

— শালা তোর জন্যে ইজ্জত বাঁচল না। বেজাত বাউল তোর ক্ষমা নেই। চল তোরেই আজ....

নিরঞ্জন অবশ্য মকবুলকে কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল রেজাউল, দময়ন্তীকে নিয়ে জল সাঁতরে বহুদূরে চলে গেছে। বিদ্যাধরীর নিস্তরঙ্গ চলে সেই পালকটা তখন শুধু ভাসছে। খুশিতে নিরঞ্জন চোখ বুঁজতে গিয়ে টের পেল মকবুলের গা থেকে একটা হিংস্র গন্ধ উড়ছে।

দশ নম্বর মাষ্টার মশাই

পুন্ডরীক চক্রবর্তী

কালো চুলের বেনী দুলিয়ে ব্রেডের মতো ধারালো দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখছে জয়া। আজ থেকে আমি ওর মাষ্টার মশাই। ও আমার ছাত্রী।

আমি ওকে ভালো করে দেখি। ফুটি ফুটি ক'রে ফুল হয়ে এখনও ফোটেনি। বয়েসে 'ও' কিশোরী। তবে নারী চিহ্নগুলি ওর এখনই বড় তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট।

ক্লাস সেভেনে পড়ে 'ও'। যথেষ্ট সাহস আছে মেয়েটার। আমাকে চমকে দিয়ে ঠোঁটের ওপর মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বলল, আপনি আমার দশ নম্বর মাষ্টারমশাই।

কৌতুহলে সঙ্গে জানতে চাইলাম, তার মানে?

জয়া শান্ত গলায় বলল, আপনার আগে ন'জন মাষ্টারমশাই গেছেন। কেউ দু'মাস, কেউ তিন মাস, আবার কেউ পাঁচমাস। ছ'-মাস কারো কাটেনি।

আমি' তো আকাশ থেকে পড়লাম। মেয়েটা বলে কী! চোখ কপালে তুলে জানতে চাইলাম, কেন?

পানপাতা মুখ, টিয়াপাখি নাক নেড়ে 'ও' বলল, 'বলব না। ক'দিন গেলে আপনি তা বুঝবেন।'

ক'দিন যেতে দু'টো জিনিস উপলব্ধি করলাম। বাইরে থেকে জয়া'র বাবাকে ভদ্রলোক ব'লে মনে হ'লেও আসলে লোকটা মোটেই ভালো নয়। বলতে গেলে বাজারময় ধার-দেনা। ধার শোধ করে না। অথচ ভালো চাকরি করে। বাবুয়ানা'ও আছে পুরোদস্তুর।

বন্ধু-বান্ধবদের মুখে আরও শুনলাম জয়ার মা ছাড়া অন্য একটা মেয়ে মানুষকে নাকি পোষে। সেখানে টাকা-পয়সা সব ঢালে। জয়া'ও হয়তো এসব জানে। তাই বাবার প্রতি ওর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। বরং ঘৃণা জমে আছে বুকের ভেতরে। অনুভব করলাম, জয়ার একান্ত স্বপ্ন-দুঃখ গুলো আমার সান্নিধ্য চায়। যেন আমার সম্মতিটুকুর অপেক্ষায়। একে চারমাসের মাইনে দেয়নি ওর বাবা। তার ওপর জয়া ঝুঁকে আছে আমার দিকে। এরপরে এবাড়িতে ঢোকা আমার ঠিক হবে না। মনে মনে স্থির করলাম, কাল থেকে আর জয়াকে পড়াব না। বেল কুঁড়ির মতো নরম মেয়েটাকে নতুন ক'রে আরে কোন বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না।

সাবেরা

তপনকান্তি মন্ডল

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সাদা রঙের বাসটা। আমরা যাব দূরের কোন গ্রামে। দেখলাম হলঘরে কেউ নেই। শেষের যাত্রী আমি। দৌড় দিলাম গেটের দিকে। কাছাকাছি আসতেই হুস করে গাড়ী ছেড়ে দিল। বিকালের আকাশে ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ মায়া।

গতকাল দিল্লী থেকে এসেছি এখানে। উঠেছি চাক্‌সা পাহাড় টিলার অতিথি নিবাসে। দূরে মনসা মাতার মন্দির। সামনে নীচে কালো পিচ-ঢালা প্রশস্ত রাস্তা। এগিয়ে ঘেছে গ্রাম থেকে শহরের দিকে। মোড়ে দোকানপাট, পসরা সাজিয়ে বসেছে মেয়েরাও। দেহাতি মানুষের জটলা। উটের বাহনে যাচ্ছে আনাজপাতি, নানা মালামাল – এমনকি মানুষও। আমি একা – 'যন্ত্রণা ভারাক্রান্ত একাকীত্বের গভীরে মগ্ন। মুহূর্তে বিলীন ক'দিনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস! একজনও কি ছিল না আমাকে খেয়াল করার মত! নানা রাজ্য থেকে যদিও আমার এসেছি , তবু তো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে অনেকের সঙ্গেই। মনে মনে অভিমানের তীব্র তীর ছুঁড়ে দিচ্ছি এক একজনের উদ্দেশ্যে।

দিনের আলো নিভে গেছে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে সমগ্র পাহাড় টিলা। গতকালও এমনি রাতে মেয়েরা চলে গেল যে যার ঘরে। ডর্মিটরিতে আশ্রয় নিল আর সকলে। আমার জন্য বরাদ্দ হল একটি স্বতন্ত্র ঘর। আহার শেষে সবাই এল মজলিশে। তবু একান্তে একজন বিদায় নিয়েছিল 'শুভরাত্রি' জানিয়ে। আজ কি তবে সেও ভুলে গেছে? ভাবছি আকাশ-পাতাল। রাত বাড়ছে। খাবার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যের কাছে আশ্রয় পেতে ব্যাকুল উদাসী হৃদয়।

দরজায় টোকা পড়ল। কিছুক্ষণ পর আবার। সহসা ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে এল একজন। এক নিঃশ্বাসে বলে চলল, 'মিত্রজী, সারাবেলা কোথায় ছিলেন? দুপরে কত খুঁজলাম। আজ আমার কিছুই ভাল লাগেনি!'

এতক্ষণ দূরপানে ছিল যে প্রকৃতি, সে কি হঠাৎ এল এই চার দেওয়ালের মাঝে? আবার উথাল-পাথাল ছিন্ন হৃদয়ে নানা রঙের দোলা। তার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া! তবু তার দৃষ্টিতে ফিরে পেলাম সৌম্য-শান্ত পরমা রূপ।

ধীরে ধীরে কাছে টেনে নিলাম সাবেরাকে।

ডাক

অশোককুমার সেনগুপ্ত

মানুষ যদি জানতে পারে তার জীবন সীমার দৈর্ঘ্য কতোটুকু তাহলে ঠিকঠাক পরিকল্পনা নিতে পারে। দুলালবাবু অবসর নেওয়ার পর এই মাপটা নেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার হাতে কোন ফিতে নেই। থাকলে তার মৃত্যুর তারিখ এবং সময়টা দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। মোটামুটি সফল সংসারী তিনি। ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এরা ভালই আছেন। তিনি পেনশন পান, মারা গেলে স্ত্রীও পাবেন। সারা দেশ যখন অর্থনৈতিক দুর্ভাবনায় পীড়িত তখন এই ব্যাপারটায় তিনি ভাগ্যবান আর ওই যে বৃদ্ধের গল্প আছে যে নাকি কাঠের বোঝার ভার বহন করতে না পেরে মৃত্যুকে আবাহন করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু এসে হাজির হলে বলেছিল, নারে বাবা মরতে চাই না। কাঠের বোঝাটা একটু তুলে দাও! না দুলালবাবু তা করবেন না। মৃত্যু এলে চলে যাবেন হাত ধরে। প্রাক যৌবনে ফ্রকপরা প্রেমিকা শ্যামলীর মতো মনে হবে মৃত্যুর হাত।

সেদিন রাত বারোটা নাগাদ মৃত্যুদূত এসে হাজির। বলল, আমি মৃত্যুদূত। চলুন।

— আরে বসুন। বসুন। জানান দিয়ে আসতে হয়। আমার কিছু প্রশ্ন ছিল।

— মনে হচ্ছে যেতে আপনার আপত্তি আছে।

— না। না।

শুনুন উত্তর দেবার আমার ক্ষমতা নেই। আমি দূত। মৃত্যুও উত্তর দিতে পারবেন না। তিনি অন্ধ, বধির, অনুভূতিহীন। আর নিজের বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে আত্মসুখে জীবন কাটালেন -- কোন মঙ্গল কর্ম, অপরের জন্য চিন্তা নেই। নিজের ঘর আর ঘর করলে।

ঠিক আছে মেনে নিলাম ভাই অনেক ভুল করেছি। গোড়া থেকে একটু সংশোধন করে নিতে চাই। ভাববেন না ওই কাঠ বওয়া বুড়োর মতো আমি কাঠের বোঝা তুলে দিতে বলবো। কিন্তু আপনি বলতে বলতে আমাকে তুমি বলছেন কেন!

মৃত্যুদূত বলল, তুমি কিরে! তুই বলবো। শোন ওই বুড়োর কথা জানি। ও তো শুধু কাঠের বোঝা তুলতে বলেছিল তোদের অনেক বায়নাক্কা। শিক্ষিত স্বার্থান্ধ আধা-খাচরা মানুষ না জানোয়ার। তোদের নিয়ে বড্ড ঝামেলা। চল ব্যাটা চল!

কী লিখেছিল

সিদ্ধার্থ সিংহ

এই...এই... ক'রে উঠতে না উঠতেই বাসটা হুস করে বেরিয়ে গেল। জানলায় সে-ই কাকলি। পাশের বাড়ি থাকত। একই স্কুলে পড়ত। কখনও খাতার পাতা ছিঁড়ে নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিত কেনও পুকুরে। কথনও লুকিয়ে আনা আচার ও সৌম্যের দিকে এগিয়ে দিত। কখনও কাকলিকে ও ধরে এনে দিত সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি। দিনের মধ্যে দশবার এ ওর বাড়ি যেত।

সেবার চোদ্দোমাদলের মেলা সাত দিনের। আশপাশের গ্রামে ভেঙে পড়ল। ওরাও গেল। হঠাৎ কী বৃষ্টি। যে যেদিকে পারল ছুটল। ওরা দাঁড়াল একটা গাছের তলায়। দু'জনেই ভিজে একশা। ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। আচমকা কাকলিকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে ফেলল সৌম্য।

পরদিন স্কুলে এল না কাকলি। মিনতি এসে একটা চিরকুট দিল-- 'সৌম্যদা, এটা কাকলিদি দিয়েছে।'

কী লিখেছে ও ! তর সইছিল না সৌম্যের। চুপি চুপি ভাঙা-মন্দিরে ঢুকে পড়তে যেতেই দেখে, বড়রা আসছে। যদি দেখে ফেলে। দেয়ালের একটা খাঁজে লুকিয়ে ফেলল চিঠিটা।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখে কত লোক, রাজমিস্ত্রি। ওই দেয়ালটা সিমেন্ট বালিতে প্লাস্টার হয়ে গেছে।

কী লিখেছে ও ! ওদের বাড়ি গিয়ে শোনে ও চলে গেছে মামার বাড়ি। কিছুদিন পর ওর বাবা-মাও চলে গিয়েছিল।

সেই দুর্গাপুরেই চাকরিসূত্রে কতদিন হয়ে গেল সৌম্যর। ভেবেছিল, ওর সঙ্গে দেখা হ'লে জানতে চাইবে, কী লিখেছিল।

কী লিখেছিল ও !

পকেটমার

তাপস মুখোপাধ্যায়

এসপ্লানেডে বাস থেকে নেমেই হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। ন'টা বেজে পাঁচ। ইস্ দেরী হয়ে গেল আজ। কার্জন পার্কের ভিতর দিয়ে কোনাকুনি সর্টকাট করার জন্য পা চালালাম।

প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরী। একটু দেরী হলেই হাজার কথার জবাবদিহি। স্টেটসম্যান অফিসের ঠিক পিছনেই আমার অফিস। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও আরও মিনিট পাঁচেক লাগবে অফিসে পৌছতে। একটু অন্যমনস্কই ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ধর্-ধর্ সোরগোল শুনেই থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম একটু দূরেই মেট্রো স্টেশনের ঠিক গা ঘেঁসেই বেশ জটলা। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ ধরা পড়েছে। পকেটমার জ্বালায় আজকাল যাতায়াত করাই দায় হয়ে পড়েছে ভীড়ের মধ্যে কেউ কারও উদ্দেশ্যে কথাটা বলল। আমি উঁকি মেরে দেখার চষ্টো করলাম। দেখলাম একটা ষোল-সতের বছরের ছেলে চাদর মুড়ি দিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সারা গা চাঁদর দিয়ে ঢাকা থাকলে মুখটা বাইরে বেরিয়ে। লোকজন ছেলেটিকে সমানে চড়, লাথি, ঘুষি মেরে চলেছে। আর ছেলেটি নিঃশব্দে মার হজম করে যাচ্ছে।

— বল শালা, মানি ব্যাগটা কোথায় রেখেছিস? উত্তেজিত জনতার একজন বলার সাথে সাথে হাত চালাল।

— কত টাকা ছিল দাদা? জনৈক দর্শক প্রশ্ন করলেন।

— প্রায় চারশর মতন। আজই একজনের কাছে ধার নিয়েছিলাম ওষুধ কিনব বলে।

যার মানিব্যাগটা চুরি হয়েছে তিনিই বোধহয় উত্তর দিলেন।

— এত ভালভাবে বললে হবে না। ওদের গন্ডারের চামড়া। তাছাড়া দেখছেন না চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কোন কিছুই হচ্ছে না ওতে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগলাম।

দেরী যখন হয়েছে তখন আর একটু দেরী না হয় হোক না আজকে। দেখিই না ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

— মাল কী আর ব্যাটা রেখেছে। পাচার করে দিয়েছে হাত সাফাই করার সাথে সাথেই।

— হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ওরা তো একা থাকেনা দু'তিনজন থাকে শুনেছি।

ছেলেটির উপর মারধোরের গতি ততক্ষণে একটু বেড়েছে। একজন ষন্ডামার্কা লো- সমানে পিটাচ্ছে ছেলেটাকে। কয়েকজন মিলে এবার চাদরটাকে খুলে নেবার চেষ্টা করল।

আমিও ভীড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে একটু সামনে এগিয়ে গেছি। কিন্তু একী! টানাটানি- চোটে ছেলেটির শরীর থেকে ময়লা চাদরটা উঠে চলে আসতেই আমার যারা দাঁড়িয়েছিলা- তারা বিস্ফারিত চোখে দেখলাম — ছেলেটির দুটো হাতই কাটা।

নদী ও সমুদ্র

শিবতোষ ঘোষ

সমুদ্রের পাশে দাঁড়ালে যে যত বড় মানুষ হোন, বড় ছোট হয়ে যায়। বড় মানুষ মানে কত বড়, সমুদ্রের চেয়ে তো বড় নন, স্থায়ী মানুষ, কত স্থায়ী, সমুদ্রের চেয়ে তো স্থায়ী নন। এখানে হিসেব হয় হাজার-হাজার, লাখ-লাখ, কোটি-কোটি দিয়ে, আমাদের পঞ্চাশ-একশো, আমরা এত তুচ্ছ যে, এক সেকেন্ডও কাউন্ট করি।

আর নদীর পাশে দাঁড়ালে ... নদী আমার মায়ের মতো, তার গায়ে লেপটে তাকে আলুথালু করে...কীই-না করেছি, এত বড়-বড় বন্যা গেছে, কত তুলকালাম কিন্তু কখনও মরু পর্যন্ত বলেনি আমাকে।

সমুদ্র ভারতবর্ষের মুনি-ঋষির মতো, কোথায় ফুলামের বউকে কে তুলে নিয়ে গেছে, কোথায় ইলেকশনে কারচুপি হয়েছে না কী হল, আমাদের এসব কোনও ব্যাপার বা বিষয়ে তার কোনও উৎসাহ নেই, এমনকী চাঁদও যে খেলে সেও তার কাছে একটা গোল-পাকানো লাল ঘুনসির মতো। জীবন-মৃত্যু, ছেলের চাকরি, অভাব-সংসার, রাতে কার ঘুম হচ্ছে না, ডায়াবেটিস, পরিবেশ দূষণ...সুমদ্র জানেই না, নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। কাউকে সে পরশও করে না, পরোয়াও করে না।

নদী কিন্তু ভিন্ন। সমুদ্র আত্মভোলা।

নদী সংসারী, তার পাড় আছে, পাড়ের সঙ্গে দু'বেলা প্রিয়জনের দেখা-সাক্ষাতের মতো দেখা-সাক্ষাৎ আছে। কত মধুর হাসি হাসতে জানে নদী, নদী ছেলের জ্বর হলে মায়ের হাত বোলানোর মতো। আমি নদীকে বুঝতে পারি, সমুদ্রকে বুঝতে পারি না।

আমার বাড়ি থেকে দীঘা ৮০ মাইল। আমার যেদিনই মন খারাপ লাগত সেদিনই দীঘা পালিয়ে যেতাম, একা চুপচাপ বসে থাকতাম সমুদ্রের ধারে। নিজেকে ভালবাসতে গেলে নদী, নিজেকে বুঝতে গেলে সমুদ্র।

সংকোচন
পার্থসারথি মিত্র

রিনরিন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

সরমা দেবী রিসিভার তুলে বললেন, 'হ্যাঁলো।'

''মা আমি শুভ বলছি, তোমরা কেমন আছো।'

সরমা দেবী, স্বদেশ বাবুর একমাত্র সন্তান শুভব্রত, আমেরিকার বোষ্টনে বড় কোম্পানীর একজিকিউটিভ। স্বদেশী স্বদেশবাবু, পরবর্তী কালে একটি নামী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সততার সাথে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে গেছেন। শিক্ষকতায় সুনাম অর্জন করেছেন, নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুভব্রতকে সরস্বতীর বরপুত্র করেই গড়ে তুলেছিনে। আর্থিক মলিনতায় শুভব্রতর পড়াশোনার ক্ষতি হতে দেননি। ব্যক্তিগতভাবে বাড়ীতে অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট টিউশানী করেন নি। দারিদ্রের মধ্যেই শুভব্রত বড় হয়েছে। তাই জীবনে যখন বড়ো হয়ে আমেরিকা যাবার সুযোগ পেল, দুহাতে গ্রহণ করল। শুভব্রত দারিদ্রকে ঘৃণাই করেছে মনে মনে। আমেরিকা যাওয়া নিয়েই শুভব্রতর সাথে মতবিরোধ। তবু স্বদেশবাবু নিজের মতকে চাপিয়ে দেন নি। সরঞ্চ নিজের জমানো অর্থ পুত্রের বিদেশ যাত্রার জন্যই ব্যয় করেছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে এত ভাবনা সরমা দেবীর মধ্যে ভেসে উঠল। কারণ স্বদেশবাবুর শরীরটা ভালো না। চিন্তিত মুখেই সরমা দেবী জানালেন, '' তোর বাবার শরীরটা ভালো না কয়েকদিন ধরেই প্রেসারটা খুব হাই। তুই কয়েকদিন এসে ঘুরে যা না।''

'' না মা এই মুহূর্ত্তে একটা বিজনেস ড্রিল করছি, সেটা শেষ করলে আমার একটা প্রোমোশন হবে, এই কাজটার জন্য অবশ্য একবার ইন্ডিয়া যেতে হবে। কিছু মনে কোরো না মা। আমি কেয়ার নার্সিং হোমের ডাক্তার রাহুল মুখার্জ্জীকে ফোন করে দিচ্ছি, তুমি চেনো রাহুলকে , আমার বন্ধু, স্কুলেও বাবার ছাত্র ছিল। ওর নার্সিংহোমেই নিয়ে যাও। ঠিক আছে রাখছি মা, শুভরাত্রি।''

স্বদেশবাবুর সেই রাত্রেই সেরিব্রাল এ্যাটাক। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় বারবার তিনি শুভর নামই করেছেন, শুভ পৃথিবীতে অর্থই সব নয়, চাহিদাকে তুমি যত বাড়াবে, ততই বাড়বে। শুভ মানুষ হও, শান্তি পাবে।

মার সাথে শুভর প্রত্যেকদিনই টেলিফোনে কথা হয়েছে। পাঁচ দিনের দিন স্বদেশবাবু বিদায় নিলেন। মাঝরাত্রিতে বাবার মৃত্যুসংবাদ শুভব্রতর কাছে পৌঁছল ডাক্তার রাহুল মুখার্জ্জীর মাধ্যমে। তাকেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে, মৃতদেহ পিস হেভেনে রাখতে বলে, শুভ জানালো সে কলকাতায় যাচ্ছে।

স্বদেশবাবুর ছোট বাড়ীটায়, তাঁর মৃতদেহ ঘিরে ভীড়, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন তাঁর ছাত্র ছাত্রীরা। শুভ এসেছে। এত লোকজনের মাঝে, শুভ এক ফাঁকে বলে উঠল, 'মা দেখেছো, ঠিক সময়ে চলে এসেছি। আসলে কি জানো, পৃথিবীটা এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে।''

অশ্রুভরা অস্ফুট কণ্ঠে সরমা দেবী বলে উঠলেন, ''হ্যাঁ, সত্যিই পৃথিবীটা বড়ো ছোট হয়ে গেছে, এবং পৃথিবীর এই প্রজন্মের বাসিন্দারাও বোধহয়।''

বহ্নিশিখা

রাজ কুমার বেরা

আমেদাবাদের সেই অখ্যাত গ্রামটা গতরাত থেকে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

'না রায়ে তক্‌দির-আল্লাহু আকবর........

না রায়ে তক্‌দির-আল্লাহু আকবর.......

পাশের গ্রামেও একই আগুন।

'জয় শিয়া রাম'

'জয় শিয়া রাম'

এই গ্রামে তথাগত আর ওই গ্রামে মুনাবর। ক'দিন হল ওদের কোন খোঁজ নেই। কলেজে পড়ার সময় থেকেই অভিন্ন-হৃদয়। র‍্যাশনালিস্ট। সমাজ সচেতক। বিয়েও করেছে কাছাকাছি সময়ে।

বাড়ি ফিরে গ্রামের চাপা উত্তেজনা আর থমথমে পরিবেশ কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি।

গেরুয়া উড়নি আর সবুজ আল খাল্লায় মোড়া শরীরগুলো খুঁজে ফিরছে ওদের।

শালা-বেজন্মার বাচ্চা .....

হারামি.....

দাউ দাউ আগুনের মাঝে প্রসব যন্ত্রনার গোঙানি। হাসপাতাল চার মাইল দূরে। বাইরে বেরুলেই আরও কয়েকটা লাশ....। দুই প্রৌঢ়ের কপালে ভাঁজ পড়ে।

রাতের আঁধার আড়াল করে দুই মহিলাকে আনা হল হাসপাতালে। চারিদিকে দাঙ্গা বিধ্বস্ত করুন মুখ। গোঙানি আর যন্ত্রণার মুখর আর্তি।

ট্যাঁ........ট্যাঁ.......ট্যাঁ.........

স্থানাভাবে একই শয্যা থেকে দুই নবজাতক সোচ্চারে তাদের পরিচয় জানালো। পান করলো দুই বৃন্তের একই নির্যাস।

হাসপাতালের করিডোরে আগুনে ঝলসে যাওয়া দুটো লাশ জানতেও পারলো না ওদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর।

কড়ি

রঞ্জন নস্কর

সুরঞ্জন সকাল থেকেই অস্থির। সন্ধ্যা হতেনা হতেই ঘরের মধ্যে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদে। বাড়ির সকলেই অনুভব করে ওর কষ্টটা কোথায়। আজ মিতার বিয়ে। সকাল থেকেই তাদের বাড়িতে আনন্দের ঢেউ। ব্যস্ততা বাড়ি-ময়। শুধু কোন শব্দ নেই সুরঞ্জনদের বাড়ি। সুরঞ্জন আর মিতা দু'জন দু'জনকে ভালবাসতে। এই তো সেদিন মিতা এসেছিল সুরঞ্জনদের বাড়ি। ক'দিন আগের কথা, মিতা দীঘা থেকে একটা কড়ি এনে দিয়েছিল। ঠাকুর ঘরে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তোলা। ওদের কত স্বপ্ন! সব শেষ আজ রাতেই। সুরঞ্জনের মাথায় একটাই প্রশ্ন ভালবাসার দায় কেবল একা তারই! মিতার কি কোন দায় নেই? তবে কি মেয়েরা ভাললাগার জন্যেই ভালবাসে! মনে মনে কথা গুলো ভাবে আর চোখের জলে বুক ভাষায়। একজন তো ফুলের মালা গলায় দিয়ে সেজেগুজে বসে আছে কনে সেজে। আর একজনার শূন্য বুকে। ভালবাসল দু'জনে। খেসারত দিল একজন। বিয়ের পর মেয়েরা বড় মুখ ক'রে বলে আমি পরস্ত্রী। বিয়ের আগে কোন প্রেমিকা একবার ও বলেনা আমি পরের প্রেমিকা। সব দায় পুরুষের কাঁধে। আজ কি করবে সুরঞ্জন! ছুটে যাবে বিয়ে বাড়ি? গিয়ে বলবে, আমি মিতাকে ভালবাসি। আবার ভাবল, যা হয় হোক সে তার মিতার কাছে যাবেই। কোন শক্তি তাকে আজ বেঁধে রাখতে পারবেনা। আজ সে বেপরোয়া। হঠাৎ সমস্ত আবেগ শীথিল হয়ে যায়। যখন সুরঞ্জন ভাবে মিতার যদি অমত থাকত, তাহলে বলত - 'চলো পালিয়ে যাই। ঘর বাঁধি।' তা যখন বলেনি তাহলে বিয়েতে মত ছিল। সে যখন বিয়ে করে সুখী হতে চায়, সুখী হোক! ভালবাসা নেহাতই খেলা। সুরঞ্জন নিজেকে সংযত করে। রাত ক্রমে বাড়ে ....।

ভঙ্গুর

পম্পা চক্রবর্ত্তী

সামনে টিভি ক্যামেরা। পরনে কালো আর গোল্ডেনে ছাপা সিল্ক। তার ওপর সাদা এ্যাপ্রোন। হাতে মাইক্রোফোন। দামি ঘড়ি। নেল-পলিস্। মুখে অনর্গল হিন্দি-ইংলিশ। মণিদীপা দত্ত। প্রথম শ্রেণীর কুক্। বঙ্গজা। নামি হোটেলের কুকেরা এসে ধর্ণা দেয় রান্না শেখার জন্য। সাজানো বাড়িতে থাকা। এ.সি গাড়িতে যাতায়াত। টিভি-তে রান্না শেখায়। সোনি, জী ইত্যাদিতে। নানা দেশের,নানা স্বাদের রান্না। কখনও "সওয়াল-জবাব" থেকে ডাকছে। কখন "খানা-খাজানা" থেকে ডাকছে। নামি পত্রিকা রান্না এবং কাঁচা অথবা রান্না করা খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে লেখা পেয়ে বর্তে যায়। এছাড়াও চিঠিপত্র, শুভেচ্ছা,অভিনন্দন, ফিতে কাটা--দারুন ব্যস্ত। বেক করার, গ্রিল করার, ফ্রাই করার নানা সরঞ্জাম ছাড়াও নানা রকমের, নানা ডিজাইনের, নানা রঙের বাসনে হলঘরের মত বিশাল রান্নাঘর সাজানো। নামি ব্রান্ডের মশলারা ওর হাতের ছোঁয়া পাবার জন্য থরে থরে সেজে বসে আছে। বিদেশ থেকেও ডাক আসতে শুরু করেছে।.....

-- ' কি গো ',-- ডাক এলো, অন্য জায়গা থেকে। 'দুটো টোস্ট, একটা অমলেট, একটা চা। কখন থেকে চেঁচাচ্ছি, কোন হুঁস নেই! ..... আর এই নাও। আজকের বাজার। ১৪টা স্লিপ পড়েছে। ভাত, ডাল, আলুভাজা, ফুলকপির তরকারি, মাছ। হাতটা একটু টেনে, বুঝলে? মাসের শেষ।" মালিক। টিনের চালটার থেকেও গরম। কাচের গেলাস নয়, স্বপ্নটা ভেঙে গেল। সামনে পড়ে থাকা পোড়া কড়াই, পোড়া সস্প্যান, ফ্রাইং প্যান, কাপ, কাঁচের গেলাস, পেঁয়াজ, ডিম, এক থলে বাজার দেখে মনে পড়ে গেল -- তাজ, গ্র্যান্ড নয়, 'করুণাময়ী' মেসের রাঁধুনি --মণিমাসী।

ব্রাত্য কথা, গল্প নয়

কালাচাঁদ ঘটক

সমস্তদিন অঝোরে বৃষ্টি। টিপ টিপ চলছিল কদিন ধরেই। আজ যেন বাঁধন ছেড়া ভাব। বীরু কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। মাঠ ঘাট সব থৈ থৈ। এখানে ওখানে জলের নাচন। ওরই মধ্যে কোদাল কাঁধে নিয়ে বেরোতো যাবে, নয়না বাধা দিল, তোমার কি মাথা খারাপ হইছে? এই বৃষ্টিতে তোমারে কাম দ্যাওনের লাইগ্যা কে বইস্যা রইছে?

— না বাইর হইলে খাইবা কি?

— আইজ চইলা যাইব কোনোমতে। তুমি বরং মনারে সামলাও একটু। চৌকির থিক্যা পইড়া না যায়। আমি কাঠ কুটা জ্বালাইয়া দুইটা ফুটাইয়া লই।

নদী নালা ভাসলে মাছও ভাসে। সারা দুপুর বীরু তাই দেশ থেকে রক্ষা কবচ হিসাবে বয়ে আনা মরচে ধরা বল্লমটা হাতে নিয়ে মাটির দাওয়ায় বসে রইল। মাছ হল না কিছু। তবে দেশ ছেড়ে অকূলে ভেসে আমার জল ছবিটা আবার ধরা দিল বৃষ্টির ঝাপসা প্রেক্ষাপটে। এই তো সেদিনের কথা....। মনা তখন নয়নার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। ওরই মধ্যে উৎপাটিত মূল। ভাসতে ভাসতে শিয়ালদা স্টেশন, রিফিউজি ক্যাম্প, বাঁকা পথে অর্থ উপার্জনের অশুভ হাতছানি। আরো কত কি....। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা......। শেষ পর্যন্ত সযত্নে এবং গোপনে লুকিয়ে রাখা হাতের চুড়ি ক'গাছার বিনিময়ে এই আস্তানাটুকু। তারপর মনা এল। বাচ্চার সোহাগে চৌকিটা। বীরু ভেতরে তাকাল। যে ভাবে জল বাড়ছে, ঘরে ঢুকল বলে। তবে চৌকিটা উচুঁ। অবশ্য ঘরে জল ঢুকলে, ফাঁক ফোকড় দিয়ে মাছ কি আর দু চারটে....।

মাঝ রাতে কিসের শব্দে বীরুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চৌকির নিচে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মুহুর্তে তার হাত চলে যায় পাশে রাখা রক্ষাকবচ বল্লমটার দিকে। মনে খুশির বান। নিশ্চয়ই বড়সড় মাছ। সমস্ত শক্তি তখন ছলাৎ শব্দের উৎপত্তি স্থলে নিক্ষিপ্ত।

আর ঠিক সেই মুহুর্তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসা নয়নার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা বুকফাটা আর্তি, মনারে.......।

মন যখন পরকীয়

প্রবীর জানা

শুভ্রাকে সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে পারলনা প্রশান্তর বিস্মিত চোখ। শুভ্রা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল – ভাবিনি হঠাৎ তোমাকে দেখব। ভেতরে এস। প্রশান্ত বৈঠকখানায় গিয়ে একটা সোফায় বসল। প্রশান্তকে অন্যমনস্ক দেখে শুভ্রা বলল – মনে পড়ে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা পুরীর স্বর্গদ্বারে?

প্রশান্তর গলা ভারি হয়ে আসে। সে বলল – তারপর বিচ্ছেদ। তোমার মা'কে ছেড়ে বাবা অন্য মহিলাকে নিয়ে সংসার পেতেছেন তা আমার বাড়ির লোকেরা মেনে নিতে পারেনি - - তাই এ বিয়েতে তারা রাজী হয়নি।

কড়া নাড়ার শব্দে শুভ্রা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। পাঁচ-ছয় বছরের এক শিশু ব্যাট হাতে ভেতরে এলে শুভ্রা বলে – আমার ছেলে বাপী।

কিছু সময় পরে শুভ্রা চা ও ডিমের ওমলেট নিয়ে হাজির হলে প্রশান্ত বলল আমার বন্ধু সুমন কোথায়? অনেকদিন তার সাথে দেখা হয়নি। বিশেষ প্রয়োজনে কাকদ্বীপে এসেছিলাম। ভাবলাম দেখা করি – তাই চলে এলাম। কিন্তু ....। সুমন দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল – কোন কিন্তু নয় ফ্রেন্ড! একটা সাহিত্য সভায় যোগ দিতে কাল থেকে বাইরে গেছলাম। এই ফিরলাম।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। সূর্য ডুবুডুবু। সুমন ও প্রশান্ত বসে আছে হুগলী নদীর তীরে একটা পাকা কালভার্টের ওপর। হুগলী নদীর লবণাক্ত জলে জ্বলন্ত ফসফরাসের দাপাদাপি। প্রশান্ত বলল – তুই চুপিচুপি বিয়েটা সেরে নিলি। আমাদের জানালিও না। তোর ছেলেটা দারুণ মিষ্টি দেখতে। তবে তোর বা শুভ্রার কারও মত দেখতে হয়নি সে। সাহেবদের মত গায়ের রং কটা চোখ-খয়েরী চুল!

সুমন শুধু বলল – রাত হয়েছে। বাড়ি ফিরি চল।

রাত্রে খাওয়ার পরে শুভ্রা বলল – দোতলায় বিছানা করে রেখেছি। তোমরা দু'বন্ধু সেখানে ঘুমাতে যাও। কথা প্রসঙ্গে দোতলায় বসে গল্প করতে করতে প্রশান্ত বলল তুই বাংলায় ও আমি রাজনীতিতে মাষ্টার ডিগ্রী করলাম। আমি একটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলাম বাঁচার তাগিদে। পিতার মৃত্যুর পর বাড়ি ঘর অজস্র টাকা তোর হাতে এসে গেল। তাই তুই চাকুরির কথা না ভেবে সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করলি। এখন অবশ্য তুই খ্যাতিমান কবি। হ্যাঁ, বেশ রাত হয়ে গেছে। তোর বউ তোর জন্য অপেক্ষা করছে। রাগ করবে। তুই বরঞ্চ নিজের ঘরে ঘুমাতে যা।

সুমন বলল – না, আমি পাশের ঘরে ঘুমাতে যাচ্ছি। দরকার হলে ডাকিস।

বেশ বেলা হয়ে গেছে প্রশান্তর ঘুম ভাঙতে। দোতলা থেকে বৈঠকখানায় এসে দেখে শুভ্রা তারজন্য চা বানিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রশান্ত বলল-সুমন কোন কবির আসরে যোগ দিতে চলে গেছে।

প্রশান্ত বিস্ময়ে বলল – তাহলে কি আমাদের সম্পর্কের কথা সে জানতে পেরেছে তাই ....। শুভ্রা বলল – সুমন ভীষণ ভালো মানুষ। ঘোরপ্যাঁচের কিছুই সে বোঝেনা। তোমার সাথে বিচ্ছেদের পরে মা ভীষণ ভেঙে পড়লেন। ঐ সময় আমেরিকায় রিসার্চের সুযোগ পেলাম। চলেও গেলাম। কিছু দিনের মধ্যে মা মারা গেলেন। আমি ঠিক করলাম আর বিয়ের ফাঁদে পা দেব না। কিন্তু প্রত্যেক নারী চায় মা হতে। আমেরিকায় স্পার্ম ব্যাঙ্ক আছে। আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মা হলাম। এদেশে ফিরে এসে কাকদ্বীপে একটি স্কুলে মাষ্টারি পেলাম। সমস্যা হল বাড়ি ভাড়া পাওয়ার। সবাইকে জিজ্ঞেস করে সুমনদার সাথে পরিচয় হলো। সে আমাকে বাড়ি ভাড়া দিল একটি শর্তে। বাইরের লোকে জানবে আমরা স্বামী-স্ত্রী কিন্তু আমরা সেরকম কোন মেলামেশা করব না। এখন সমস্যা ছেলেকে কোন স্কুলে ভর্তি করতে পারছিনা। পিতার নাম ছাড়া কোন স্কুলে ভর্তি করছে না।

প্রশান্ত তার জামার পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে শুভ্রার হাতে দিয়ে বলল – তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমি পাপ করেছি। ব্যাচেলার থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। পুরুষরাও চায় সন্তানের পিতা হতে। আমার নাম তোমার ছেলে বাপীর পিতা হিসাবে সবাই জানুক।

শুভ্রা জানলার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল মেঘের জটলা যেন আকাশ থেকে নেমে এসে হুগলী নদীর সাথে কোলাকুলি করছে দূরে। সে পিছন ফিরে দেখে প্রশান্ত চলে গেছে!!

কবিতার জন্য

বিবেকানন্দ গোস্বামী

বেশ একথা সেকথা হচ্ছিল। যেমন হয় রাতে ঘুমোবার আগে আর পাঁচটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কথা হতে হতেই কোথায় যেন কার লেগে গেল। ব্যাস! এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। পুষা, একমাত্র মেয়ের ঘুম ভেঙে যেতেই দুজন চুপ।

রাত কেটে ভোর হয়েছে। মনোজব অফিসে। না – প্রমোদা রান্না করেনি – কোন কথাও বলেনি। অফিস থেকেই মনোভাব চলে গেল পিসতুতো বোন ঈশিতার ফ্ল্যাটে। অনেক দিন খোঁজ খবর নেয়া হয়নি। ঈশিতা দারুন খুশি।

— রাতে থেকে কাল এখান থেকেই অফিস যাবি প্রমোদাকে ফোনে বলে দিচ্ছি।

মনোজব এমনটাই চাইছিল। বেঁচে গেল নিজেকে ফোন করতে হলো না।

পরদিন যথারীতি অফিস করে বাড়ি। এবার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা মিটে গেছে। যেমন হয়ে এসেছে এতদিন। মনোজব দেখল না তাতো নয়; এখনো থমথমে। অর্থাৎ চলবে। কিন্তু চা এলো। পুষাও কাছে এলো। রাতের খাওয়াও হলো।

— মা মা কবিতা!

পুষার আওয়াজের আগেই মনোজবের কানে এসেছে ব্রততীর গলা, জয় গোস্বামীর পাঁচালি, দম্পতি কথা বলছে। প্রমোদা চলে গেছে টিভির সামনে। ডাইনিং এ মনোজব।

"অশান্তি চরমে তুলব কাক চিল বসবে না বাড়িতে" মনোজব এক পা এক পা করে ঘরের দিকে এগুচ্ছে " দুজনে মিলে টিভি দেখব। হাত দেখাতে যাব জ্যোতিষীকে পাগলী, তোমার সঙ্গে নিজ ফ্ল্যাটে কাটাব জীবন" কি যেন একটা ভীষণ দরকার একটা কিছু নিতে ঘরে ঢুকলো মনোজব। টিভির পর্দায় ব্রততী বন্দোপাধ্যায় আর ড্রেসিং টিবিলের আয়নায় মা মেয়ের মুখ, মনে হচ্ছে যেন মেঘ কাটছে।

"সন্ধেবেলা ঝগড়া হবে হবে দুই বিছানা আলাদা হপ্তা হপ্তা বন্ধ"

হো হো করে মনোজব হেসে উঠেছে। আয়নায় দেখে নিয়েছে কারো ঠোটের ফাঁকে হাসির রেশ!

ডিভানে রাত ভোর।

— তোমার চা —!

"পাগলী তোমার সঙ্গে কাটাব জীবন।"

শিকার

মানব সরকার

সেই কাকভোর থেকে শুরু হয়ে গেছে ব্যস্ততা। বিয়ে বাড়ী বলে কথা তাও আবার মেয়ের বিয়ে। মেয়ের অধিবাস, জল তোলা, হাওড়ার বাজার থেকে ফুল কিনতে যাওয়া, মাছের জন্য ছোটা আরও কত কি।

বিয়ের আগের দিন থেকেই বাড়ীতে লোক ভিড় করেছে। নতুন কনের সঙ্গে খোস আড্ডা। কিভাবে শুভদৃষ্টির সময় তাকাবে, ভবিষ্যত পরিকল্পনা আর বৃদ্ধাদের ঠাট্টা তামাশাতেই মেতে উঠেছে বাড়ী। আর এরই মাঝে নতুন করে মনীষার মাঝে মাঝে চোখ ছলছল করে উঠছে কারণ তার চেনা পরিচিত বাড়ী পরিবেশ সবকিছু ছেড়ে তাকে চলে যেতেই হবে আনকোরা, অপরিচিত একটা নতুন পরিবেশে। সেখানে সবই তার অচেনা শুধুমাত্র কয়েকজনকে চোখে দেখেছে মাত্র। আর হবু চিরদিনের সঙ্গীটির সাথে আলাপ হয়েছে মাত্র। আরও কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে সে সবেমাত্র গ্রাজুয়েট হয়েছে, চাকরির চেষ্টা করছিল কিন্তু হঠাৎ বড়লোকের এক ছেলে, ভালছেলে, ছোট সংসারের সবাইকার ওকে পছন্দ হওয়ার মা, বাবা হঠাৎ রাজী হয়ে গেলেন, যেটা হবার কথা ছিল না। শুধুমাত্র একটা কথা ভেবে ওর বুকে আশার প্রদীপ জ্বলছে, যে মানুষটাকে সে পেতে চলেছে সে দারুন আমোদপ্রিয়, সৎ চরিত্র এবং ভদ্র।

একথা ভাবতে ভাবতেই গায়ে হলুদ, শুভদৃষ্টি ও কণকাঞ্জলি পেরিয়ে সে এখন তার নতুন জীবনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ আগে কনেযাত্রীরা সবাই চলে যাওয়ার পর বাড়ীর মেয়েরা মনীষা ও প্রদীপ্তকে ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দোর দিয়ে দিল।

এখন ওরা দুজন, শুধু, মনীষা আড়ষ্ট দেখে প্রদীপ্ত কাছে টেনে নিয়ে পরস্পর নিজেদের কথা বলতে বলতে কখন হারিয়ে গেল নিজেদের মধ্যে। প্রথম দিন প্রদীপ্ত কিছু বলল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রদীপ্ত আবিষ্কার করে ফেলল মনীষার কন্টকময় জীবনের ঘটনা। যা শুধুমাত্র প্রদীপ্তই জানল। মনীষা ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্রী ছিল। মা বাবা বিশেষ পড়াশুনো না জানায় পাড়ার এক ছেলেকে মনীষার পড়াশুনার দায়িত্ব দেন। মনীষা আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে থাকে। হ্যাঁ, পড়াশুনার জন্য প্রায়ই মাষ্টারমশাইয়ের কাছে যেতে হত তাকে। একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে গেল। সেদিনও মনীষা সন্ধ্যার পর গিয়েছিল তার মাষ্টারমশাইয়ের কাছে অঙ্ক দেখতে। মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ী ফাঁকা। সুযোগ বুঝে অত্যন্ত সুকৌশলে নিষ্পাপ একটা সদ্য ফুটন্ত সদ্য ফুটন্ত ফুলকে বৃন্তচ্যুত করলেন। ভয়ে, লজ্জায় কাউকে বলতে সাহস করল না। কিন্তু সেই মাষ্টারমশাই দাপটের সঙ্গে চলাফেরা করতেন। মনীষাকে আবার তার কাছেই পড়তে যেতে হত কারণ তার মা-বাবা বেশী পয়সা দিয়ে প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারবে না সাফ জানিয়েছেন। আর এই সুযোগে মনীষাকে কুরে কুরে খেতে থাকে ঘুনপোকা। তারপর একদিন মনীষা চাপা প্রতিবাদ করায় একমাসের মধ্যে বাইরে চাকরী নিয়ে চলে যায় মাষ্টারমশাই। প্রদীপ্ত ক্লান্ত বোধ করে। সে মনীষাকে আরও কাছে টেনে নেয় অকপটে সব খুলে বলার জন্য।

সহজ পাঠ

শুক্লা ঘোষাল

লম্বা সড়ক। গাড়িঘোড়ার দৌরাত্ম্য নেই। দুপাশে দেবদারু বট অশ্বত্থ জারুল। মাঝে মাঝে দু-একটা কৃষ্ণচূড়া আর অমলতাস। এই সড়কপথের নির্জনতায় এক বালিকা ও যুবতী হাঁটছিল। বালিকার সঙ্গের যুবতী অতি সাধারণ শাড়ি পরিহিতা। তাদের সামনে দিয়ে চলেছে এক যুবক ও যুবতী। বসন্তের বাতাস। সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে। সামনে দোল পূর্ণিমা। চাঁদ উঠছে আকাশে। পাখির কূজনে গাছপালা অস্থির। যেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা সেরে ফিরে মাকে দরজা খোলার জন্য ডাকাডাকি করছে। তারই মাঝে কোকিলের তীব্র স্বরে বাতাসপাগল হয়ে উঠছে। হাওয়ায় যুবতীর নীল আঁচল উড়ে যুবকের পিঠে লাগল। হাত ধরল যুবক। যুবতীর আলতো টানে হাত ছাড়িয়ে একবার পেছনে তাকাল। বাতাস যেন দুষ্টুমি করার জন্যই একটু এলোমেলো হয়ে দিল ধুলো উড়িয়ে। যেন পরখ করতে চাইল দোলের আবিরের রঙ মাখলে কেমন হবে এরা। আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকল যুবতী। দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। হাওয়া থামলে আঁচল সামলে শরীরে ছন্দ তুলে আবার হাঁটতে লাগল। দেবদুরু অনেক পাতা খসাল। অমলতাস একরাশ ফুল দিল ছড়িয়ে। সরসর শব্দে দেবদারুর পাতাও চলতে যুবক যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে। মৃদু ধুলো পায়ে পায়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

সামনে যুবক-যুবতী হাঁটছে।

পেছনে বালিকা তার যুবতী মায়ের সঙ্গে। ওরাও হাঁটছে। বালিকাটি যুবতী মাকে জিজ্ঞেস করল—

মা ওরা কারা?

মা উত্তর করল, জানি না।

বালিকা আবার বলল — বলো না মা ওরা কারা?

মা আবার বলল — সত্যি জানি না।

বালিকা মায়ের হাত ঝাঁকানি দিয়ে বলল — আমি জানি ওরা কারা।

মায়ের মিষ্টি হাসি ও জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল,

ওরা পরস্পর পরস্পরকে —

আর্তি

রমা দাশগুপ্ত

সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে মিত্রা আর আনন্দ ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেলো। একি দরজা খোলা কেন? ভেজানো দরজা এতটুকু হাতের স্পর্শেই খুলে গেল কেন? ভিতরে ঢুকে স্তম্ভিত ও যে একদম গড়ের মাঠ। ফ্রিজ, ওয়াসিং মেশিন শুধু নয়, থালা বাসন - বিছানা আলমারি, কিছুই নেই। দুজনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো খানিকটা তারপর মিত্রা কেঁদে উঠলো। নিদাঘ চৈত্রের দ্বিপ্রহর ধূধূ করছে কেও কারো খবর রাখে না – এ. সি ঘরে বন্দী হয়ে থাকে। শুধু কাজের বৌটা পুলিশের জেরার মুখে বললো দিন দুই আগে, দুলালের চায়ের দোকানে একটা বুড়ো মতন লোক দাদাবাবুদের সব কথা জিজ্ঞাসা করছিল। বুড়ো বাপটাকে আর দেখতে পাইনা কেন? এই সব। পুলিশ সব ডাইরীতে লিখে কুন্তীকে ধরে নিয়ে গেল, ওদের নানারকম আশ্বাস দিয়ে গেলো। রাত্রে দুজনের চোখেই ঘুম আসছিল না। আনন্দ হঠাৎ বলে উঠলে। তুমি যদি বাবাকে বার্দ্ধক্য আবাসের নামে দেশের বাড়ীতে না পাঠাতে তবে এসব কিছুই হতো না। মিত্রা স্বভাবগত বিদ্বেষে ঝেঝে উঠতে গিয়েও পারল না। অতীতটা পরিষ্কার হলো। শ্বাশুরী বেঁচে থাকতে মিত্রার কোন চিন্তা ছিল না। টাইমে ভাত পেতো - অফিস যেতো, বেড়াতে, ঘুরতো সংসার কি জিনিস জানতো না। অনেক রাতে ওরা যখন আমোদ ফুর্তি করে বাড়ী ফিরতো, দেখতো শ্বাশুরী মা খাবার নিয়ে বসে। খাবার টেবিলেই ঘুমে ঢুলছেন। আনন্দ বলতো 'টিভি দেখলেও তো পারো মাত্র তো দশটা বেজেছে।' শ্বাশুরী মা ক্ষীণ কণ্ঠে অপরাধীর মতো বলতেন, চোখে ঝপসা দেখি।

তার এ কথার গুরুত্ব দিলো না। চোখের ডাক্তার যে অলিতে গলিতে – সে কথা তারা জেনেও জানতো না। একদিন এই রকম বাড়ী ফেরার পর চোখে ছানি পড়া শ্বাশুরী দরজা খুললেন না–শীতে কাঁপতে কাঁপতে শ্বশুর দরজা খুললেন-খাবার টেবিলে শ্বাশুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছেন, উঠছেন না, আর উঠলেন না। শুরু হলো মিত্রার সংসার। তার সঙ্গে বাড়ীর শান্তিও থাকলো না। সকালে ইসবগুলের ভেজানো জল, রাত্রে দুধ দই, খাবার পাতে নিত্য দই, জ্যান্ত মাছের ঝোল।

ইম্মপসেবল। মিত্রার দ্বারা এই গাধার খাটুনি চলবে না। কাজের লোক একদিন আসলে দুদিন আসে না। অতএব বার্দ্ধক্যে বারাণসী। বুড়োর পেনশানেই বুড়োর চলে যাবে, মিত্রার ব্যবস্থা নিখুঁত।

কিন্তু সেই নিখুঁত ব্যবস্থায়, খুঁৎ একটা ছিল নিশ্চয়ই তা না হলে আজ তারা সর্বস্বান্ত কেন?

মিত্রার ইচ্ছা হলো আনন্দকে বলে – তোমার বাবা আবার এখানে এসে থাকুন না। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা তো কিছু তেমন হয় নি। দেশের বাড়ীতেই তো আছেন। কিন্তু বলতে পারলো না। লজ্জা গ্লানিতে রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু একটা গোঙানীর মত আওয়াজ করতে পারলো।

একদিন হঠাৎ

সঞ্জয় ব্রহ্ম

ওর ফর্সা পিঠে আলতো করে একটি চাটি মেরে অরিন্দম বলল , ' আরে সাগর তুই এখানে? এত বছর কোথায়ছিলি?' ঘটনার খুব দ্রুততায় সাগর বা সাগরিকা ভাবা মহিলা ঘুরে তাকালেন। – সে চোখে বিস্ময়! যেন জিজ্ঞাসা করছে , – আপনি!

ভদ্রমহিলার চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে তেমন কোনো বিরক্তি নেই। আছে আকুল জিজ্ঞাসা? – হয়তো সে'ও খুঁজছে – তার হারিয়ে যাওয়া এমন কাউকে। যে এমন ঘনিষ্ঠ করে ডাকতে পারতো অথবা পিঠে চাটি মারতে পারতো।

অরিন্দম একশ্বাসে অনেক কিছু বলে ফ্যালে, 'এ্যাই সাগর ন্যাকামি করছিস?.আমায় তুই চিনতে পারছিস্ না?'

'আপনি বোধহয়-ভুল করছেন?' এতক্ষণে সাগর ভাবা মহিলা কথা বলেন।

মুহূর্তেই অরিন্দমের পিলে চমকে যায়। প্রাণবায়ু প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থায়। – সে মহিলার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝে যে সে ভুল করেছে। অতএব মহিলা এখন যদি শ্লীলতাহানির কারণে ঠাস করে গালে চড় কষিয়ে দেয়, তবেও কিছু বলার নেই।

'সাগর আপনার বান্ধবীর নাম? তিনি কি আমার মত দেখতে?' – একটু আগে সাগর ভাবা মহিলার বয়স চল্লিশ পেরোয় নি। বিগত যৌবনা বলা যাবে না। সুন্দর লাবন্যময়ী মাঝারী গড়নের চেহারা। সেই মহিলা বলে উঠলেন।

অরিন্দমের গলা শুকিয়ে এসেছে। কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, সাথে পানীয় জল থাকলে ভাল হতো। এমন অভিজাত সিনেমা হলে এসে, এ রকম অঘটন। একটি নারী বা পুরুষের সাথে চেহারার হুবহু সাদৃশ্য থাকতে পারে। তাদের মুখোমুখি হওয়াও অস্বাভাবিক না। সব মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আবেগতাড়িত হয়ে একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকেএকটু স্বাভাবিক হয়ে অরিন্দম বলে , – ' আসলে আপনাদের দুজনের চেহারার এত সাদৃশ্য। বিশ্বাস করুন। আমার সাথে চলুন তার ছবি দেখাবো। আপনি দেখবেন কি নিখুঁত সাদৃশ্য আপনার সাথে। শুধু কণ্ঠস্বরটা সম্পূর্ণ আলাদা। নইলে হয়তো........'

সেই মেয়েটি বললো, আচ্ছা ধরুন তাই যদি হতো। অর্থাৎ আপনার সাগর বা সাগরিকার মত কণ্ঠস্বর আমার যদি হতো। মানে সব কিছুই একরকম; সাথে সাথে কণ্ঠস্বরটাও এক হতো? তাহলে কি আপনি শেষ পর্যন্ত আমার এই অস্বীকারকে স্বীকারোক্তিতে আনতে পারতেন?

অরিন্দম শুকনো গলায় বলে, আপনি ... মানে আপনার নাম?

সেই মেয়েটি বা মহিলা বলেন, সিনেমা কিন্তু – শুরু হয়ে গেছে। তিনটে ঘন্টা বেজে গেল।

অরিন্দম ব্যস্ত ভাবে হলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, এই আমার কার্ড, নাম-টেলিফোন নম্বর আছে।

মহিলা বলেন, আমি স্বাগতা বোস। ফাইভ সেভেন সেভেন সেভেন ট্রিপল ফোর। অরিন্দম পকেটের কলম দিয়ে হাতের তালুতে লিখে নেয়।

ফোন করবেন।

আপনি'ও ....

দেখা যাক কে আগে রিং করে?

দেখা যাক?

ওরা দুজনে সিনেমা হলে ঢুকে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সিনেমা হলের পর্দায় তখন আসল সিনেমা শুরু হয়ে গেছে।

উপক্রম

নিয়তি রায়চৌধুরী

এই জীবন শুরু হয়েছে মাত্র দেড় মাস। এরমধ্যে দম্পতির দুটি হানিমুন সেরে আসা হ'ল। কাছে এবং দূরে। দিঘা এবং গোয়া।

গোয়ার সান্তমোনিকায়, আরব সাগরের জলে—মান্ডবী আর জোয়ারী নদীর একত্র বয়ে চলাটি মনে রেখাপাত করেছিল পিঙ্কির।

অনন্ত জলধি বুকে, দুটি নদী কেমন মাখামাখি মিশে গিয়েও তাদের বর্ণ পার্থক্য বজায় রেখেছে। আশ্চর্য!

ওখানে অঞ্জুনা বিচের বালির বিছানায় ব্রা প্যান্টির স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে গড়াগড়ি খেতে তেমন অসুবিধা হয়নি—যেটা তাদের সল্টলেকের নিজস্ব ফ্ল্যাটেও পেরে ওঠেনা। পিঙ্কিকে নিশ্চুপ সানবাথ নিতে দেখে দীপুর কৌতুহল বেড়েছিল—কি ভাবছো! দেখো আবার, এইসব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের মধ্যেই কিন্তু পুরনো প্রেমিকরা এসে হানা দেয় মগজে। কিঙ্কি দীপুর মাথাটা নিজের দিকে ঝাঁকিয়ে এনে বলেছিল, আমার মনে পড়ছে এখন স্কুবির কথা। বেচারা তোমার হাতছাড়া খেতে পারে না। কি যে করছে এখন ডগহোমে।

দীপু মাথাটি নিশ্চিন্তে পিঙ্কির হাতে সমর্পন করে বলেছিল ,

— স্কুবিও বুঝে গেছে এটি তার প্রভুর মধুবর্ষ...।

— আহারে। ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে পিঙ্কি।

মাথার ওপর আকাশ আর পায়ের নিচে সমুদ্র নিয়ে প্রায় রাজার মত বলেছে দীপু, এখন আর স্কুবি-ফুবি! স্রেফ নিজেদের নিয়ে মেতে থাকার সময় এটা। প্রতিটি দিনকে পিপাসার মত করে তোলো। যাকে বলে উপভোগ। বলতে বলতে বালিশয্যায় আর একবার গড়াগড়ি খেয়েছিল দীপু।

— উপভোগ তো হচ্ছেই.....এই দেড়মাস তার বিরতি নেই। মনে হয়, সারা জীবনটাই যদি এমন মুগ্ধ ভালবাসায় কেটে যেত!

— যাবে না ভাবছো কেন!

— তা কি আর হয়! ছোটখাটো কতকিছু নিয়েই তো লেগে যেতে পারে। হয়ত খুবই তুচ্ছ, খুবই অর্থহীন-কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়াতে পারে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার উপক্রম, তাই না? অথচ আজকের ফিলিংস দিয়ে তা ভাবাই যায় না....। ভবিষ্যতের দিকে পিছু ফিরে, হাসতে হাসতে উঠে বসল পিঙ্কি। আরামের আড়মোড়া ভেঙ্গে পিঠ তুলেছে দীপুও। বড়সড় একটা হাই তুলে বলল, এটাই হ'ল মেয়েদের রোগ। দুঃখ বিলাসের একমাত্র সময় তাদের এই হানিমুন-টা....।

এখন এই ছুটির দুপুরে, খাওয়া সেরে একগুচ্ছ আঙুর হাতে নিয়ে হাসছে পিঙ্কি। আসলে কথাগুলো মনে পড়ছে এখন। না, মন ভার হবার মত কোনো কারণ এখনও ঘটেনি এই এক

বছরের দাম্পত্যে। দীপ্ত এখনও যথেষ্টই দীপ্যমান পিঙ্কির মনে। একই ছন্দে বইছে তার অফিস ঘর-নিরুপদ্রুত দু'জনের কূজন— এবং উইকএন্ডের উপভোগ। পুরনো বান্ধবী কি সুন্দরী কলিগ কোনো আকর্ষণই পিঙ্কিকে টপকাতে পারেনি। অমন যে পছন্দের নায়িকা ঐশরিয়াও তার কাছে ধার হারিয়েছে খানিকটা। তীব্র প্রিয় নেশা সিগারেট কমে এসেছে সংখ্যায়। হুইস্কি মাত্রামত, অকেশনালি। বস্তুত যে সব স্ফূর্তির ভেতর দিয়ে পুরুষ খরচ হয়ে যায় বা দাম্পত্য-চর্চাটা খুইয়ে বসে, পিঙ্কির ক্ষেত্রে তা হয়নি এখনও।

থোকা ছিঁড়ে ফ্রিজের হিম রক্তবর্ণ একটি আঙুর মুখে পুরল পিঙ্কি। গড়িয়ে যাওয়া গাঢ় রসের গলা গুনগুনিয়ে উঠল গান হয়ে...আমার সকল রসের ধারা আজ তোমাতে মিসে হ'ক না হারা...। গর্বিত ঘাড় ঘোরাল পিঙ্কি। ধারে কাছে দীপ্তকে দেখছে না। তারমানে, ভাত ঘুমের বিছানা। ভাবল, দীপ্তর পাশে শুয়ে পড়ার অনেকটা অবকাশ নিয়ে মধুচন্দ্রিমা ছবিগুলো আজ আর একবার দেখবে দুজনে। দু'জনে ছবি দেখার বেশ একটা দ্বৈত খুনসুটির মজা আছে। ছুটির দিন ছাড়া তো দুপুরে মিলবে না দীপ্তকে। ভাবামাত্র বের হ'ল অ্যালবাম। একহাতে আঙুরের গুচ্ছ, অন্যহাতে অ্যালবাম, গলায় কপোতীর উষ্ণতা, এই দীপ্ত....দীপ্ত...

দরজার এপাশে, অজান্তেই অন্যতর সেই ডাক যেন এক অবারণ মেঘভারে জলদ হয়ে উঠল—একি গো—আমার জায়গা কই! আমি শোবো কোথায়।

উত্তরে দীপ্ত নয়, ছড়ানো বড় বিছানায়-দীপ্তর পাশটি থেকে, ঠিক কিঙ্কির মত মাথা তুলে আহ্লাদিত সাড়া দিল স্কুবি, --ভুক্—ভুক্—
ভু-উ -ক....।

‘দেখা ঝরা বসন্ত’

সবিতাক্ষ

মাসীর বিয়ে, তখন আমি ক্লাশ টেনে পড়ি। বিয়ে বাড়ীতে আলাপ হয়েছিল ওর সাথে সম্পর্কে মাসির মাসতুতো ননদ। টানা টানা চোখ। নামটা বেশ মিষ্টি শর্মিলি। অনেক কথা বড়দের চোখ আড়াল করে। নিভৃতে কথায় কথায় ওর গালে দুটো আঙুল দিয়ে কয়েকবার বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলাম ত্বকটা খুব নরম আর মোলায়েম। বিয়েবাড়ীর শেষে বাড়ী ফেরা। আর কথা হয়নি। পরের বছর হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা। মাসী এসেছিল। হঠাৎই পড়ার টেবিলে পিছন থেকে এক যেন দু চোখ চেপে ধরলো। বললো – বলতো কে আমি? আমি চোখের উপর হাতের স্পর্শে বুঝতে পারলাম না। হঠাৎই দু'গালে চুমু দিয়ে চোখ ছেড়ে পাশে দাঁড়াল। – শর্মিলি তুমি! কখন এলে? আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। এরপর গত একবছরের কত কথা ও অনর্গল বলে গেল। সময়টা তাড়াতাড়িতাড়ি চলে গেল। মাসীর তাড়ায়, আসি, আসি বলে দুম্ করে চুমু দিয়ে হাসতে হাসতে – চলি বলে, চলে গেল।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। অসংখ্য বসন্ত চলে গেছে। চুলে পাক ধরেছে। হঠাৎই সেদিন মিনি বাসে নামবার জন্য গেটে আসতেই পাশ থেকে কে যেন বললো – শেখর না! আমি শর্মিলি। আমার মেয়ে দিয়া। দেখি পাশে সেই ছোট্ট শর্মিলি। কিছু বলার আগেই স্টপেজ চলে এলো। নামতে নামতে বললাম – ত্বকটা সেই আগেরই মতন। মেনে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি ও দুটো আঙুল গালে বোলাচ্ছে। কি জানি, সেই পুরনো স্মৃতি .....

সন্দীপের সাতদিন

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

কণা সন্দীপের চেয়ে বছর পনেরোর ছোট হবে। মেয়েটা সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হোতে পারে এমন ধারণা সন্দীপ কখনই করেনি। তার হাবভাবেও তেমন মনে হয়নি। কণা সন্দীপকে দাদা বলে ডাকে। তাতে কি হয়েছে? বয়েস নিয়েই বা এতো ভাবছে কেন সন্দীপ? প্রেম কী বয়েস দেখে হয়? সন্দীপ কণাকে প্রথমে ছোট বোনের মতোই মনে করত। মেয়েটা অফিসে জয়েন করার পর থেকেই সন্দীপকে একটু বেশী গুরুত্বই দেয়। সন্দীপের কড়া ব্যাচেলার মনটা যেন একটু কোমল হতে থাকে। সেদিন যখন অফিসে সবার সামনেই চোর করে সন্দীপকে তার নিজের হাতে তৈরি লুচি-আলুর দম খাওয়ালো তখনই মনের মধ্যে নিজেকে পাল্টে ফেলার বাসনা জাগলো সন্দীপের। জামা-কাপড়ে নিয়মিত আয়রণ করতে লাকলো সন্দীপ। পুরনো ব্যাগটা পাল্টে ফেললো। হাল্‌কা হয়ে আসা চুলে শ্যাম্পু করতে লাগল। মাঝে মাঝে গা দিয়ে দামি কসমেটিক্‌সেরও গন্ধ বেরোচ্ছে আজকাল। অযত্নে ফেলে রাখা শরীরে জেল্লা এসেছে সন্দীপের।

যখন কণার কাছে প্রেম নিবেদন করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে আর পরিস্থিতি খুঁজছে সন্দীপ, তখনই ঘটে গেল প্যাপারটা। অসাবধানতায় কণা তার একটা জায়েরি ফেলে গেল টেবিলের ওপরে। অফিসারকে কাগজ পত্র বুঝিয়ে দিয়ে ফিরবার সময় পরিত্যক্ত টেবিলে ডায়েরিটা পেলো সন্দীপ। কৌতুহল বশতঃ পাতা ওল্টাতেই বিস্ফোরণ। 'আর পড়তে পারেনি সন্দীপ। টেবিলের ওপরেই রেখে দেয় ডায়েরিটা। কণা তাহলে সত্যিই তাকে ভালোবাসে! ভীষণ জল তেষ্টা পায় সন্দীপের। পরদিন অফিসে যখন কণাকে ডায়েরিটা ফেরৎ দিল সন্দীপ তখন কণাকে ভীষণ লজ্জিত মনে হচ্ছিল। সন্দীপ চায় না, কণা তাকে 'সন্দীপদা' বলে ডাকে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতেও তো পারে না। যাই হোক, প্রমাণ যখন পাওয়া গেছে, এবার প্রস্তুতি নিতে হয়। টালির চালের ঘরে শৌখীন কণাকে নিয়ে আসা যায় না। এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে নিজের ভুতুড়ে ঘরখানায় ছাদ দিয়ে নিলো। নোনা ধরা দেয়ালে পড়ল রং। টেবিলে রাখা হল কাঁচের ফুলদানি। কাদায় ভরা উঠোনে পাতানো হল ইঁট, কণা গান শুনতে ভালোবাসে। আনা হল টেপ রেকর্ডার। বেশ কিছু দেনা হয়ে গেল সন্দীপের। তাতে কি হয়েছে!

বৌদির কাছে ধরা পড়ে যায় সন্দীপ। সব স্বীকারও করে। বৌদির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হল-আগামী কালই কনাকে তার বাড়িতে আসতে বলবে। সাতটা দিন খুব ধকল গেছে সন্দীপের। এই সাত দিনে বিড়ি ছেড়ে সে অভ্যস্ত হয়েছে সিগারেটে।

সন্দীপ সুযোগ খুঁজছে, কখন কণাকে প্রস্তাবটা দেওয়া যায়। বুকের মধে কামারের হাপর। আজ আর সুযোগ মিলল না, আকামীকাল বলতে হবে। বাসে ওঠার আগে ছোট্ট একটা খাম সন্দীপের হাতে গুঁজে দিয়ে কণা বলল, 'বাড়ি গিয়ে দেখবেন। যেন বিমুখ করবেন না।' সন্দীপ কিছু বলবার আগেই বাস ছেড়ে দেয়।

খামখানা পকেটে গুঁজেই দ্রুত হাঁটতে থাকে সন্দীপ। হাতের মুঠোয় পৃথিবী। হাতের

মুঠোয় সুখ। যে কথা তার কণাকে বলা উচিত সে কথাই নিশ্চয়ই কণা চিঠিতে লিখেছে। আরো জোরে হাঁটে সন্দীপ।

অফিসের জামা-কাপড় না খুলেই মৌজ করে সিগারেট ধরায়। তারপর খামটা খুলে চিরকুটটা পড়তে শুরু করে। হাত কাঁপছে। কপালে জামছে ঘাম—'পূজনীয় সন্দীপদা, আগামী রবিবার আমার বিয়ে। পাত্রের নাম সন্দীপ চ্যাটার্জী। আপনার আর ওর একই নাম। তাই বিয়ের পর আপনাকে শুধু দাদা বলেই ডাকবো। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। তাই সাক্ষী হিসাবে আপনাকে চাই। লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারিনি। তাই এই চিরকুট। আশা করি 'না' বলবেন না।

ইতি -

স্নেহধন্যা কণা।

পিঠে উৎসব

নিভা দে

নবীন নক্ষত্র ক্লাবের উদ্যোগে পিঠে উৎসব হবে। গঙ্গাতলীর মতো গ্রামের পক্ষে এ উৎসব যথেষ্ট অভিনব। তবে এখানেও যথেষ্ট শহুরে হাওয়া বইছে এখন। বিনু ক্লাবের একজন জুনিয়ার মেম্বার। বিনুর মন নানা ভাবনায় উদ্বেল। মা'কে বলা যাবে পিঠে তৈরির কথা? পাগল! টি.ভি দেখে আর লুডো খেলেই সময় যায় তার। তবে? ঠাকুমাকে? খুবই বুড়ো। -- এই শীতে কাবুও বেশ। তবু তাকেই ধরলো বিনু। -- তোমার ছোট নাতিকে পিঠে খাওয়াও। -- ও বাবা! আমি কি আর পারি? বয়স কতো হল জানিস? পঁচাত্তর তা হোক। বেশ তো চলতে ফিরতে পারো। করো ঠাকুমা, প্লিজ, যে পিঠে চট করে কেউ করে না -- এমন কিছু। নাতির বয়স সতেরো। মাকে জপিয়ে পয়সা জোগাড় হ'ল-- তারপর যা যা দরকার সব কিনেটিনে আনলো। ঠাকুমা কিরণবালার মনে ফরিদপুরের প্রথম যৌবনের স্মৃতি বারবার উঁকি দিয়ে গেল। সে সব দিন কোথায়? তার হাতের নানারকমের পিঠে শ্বশুর মশাই বড় পছন্দ করতেন। দু'দিন ধরে ধীরে সুস্থে মনের আনন্দে করলেন চুষিপিঠে। এতেই তিনি স্পেশালিস্ট। এসব পিঠে এখন কেউ আর করে না, ছোট ছোট সরু সরু একই আকারের চুষিগুলি, তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য চেয়ে দেখার মতো। তারপর চমৎকার ঘন দুধে তারা যেন ডুবে রইলো মনের আনন্দে। সঙ্গে অতিরিক্ত, কিসমিস, কাজুবাদামের গুঁড়ো, -- নতুন গুড় তো অবশ্যই।

বিকেলে বড়ো একটা বাটি ভ'রে বিনুর সামনে ধরলেন তিনি, নে. খা দেখি, কেমন হয়েছে বল।

— ঠাগ্‌মা গো, দেখেই জিভে জল আসছে -- কী রং, আহা, আহা....। বাড়ির সবাই খেয়ে মুগ্ধ, আগে কোনদিন এমনটি করোনি কেন? অভিমানে উথলোল। বিনু সবার আড়ালে লুকিয়ে বাটিটি জমা করে এলো ক্লাবে। নম্বর পড়লো চোদ্দ। কালকেই প্রতিযোগিতা। কলকাতা থেকে পিঠে বিশেষজ্ঞ আসবে-দেখবে-চাখবে-তারপর.....।

তারপর। যা হবার তাই হ'ল। বিনুর স্বপ্ন সফল। চোদ্দ নং প্রথম হ'ল। একশোতে আটানব্বই পেয়ে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় নম্বর অনেক নিচে ৬৫ আর ৬২। দারুণ প্রশংসা করলেন -- পাঁচজন এক্‌স্‌পার্ট-মঞ্চে। প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করার সময় এমন স্বাদের, এমন পিঠে তারা কোথাও খাননি, জানালেন। তাদের বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। চোদ্দ নম্বর কার? কার তৈরি পিঠে? সবাই খোঁজখবর করছে, পুরস্কার পাবেন যে তিনি। বিনু ক্লাবকর্তার কাছে ডুপ্লিকেট নম্বর - জমা দিয়ে এলো? প্রাপকের নাম সহ।

— ও ঠাক্‌মা, চলো চলো, কাপড়টা পাল্টাও। ভাল শাল একটা গায়ে দাও।

— কোথায় রে বাপু? কেনই বা যাবো।

আগে চলোই না। — প্রায় টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে একেবারে মঞ্চে তুলে দিল বিনু। কিরণবালা তো অবাক, এ আবার কি? পুরস্কার? পেরাইজ? সে পাচ্ছে? ও মা একটি সুন্দর শাল গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সম্মান জানানো হ'ল তাকে। --- ' কিছু বলুন,– ঠাকুমা – স্পীকার এগিয়ে দিল তার দিকে একজন। --- কি বলবো, বাবারা! এ কী কান্ড! পিঠে ক'রে পেরাইজ? জীবনে এই পেরথম মঞ্চে উঠলাম বাবা। কি বলবো। কিরণবালার চোখে জল। মনে মনে তিনি ভাবলেন -- কই, কোনদিন তো কেউ প্রাণখুলে তার কোন কাজের প্রশংসা করেনি। না স্বামী না সন্তানেরা। কতই তো রান্না করেছেন, পিঠে বানিয়েছেন-সেলাই ফোঁড়াই কতো রকমের। সংসারে তিনি বধূ, মা, ঠাকুমা - এই তো তার পরিচয় শুধু। আজ প্রথম টের পেল তার পৃথক এক পরিচয়, তার অনা নারী সত্তা, এক শিল্পসত্তা। চোখে জল নিয়ে তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম জানালেন। চারদিকে তখন হাততালির কনসার্ট বেজে চলেছে.....।

স্বপ্নের ভিতর জন্মদিন
মায়া রায়চৌধুরী

আজ বাপনের জন্মদিন। অন্য অন্য বারের জন্মদিনের সঙ্গে এবারের জন্মদিনের একটু ফারাক আছে। এবারে বাপনের বাবা বিনয়বাবু, বলতে কি, এক ঢিলে দু পাখী মারলেন। গত শুক্কুরবার তোতোনের মাধমিকের ফল বেরিয়েছে। যে যে ফল নয়- নম্বরের পাশে ছোট্ট এতটুকু একটা স্টার। কিন্তু জ্বলছে যেন লুব্ধকের মত! নিকট আত্মীয় বন্ধুদের না খাইয়ে উপায় আছে! তাই বাপনের জন্মদিনটাতে বিনয়বাবু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা সেরে ফেলেছেন। সবাই খুব খুশী। বাপন - তোতন দু'জনকেই সবাই কিছু না কিছু উপহার দিল আশীর্বাদ করল। বাপনের উৎসাহের আর অন্ত নেই। একসময় হঠাৎ মা- কে প্রশ্ন করে 'মা, তোমার জন্মদিন হয় না কেন?' উত্তর পাবার আগে আবার প্রশ্ন করে ' বাপীর 'জন্মদিন' কবে?' মা হেসে উত্তর দেন-- 'জন্মদিন' ছোটদেরই হয়। বাপন মাথা নাড়ে। 'নাঃ নাঃ, এবার থেকে আমার আর দাদার মত তোমার আর বাপীরও 'জন্মদিন' হবে। হরিচরণ কথার মধ্যে এসে পড়ে। ছোটমামা বাপনকে ডাকছে। বাপন হরিচরণের দিকে একপলক তাকায়। তারপর দুম করে বলে দেয় এবার থেকে হরিদারও জন্মদিন হবে কিন্তু।'

সত্যি সত্যি দুভাই মিলে জোট বেঁধে বাপী আর মা-র জন্মদিন পালন করিয়েই তবে ছাড়ল। বিনয়বাবু বাইরের কাউকে জানতে দেন নি। কিন্তু বাড়িতে ভাল ভাল রান্নাবান্না হল আর ওরা চরজন আর হরিদা মিলে, যাকে বলে একেবারে ভোজ খেল। হরিদা মানে হরিচরণ, বয়সে বিনয়বাবুর চেয়ে বেশ কিছু টা বড়। এ বাড়িতে বিনয়বাবুর বাবার আমলে কাজে ঢুকেছিল। কবে যেন এ সংসারেরই লোক হয়ে গেছে সে। বাবাও বলে হরিদা, ছেলেও বলে হরিদা, পাড়ার দুড়ো বাচ্ছা সবাই বলে হরিদা। ছোটবাবু বৌদিমণির 'জন্মদিন' হল। ব্যাপন তো বলেছিল হরিদারও 'জন্মদিন' হবে। কিন্তু তার জন্মদিনের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ আয়োজন ত'ঠাহর হচ্ছে না। হরিচরণ তক্কে-তক্কে থেকে একদিন তোতনকে পাকড়াও করল। 'বড় খোকা, আমার জন্মদিন হবে না?' প্রথমটা তোতন একটু থতমত খেলেও খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিল।' এই দ্যাখ হরিদা, সেই কথাই ত' হচ্ছিল মা-র সঙ্গে। তোমার জন্মদিনটা, কবে? কোন মাসে?

এবার হরিচরণের বোকা বনাবার পালা। এটাও যে একটা জানাবার বিষয় হতে পারে সেটা ত' হরিচরণের জানা ছিল না! একটু চিন্তিত হল হরিচরণ। দু এক মিনিট পরেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠল প্রায়। ' সেই যে দেহাতিবাগান বাজারে যে বার বোম পড়েছিল না- আমি ত' সেই বছর-ই জন্মলাভ করেছি।'- তাতে নাহ'য় বছরটা পাওয়া যাবে। কিন্তু মাসটা? দিনটা?

আঁধার ঘনিয়ে আসে হরিচরণের মুখে। কে বলবে সে কথা! তোতনের কাছে সব শুনে খানিকটা কৌতুক করেই বোধহয় বিনয়বাবু বলেছিলেন — এটা জানা আর কি এমন কঠিন কাজ! জন্ম-মৃত্যু নথিবুক্তকরার অফিসে সমস্ত রেকর্ড থাকে। এ হেন গুরুত্বপূর্ণ কথাকে হরিচরণ বিশেষ ভাবে আমল দিল।

পরের দিনই ওদের দেশ মুর্শিদাবাদে রওনা দিন। সবাই অবাক হয়ে গেল। বিনয়বাবু বললেন— হরিদাটা সত্যিই ক্ষেপে গেছে দেখছি।

হরিচরণ গেল মুর্শিদাবাদ। কিন্তু সেখানে কিছু পাওয়া গেল না। বয়োজেষ্ঠ্য দু একজনের ধারণা। জিয়াগঞ্জে মামার বাড়িতে হিরচরণের জন্ম হয়েছিল। হরিচরণ জিয়াগঞ্জে গেল। জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্ত করার অফিসে দু চারদিন ঘোরাঘুরি করল- কিন্তু পাত্তা পেল না। ইতিমধ্যে জামাকাপড় নোংরা হয়ে গেছে, মুখ দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ঢেকেছে। কিন্তু এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় হতে নেই হরিচরণের। হরিচরণ অবিচল। একটা মানুষের জন্মদিনটা অবশ্যই তার স্তানে থাকা চাই। বেশ ক'দিন হরিচরণের ব্যাপারটা তিনি হাতে নিলেন।

দিন তিনেক বাদে হরিচরণ আবার ঐ অফিসে গেল। সার্টটা ধুতিটা আগেই 'কেচে রেখে ছিল। আজ সকালে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে একেবারে ফিটফাট। বসে আছে হিরচরণ বাবুটির অপেক্ষায়। দুরু দুরু পুকে অপেক্ষা করছে হরিচরণ। বাবুটি এলেন। ' দেখুন আপনি যে নাম ঠিকানা দিয়েছেন, সেই নামে আমাদের খাতায় ত' কোন রেকর্ড নেই। যুদ্ধের বাজারে বোমার ভয়ে তখন অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। তাইতে কিছু রেকর্ড হয় নি বা হয়ে থাকলেও নথি বেপাত্তা এরকম হয়ত কিছু ঘটে থাকবে। পরে অনেক কিছু ঠিকঠাক করে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আপনার নামটা ত পাওয়া যাচ্ছে না...... বাবুটি চলে যান। যেন হরিচরণের জন্মদিনটা না খুঁজে পাওয়া এমন কোন ব্যাপারই না; হরিচরণ দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ, নিশ্চল। ভারী বিমর্ষ হয়ে পড়ে সে। একটা শিরশিরিনি বয়ে যায় সারাদেহে। একটা গোটা জলজ্যান্ত মানুষ অছে অথচ তার জন্মদিন নেই! হতে পুঁজিও ত' প্রায় শেষ। কি করবে হরিচরণ! হরিচরণ আস্তে আস্তে সার্টের বুক পকেটে হাত গলায়, পাশের দুপকেট, ধুতির খুঁট, কষি সমস্ত হাঁতড়ে হাতের তেলোয় পয়সাগুলো জড়ো করে। গুণতে গুণতে চোখটা ঝাপসা হয়ে আসে -- হাওড়ার একটা টিকিট হয়ে যেতে পারে!

নিজের জন্মদিন নিয়ে সে স্বপ্ন দেখবে, এটা হরিচরণ ভাবতে পারেনি। সকালে ঘুম ভাঙার পর ভাবতে থাকে, কাল রাত্তিরে জন্মদিনের ব্যাপারটা সবাইকে বলবে কিনা।

ভ্যালেন্টাইন

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমিয়ে পড়লে? - বলে ডানদিকের ইন্ডিকেটারটা অন্ করে দিল জয়।

উঁ- জড়ানো গলায় আওয়াজ বের করল দীপা। চোখ দুটো বোজা। হাত দুটো কোলের ওর অযত্নে পড়ে আছে। মাথাটা সীটের হেড-রেস্টে এলিয়ে গড়েছে।

এ রাস্তাটা অনেকটাই ফাঁকা। পুরো রাস্তাটাই এখন হ্যালোজেনের আলোর দখলে। সঙ্গে দু-তিনটে চারচাকার গাড়ী আর পাঁচ-ছটা চারপায়ের প্রাণী। গাড়ীগুলো আওয়াজ তোলেঃ বোঁ- হুস্। প্রাণীগুলো আওয়াজ তোলেঃ কুঁ-কুঁ- ভৌ।

মারুতিটা গতমাসে কেনা। পুরো গাড়ীটা সে যত্ন দিয়ে মাখিয়ে রেখেছে বলে খুব একটা ধুলো বসে না। নিজেই চালায়। দীপা বলে-ড্রাইভার-কাম-ক্লীনার। দিনের বেলা গাড়ীর গায়ে আঁচড় লাগার ভয়ে খুব ধীরে -সুস্থে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে দেখে শুনে চালায়। এখন ফাঁকা রাস্তায় গাড়ী চালানোতে একটু আলগা দিয়েছে।

তাছাড়া চোখটাও টানছে। ড্রিঙ্ক কারাটা বোধহয় একটু বেশী হয়ে গেল। তা হোক গে- ভ্যালেন্টাই ডে-এর পার্টি বলে কথা!

রঞ্জনটা সত্যিই জিনিয়াস। ওরই আইডিয়া। পার্টি হলও ওর বাড়ি- বাগুই-আটিতে। সত্যি, হৈ সেকেলে সমাজের অকেজো ধ্যান-ধারণাগুলো বদলানো দরকার। প্রেম যদি থাকে প্রেম নিবেদন কী দোষ করল!

তরুণটা আবার নামেই তরুণ। আসলে চিরবৃদ্ধ। বলে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে দিনটার সঠিক স্পিরিটটা আমরা ধরতে পারছি না। প্রায় স্বগতোক্তির মতই বলে যেতে থাকে জয়। শালা বলে কিনা আজ তো আসলে শোকের দিন। আজ তো সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের ডেথ অ্যানভার্সারী। রাজার আদেশকে উপেক্ষা করে যেভাবে প্রেমিক- প্রেমিকাদের জীবনগুলোকে মিলিয়ে দিতেন তিনি- ঘুমিয়ে পড়ল? জয়ের প্রশ্ন।

— না ভাবছি পার্টিটার কথা। চোখ বন্ধ করেই আদুরে গলার উত্তর দীপার।

— কোন সিচুয়েশানটা?

— আচ্ছা তুমি অতো সাহস কী করে পেলে?

— সাহসের কী দেখলে? জয়ের অবাক প্রশ্ন।

— আমি তো ভাবতেই পারিনি। অত লোকের সামনে তুমি আমাকে —

— আরে-দূর- বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েই যেন সাহসিকতা ফোটাতে চাইল জয়।

— ওঃ সত্যিই থ্রিলিং। অতগুলো কাপল্ একসঙ্গে একঘরে —

— ঠিকই তো। ভালবাসা তো অপরাধ নয়, তাহলে বন্ধ দরজার কী প্রয়োজন? বলতে বলতেই প্রচন্ড ব্রেক কয়লো জয়। হুমড়ি খেয়ে দীপা প্রায় ড্যাশবোর্ডে।

— দেখো— দেখো—, জয় ফুটপাতের দিকে আঙুল দেখায়। হ্যালোজেনটা একটু দুরে। যেটুকু

অস্পষ্টতা ছিল। গাড়ীর হেড়লাইট সেই অভাব পূরণ অরেছে।

দৃশ্যটা পরিষ্কার। দুটো মানুষ। চামড়া বলে মনে হয় কিছুই নেই। পুরো দেহটাই ময়লা দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ শরীর। সবটাই এক। শুধু একজন পুরুষ, অপরটি স্ত্রী। প্রবল আবেগে দুজনে দুজনকে মিশিয়ে দিতে চাইছে নিজের শরীরের সঙ্গে। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

নির্লজ্জ! বলে হেডলাইটটা নিভিয়ে দিল জয়। গাড়ীটা আবার গড়াতে শুরু করেছে।

মানবী

দীপালী দে সরকার

এক বছরের মধ্যে একী হয়ে গেলো? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা-- শিক্ষিকা মা'র একমাত্র সন্তান সৌজন্য সেনগুপ্ত। মা মানবী দেবী ভাবতেই পারছেন না। কচি বৌ সমর্পিতাকে নিয়ে কী করবেন? বাপের বাড়ি ফিরিয়ে দেবেন? কিন্তু নিজেই যে সমর্পিতাকে দেখে শুনে পছন্দ করে নিয়ে এসেছেন? রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। অঙ্কে প্রথম। ইঞ্জিনিয়ার ছেলের জন্য। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়োর হঠাৎই চলে গেলো জল জ্যান্ত ছেলেটা। ভাবতে পারছেন না।

সমর্পিতা একা একা এই দীর্ঘ জীবন কী করে বইবে? তবে কি চাকরীর ব্যবস্থা করে দেবেন? এই নিয়ে স্বামী মণিশঙ্কর বাবার সঙ্গে কথা বলেন। ওনার সাফ জবাব-- তা আমি কি বলবো? ছেলেটাই যখন রইল না--

মানবীদেবী আর কথা বাড়ান নি। দিন আসে দিন যায়। দু'জনেই নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে যান। সমর্পিতা বাড়িতে থাকে। রেঁধে বেড়ে শ্বশুর বাবা শাশুড়ি মাকে খেতে দেয়। হাতের কাছে জিনিষ গুছিয়ে দেয়। বড় আশ্চর্য মনে হয় মেয়েটিকে। অদ্ভুত তো। বাপের বাড়ি যাবার নাম মুখে আনে না। নিজের ব্যক্তিত্ব, অধিকার আত্মমর্যাদা নিয়ে কোন কথা বলে না।

সেদিন রবিবার। মানবী দেবী স্কুলের পরীক্ষার খাতা নিয়ে নাজেহাল। অন্য সময় হলে রবিবারের হালটা নিজের হাতেই রাখেন। আজ সমর্পিতাকে কাজ চালিয়ে নিতে বলেন। ভোজন রসিক মণিশঙ্কবাবু বাজার থেকে ইলিশ মাছ, গলদা চিংড়ি, আর মুরগীর মাংস নিয়ে আসেন। সমর্পিতা রেঁধে টেবিলে পরিবেশন করে- বেগুন ভাজা, আনাজ দিয়ে মুগের জাল, দই ইলিশ, চিংড়ির মালাইকারি, পেঁপের চাটনী। মানবীদেবী স্বামীর মুখ নীচু করে খাওয়াকে লক্ষ্য করেন। পরম তৃপ্তিতে মনোযোগ দিয়ে খেয়ে যাচ্ছেন। বাবা, আর একটু মাংস দিই? মণিশঙ্গরবাবু মাথা কাত করে সম্পতি জানান। হাতা করে মাংস পাতে দেয় সমর্পিতা। মানবী দেবীর নজরে পড়ে পুত্রবধুর সাদা সিঁথি। অলংকারহীন হাত। সাদাটে শাড়ি। বুকটা হুহু করে ওঠে। আজ একাদশী। তারপর ও স্নান করবে। বেগুন ভাজা আর আনাজের মুগ জাল দিয়ে রুটি খাবে।

মানবী দেবীর নিজেকে কেমন যেন পাষণ্ড মনে হয়। ক্লাশে মেয়েদের ' দো- রোখা একদশী' পড়িয়েছেন। বিধানদাতারা আর সধবারা পেট ভরে চর্ব-চূষ্য- লেহ্য- পেয় খাবে। আর এরা কি না? সত্যই এমন বিধানের উপর বজ্রপাত হয় না? কে করবে? হঠাৎ মাথার মধে বিদুৎ চমকে ওঠে। মানবী দেবী উঠে দাঁড়ান। সমর্পিতার হাতটা টেনে আনেন। বলেন- তোর এই শ্বেত পাথারের দেবী মুর্তি আমি সহ্য করতে পারছিনা। আমার ছেলে তোকে শাঁখা সিঁদুর লোহা পরিয়েছিল। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো নিযে গেছ। মৃত্যুর উপর কারও হাত নেই, আমারও না! তোরও না। ছেলেকে হারিয়ে আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে যে আমি মাছ ভাত মাংস হালুয়া পোলাও গিলছি। আর তুই? তোকে আমি নিজের হাতে সাজাবো। আবার বিয়ে দেবো। আমি জানি, তুই দই ইলিশ খুব ভালোবাসিস্। আজ, মায়ের হাতে খা না। একাদশী চুলায় যাক্।

মানবীদেবী সমর্পিতাকে বুকে টেনে নেন। তাঁর চোখের উষ্ণজলে সমর্পিতার মুখে ভেসে যায়। ওর বুকে এক সমুদ্র লোনা জল উথাল পাথাল পরতে থাকে। মানবীদেবী দই ইলিশের কাই দিয়ে ভাত মেখে ভরে দেন, খাইয়ে দিয়ে মা বলেন - ছেলেটাকে হারিয়েছি মেয়েটাকে হারাতে চাই না।

মণিশঙ্করবাবু খাওয়া থামিয়ে স্ত্রীর কীর্তি দেখেন, বৈশাখের খটখটে দিনের মতো ফুটিফাটা গুমোট বুকে, শুষ্ক চোখে ঝড় তুলেছে মানবী। এ ঝড়ে সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে যাবে। নামবে বাঁধ ভাঙা বৃষ্টি। ধরণীর বুকে রস সঞ্চিত হবে। অঙ্কুর চারা হয়ে মাথা দোলাবে। মহীরুহ হবে। হবেই হবে। একদিন। কোনদিন।

জন্মদিন

দেবশংকর দাস

কী অদ্ভুত নিশ্চিন্তে বসে আছে লোকটা। চওড়া কাপাল। ব্যাকব্রাশ ঘন চুল। নীল-সবুজ লতা পাতা ছাপানো হাফশার্ট। অবিন্যাস্ত গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে ধোঁয়া ওঠা সিগারেট। পায়ের উপর পা তুলে চেয়ারে বসে আছে লোকটা। হাভভাবে নিপাট ভদ্রলোক মনে হলেও চোখ দুটোতে কোন ভদ্রতা নেই।

চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে নিল ঐন্দ্রিলা। বুকের ভেতর এখনও যন্ত্রনা দানা বেঁধে রয়েছে। যে কোন সময় গ্রন্থি ফেঠে বেরিয়ে আসতে পারে তপ্ত লাভার অন্দরমহল। ঐ লোকটাকে তখন কিছুতেই সে অমন নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেবে না। যে স্টলে বসে লোকটা এখন ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে, হয়তো ক্রোধের আগুনে স্টলটাই বেমালুম পুড়িয়ে দিতে পারে ঐন্দ্রিলা। না, আজ ওর সাথে কোন কথা নয়। কোন বসন্ত বিকেল একদম নয়।

প্রতিটি স্টলে এখন ফ্লুরোসেন্ট আলোর ঢেউ। প্রাঙ্গন জুড়ে ছড়ানো পুঁতির মালার মতো নারী-পুরুষ। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকের সাথে শেষ বিকালের আলো মিলে মিশে একাকার। বৈকালিক বিনোদনের এই আবেশময় পরিবেশে ঐন্দ্রিলা একা। অবশ্য একাই সে থাকতে চায়।

গতদিন ক্রীকরোডের বাড়ীতে জন্মদিনের পার্টি ছিল। সেখানে জনারণ্যে ঐন্দ্রিলা এমনই তো একা ছিল। অনেকেরই সাথে সুপর্ণা, অরুনিমা, নীলাদ্রি, সুগত -- সবাই এসেছিল। মা-বাবা, রিন্টু ছিল প্রাণোচ্ছল। অথচ ড্রয়িংরুমে দীর্ঘক্ষণ বসে বসে একের পর এক আধুনিক কবিতা আবৃত্তি কররেও ঐন্দ্রিলা নিজের কাছে উচ্ছল নদী হয়ে উঠতে পারেনি। কিসমিস দেওয়া পেল্লায় কেক কাটতে গিয়েও সে ফ্ল্যাটের করিডোরের দিকে তাকিয়ে অধীর অপেক্ষা করেছিল। এক সন্ধ্যায়, ভিক্টোরিয়ার সবুজ গালিচার উপর দাঁড়িয়ে যে বন্ধুকে ঐন্দ্রিলা নিমন্ত্রণ করেছিল, কই সেই লোকটা তো আসল না।

আজ কী অদ্ভুত বসে আছে লোকটা। নিরুত্তাপ। না, ঐন্দ্রিলাও কখনই হারবে না। সে ধীর পায়ে প্রধান গেটের দিকে হেঁটে চলে। হাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রানুভানু।

'ঐন্দ্রিলা' -- সুগতের ডাকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সে।

' এই চিঠি তোর জন্য। একমুখ হেসে সুগত মিশে যায় মেলার ভীড়ে, লোকটার খাস দোস্ত। চিঠি নয়, চার-পাঁচ লাইনের চিরকুট।

' তোমার জন্মদিন যাদের কাছ সত্য, তাঁরা নিশ্চয়ই এসেছিল গতদিন। আমার বৃত্তে, তুমি তো পা রেখেছ ২৫শে বৈশাখ। কবিগুরুর জন্মদিনে আমি নিঃশব্দে তোমার কাছে যাব। সেদিন জানাব, হ্যাপি বার্থ ডে -- তোমার সপ্তর্ষী।'

আশ্চর্য! ঐন্দ্রিলার চোখের সামনে সমস্ত অক্ষগুলো যেন মিলে মিশে ধীরেধীরে সমুদ্রে চেহারা নিল। সে যেন সমুদ্রপানে উত্তাল হাওয়ার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষোভের পাহাড় পরতে পরতে ডুবে যাচ্ছে সুনীল সাগরের বুকে। চোখের কোন একটু একটু করে কেমন ভিজে এল ঐন্দ্রিলার। দূর থেকে মানুষের ভীড়ে সে দেখতে পেল, ম্যাগাজিনের পাতায় ঢেকে আছে লোকটার মুখ।

মনের রামধনুতে গুনগুনিয়ে উঠল যেন -- কেঃ 'সপ্তর্ষী, আমার কাছে সেদিন তোমারও জন্মদিন।'